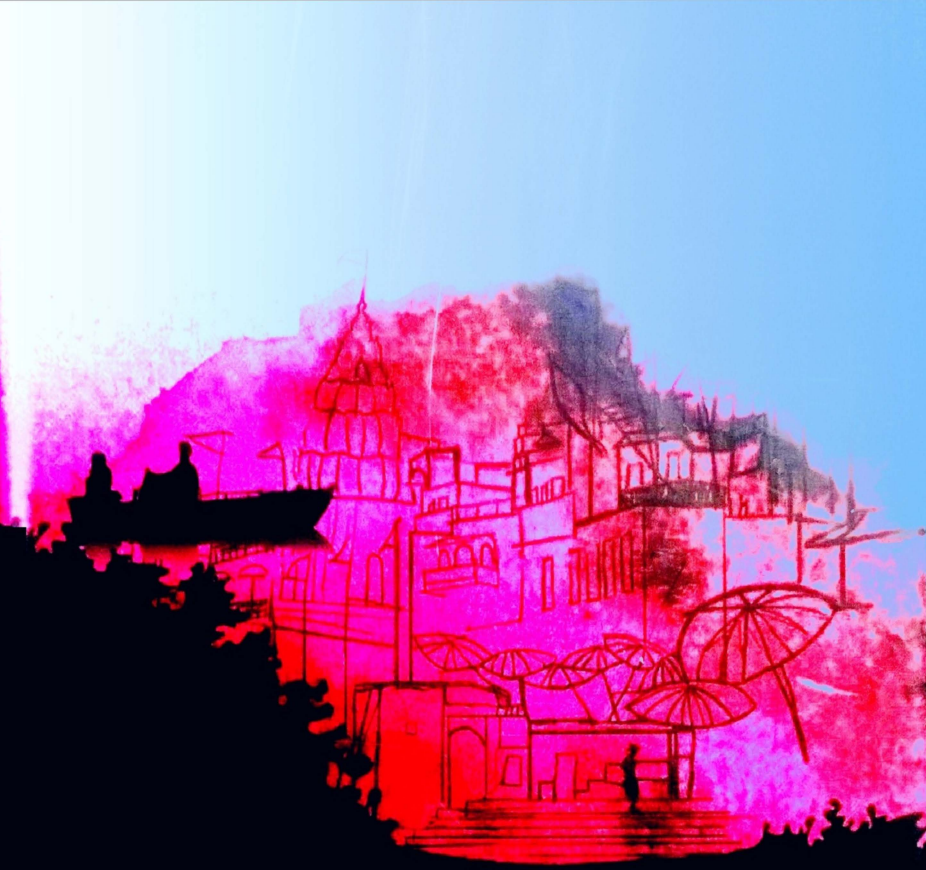

রেভুল্যুশন ২০২০

চেতন ভগত

অনুবাদ : ওমর ফারুক

নোমান

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

বেস্টসেলার ২০২০

চেতন ভগত

অনুবাদ :
ওমর ফারুক

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

একদা ইন্ডিয়ার ছোট্ট এক শহরে দুটো বুদ্ধিমান ছেলে বাস করত। একজন তার বুদ্ধি অর্থোপার্জনের কাজে লাগাতে চাইল, অন্যজন চাইল একটা রেভুল্যুশন শুরু করতে। কিন্তু সমস্যা হলো তারা দুজনেই একটি মেয়েকে ভালবাসে।
স্বাগতম রেভুল্যুশন ২০২০-এ।
বারানশির ছেলেবেলার বন্ধু গোপাল, রাঘব এবং আর্তির সাফল্য, ভালবাসা আর সুখ খুঁজে ফেরার গল্প এটি। কিন্তু ঘুণেধরা এক সমাজে এসব খুঁজে পাওয়া তত সহজ কাজ নয় যেখানে শুধুমাত্র দুর্নীতি পুরস্কৃত হয়। তাহলে গোপাল আর রাঘবের মধ্যে কে জিতবে?
ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান, ওয়ান নাইট অ্যাট দি কল সেন্টার, থ্রি মিসটেকস্ অব মাই লাইফ আর *টু স্টেটস্*-এর মতো বেস্টসেলিং বইয়ের লেখকের হাত ধরে উঠে এসেছে ইন্ডিয়ার হার্টল্যান্ড থেকে আবারো প্রভাববিস্তারকারী একটি গল্প।
রেভুল্যুশনের জন্য প্রস্তুত তো?

'অনেক লেখকই তাদের হৃদয়ের কথা অথবা তাদের পয়েন্ট অব ভিউ সফলভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। চেতন ভগতের বই এ দুটো বরং আরো বেশি কিছু করে'
–এ. আর রেহমান

'ইন্ডিয়ার উদীয়মান উদ্যোক্তা শ্রেণীর কণ্ঠ'
-ফাস্ট কোম্পানি ম্যাগাজিন

'ইন্ডিয়ার পেপারব্যাক রাজা'
-দ্য গার্ডিয়ান

'ইন্ডিয়ার ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া ইংরেজিভাষী ঔপন্যাসিক'
-দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্

'ভগত ইন্ডিয়ার তরুণ পাঠকদের হৃদয় ছুয়ে দিয়েছেন এবং অপরিসীম শ্রদ্ধাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন'
-ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...
http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni
ISBN 984872965-8
9789848729656

ভারতের ইংরেজিভাষী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চেতন ভগতের জন্ম নিউ দিল্লিতে। দিল্লি আর্মি পাবলিক স্কুল সমাপ্ত করে যোগ দেন দিল্লির IIT তে, পরে আহমেদাবাদের IIM থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। ২০০৪ সালে তার প্রথম উপন্যাস *ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান* প্রকাশ হলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয় থ্রি ইডিওটস। এরপর তার দ্বিতীয় উপন্যাস *ওয়ান নাইট অ্যাট দি কলসেন্টার* নিয়েও মুম্বাইতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। তবে তার তৃতীয় উপন্যাস *থ্রি মিসটেক্স অব মাই লাইফ* রেকর্ডসংখ্যক পঞ্চাশ লাখ কপি বিক্রি হলে সবাই নড়েচড়ে বসে। রাতারাতি তিনি হয়ে ওঠেন ভারতের একজন সেলিব্রেটি।

মুম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে এগারো বছর হংকংয়ে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করেছেন চেতন ভগত। তার স্ত্রী আনুশা। ইশান এবং শ্যাম নামের দুটো জমজ সন্তান আছে তাদের।

ওমর ফারুক-এর জন্ম নারায়ণগঞ্জে, পাড়াশোনা করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে। ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল লেখালেখির সাথে যুক্ত এ তরুণের অনুবাদ এটাই প্রথম। লেখালেখিকে পাশে নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে যাবার ইচ্ছা রয়েছে তার।

এই বইটি তৈরী করা হয়েছে

ফেসবুক গ্রুপ

bangla book's direct link

এর সৌজন্যে

স্ক্যানিং ও এডিটিং: নোমান

চেতন ভগত-এর

রেভুল্যুশন ২০২০

অনুবাদ : ওমর ফারুক

বাতিঘর প্রকাশনী

রেভুল্যুশন ২০২০

মূল : চেতন ভগত

অনুবাদ : ওমর ফারুক

Revoulution 2020

copyright©2014 by Chetan Bhagat

অনুবাদস্বত্ত্ব : বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ: ডিলান

অনুবা কের আলোকচিত্রী:

রাশেদ রাশিব

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ধন্যবাদ জানাচ্ছিঃ

আমার পাঠকদের, তাদের ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণার জন্য।
সৃষ্টিকর্তাকে যিনিই আমার দেখভাল করেন।
শিনি অ্যান্টনি, যে সবসময়য় আমার বইয়ের প্রথমপাঠক এবং সম্পাদক।
অনুভা ভাং, আমার লেখার সকলপর্যায়ে তার সাজেশনের জন্য। নুতন বেন্দ্রে, নীহারিকা খান্না, মাইকেল পেরেরা, প্রতীক দেওয়ান, জিতিন দেওয়ান এবং অনুরাগ আনন্দকে তাদের মূল্যবান মতামতের জন্য।
সৌরভ রাংতা এবং কিশোর শর্মা, গবেষণায় সাহায্যের জন্য।
বারানশির দারুণ, চমৎকার সব মানুষদের।
ভ্রমণের সময় যাদের সাথে কথা হয়েছে, যারা আমার দেশকে আরও জানতে সাহায্য করেছে।
আমার মা রেখা, স্ত্রী আনুষা, ভাই কেতনকে, আমার জীবনে তাদের পেয়েছি বলে। আমার ছেলে ঈষাণ এবং শ্যামকে, কারণ আমার দুঃসময়ে ওরা বলতো, "সব ঠিক হয়ে যাবে, বাবা।"
আমার ফেসবুক এবং টুইটারের বর্ধিষ্ণু পরিবারকে।
রূপা অ্যান্ড কোম্পানিকে আমার বই প্রকাশের জন্য।
ফিল্মমেকারদের, যারা আমার গল্পকে ফিল্মে রূপান্তরিত করেন।
এবং আরও একবার, আপনাকে, প্রিয়পাঠক, রেভুল্যুশনের অপেক্ষায় থাকার জন্য।

– চেতন ভগত

আমার মা-কে
বারানশিকে
পবিত্র নদীকে
ইন্ডিয়ার শিক্ষার্থীদেরকে

মুখবন্ধ

"আর আমি আশা করি শুধুমাত্র তোমরা নয়, সারা দেশ এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধারা অব্যাহত রাখবে। 'কোটি কোটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দেশে আমার জন্ম' এ কথা বলার মধ্যে এক ধরনের গর্ব কাজ করে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ," এ পর্যন্ত বলেই আমি বারানশির তিলক হলের বক্তব্য শেষ করলাম।

বুঝতে পারলাম হাততালি এবং শিস বাজানোই আমার বিদায়ের ইঙ্গিত। সিকিউরিটি ভলান্টিয়ারদের সহায়তায় সহজেই বেরিয়ে এলাম হল থেকে।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার," আমার ঠিক পাশ থেকে কেউ একজন বলল।

আমি আমার আমন্ত্রণকারীর দিকে তাকানোর জন্য পেছনে ঘুরলাম। "ওহ্ মিঃ মিশ্রা, আমি তো আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

"প্লিজ, আমাকে গোপাল বললে খুশি হব," সে বলল। "গাড়িটা ঐ দিকে।"

আমি গঙ্গাটেক কলেজের তরুণ ডিরেক্টর গোপাল মিশ্রার সাথে হাটতে লাগলাম। একটু পরেই তার কালো মার্সিডিস আমাদেরকে জনবহুল বিদ্যাপথ রোড থেকে সরিয়ে নিল।

"তো, আপনি কি মন্দির এবং ঘাটগুলো দেখেছেন?" গোপাল জিজ্ঞেস করল। "বারানশি তে আসলে এগুলোই আছে দেখার মত।"

"হ্যা, আমি ভোর পাঁচটায় বিশ্বনাথ মন্দির এবং দশাশ্বমেধ ঘাট দেখতে গিয়েছিলাম। এই শহরটা আমার আসলেই খুব পছন্দ," বললাম তাকে।

"যাক ভাল, এখানকার কোন জিনিসটা আপনার কাছে সবচাইতে ভাল লেগেছে?"

"আরতি," আমি বললাম।

"কি বললেন?" অবাক কণ্ঠে গোপাল জানতে চাইল।

"ঘাটগুলোর সকালের আরতি। আমি এটা প্রথমবারের মত দেখলাম, সব প্রদীপগুলো ভোরের আবছা আলোয় ভাসছে–ওহ্ ওটা যেন স্বর্গীয় কোন দৃশ্য।"

গোপালের কপালে ভাঁজ পড়ল।

"কি ব্যাপার?" আমি বললাম। "বারানশির আরতি কি সুন্দর না?"

"ওহ্ হ্যা হ্যা...না, মানে আমি তা বুঝাতে চাই নি," গোপাল এতটুকুই বলল, বিস্তারিত বলল না।

"আপনি কি আমাকে রামাদা হোটেল পর্যন্ত দিয়ে আসবেন?" বললাম তাকে।

"আপনার ফ্লাইট তো কাল সকালে, আজ রাতে আমার সাথে ডিনার করুন।"

"আহহা, ফরমালিটির কোন দরকার নেই..." আমি বলতে শুরু করলে গোপাল আমাকে থামিয়ে দিল।

"আপনাকে যেতেই হবে। আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হুইস্কি আছে আমরা একসাথে ড্রিংক করব।"

আমি হেসে মাথা নাড়ালাম, "ধন্যবাদ গোপাল কিন্তু আমি বেশি খেতে পারি না।"

"চেতন স্যার, এক পেগ মাত্র, যাতে আমি বলতে পারি, 'আমি চেতন ভগতের সাথে ড্রিংক করেছি,' প্লিজ।"

আমি হাসলাম, "এটা তত বড় কিছু না। আর আপনি চাইলে আমার সাথে ড্রিংক না করেও এমনিতেই বলতে পারেন।"

"তা না স্যার, আমি আসলেই আপনার সাথে ড্রিংক করতে চাই," গোপাল বলল।

তার তীব্র এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমি দেখেছি। গত ছয় মাসে সে আমাকে ২০ বার আমন্ত্রণ জানিয়েছে যতক্ষণ না আমি আসার জন্য রাজি হয়েছি। আমি জানি সে কি রকম জেদি।

"আচ্ছা এক পেগ মাত্র," আমি বললাম, এই আশায় যেন পরে অনুতপ্ত না হতে হয়।

"দারুণ!" গোপাল বলল।

আমরা শহর থেকে বাইরে লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের দিকে দশ কিলোমিটার গিয়ে গঙ্গা টেক কলেজে পৌছলাম। গার্ডরা গেট খোলার সময় স্যালুট করল আমাদের। গাড়িটি ধূসর বাংলোর সামনে এসে থামল। বাংলোর বাইরের ডিজাইন কলেজ এবং হোস্টেল বিল্ডিঙের মতই পাথরের। নিচতলায় ড্রয়িংরুমে বসলাম আমরা। এই রুমটার সামনে ব্যাডমিন্টন কোর্টের সমান লন।

নরম ভেলভেটের সোফায় বসতে বসতে আমি বললাম, "বাড়িটা আসলেই চমৎকার।" সিলিংটাও যে অনেক উঁচুতে তা আমার নজর এড়াল না।

"থ্যাঙ্কস, আমি নিজে এটার ডিজাইন করেছি। কন্ট্রাক্টরই সবকিছু করেছে কিন্তু আমি প্রতিদিন চেক করতাম।" কথা বলতে বলতে গোপাল ঘরের শেষ মাথায় বারের দিকে গেল, "এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিরেক্টরের বাংলো; আপনারা বন্ধুরা মিলে তো এক ডিরেক্টরের বারোটা বাজিয়েছিলেন।"

"আপনি জানেন কিভাবে?"

"শুধু আমি না, সবাই জানে। আমরা বই পড়েছি, ছবিও দেখেছি।"

গোপাল হাসতে হাসতে আমাকে একটা ক্রিস্টালের গ্লাস ধরিয়ে দিল যার প্রায় পুরোটাই ভর্তি।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"সিঙ্গেল মল্ট, ১২ বছরের পুরনো," বলল সে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম, "এটা ডিরেক্টরের বাংলো ঠিকই কিন্তু তার তো কোন মেয়ে নেই। আপনি তো এখনো বিয়েই করেন নি। আমার দেখা সবচেয়ে তরুণ ডিরেক্টর।"

আমার কথা শুনে গোপাল হাসলো।

"আপনার বয়স কত?" আমি আগ্রহী কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

"ছাব্বিশ," গোপাল বলল, তার গলার স্বরে একটু অহংকার বোধহয় শুনতে পেলাম। "শুধুমাত্র সবচেয়ে তরুণই না, আপনার দেখা সবচেয়ে অশিক্ষিত ডিরেক্টর।"

"অশিক্ষিত?"

"আমি কখনো কলেজে পড়ি নি।"

"কি?" আমি আমার গ্লাসের বরফ নাড়তে নাড়তে, হুইস্কির তেজ আন্দাজ করতে করতে বললাম।

"আমি অবশ্য সাংবাদিকতার একটা ডিগ্রির কথা বলেছিলাম কিন্তু ওটা মজা করে বলেছি।"

"তাই নাকি!" আমি বললাম। "এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালানো তো মজা করা হতে পারে না।"

"সবগুলো ব্যাচ মিলিয়ে ১৬০০ ছাত্রছাত্রি, চেতনজি। প্রত্যেকে ১ লাখ করে দিচ্ছে প্রতি বছর। এ বছর ফান্ডে ১৬ কোটি পড়েছে। আবার আপনি আজকে এমবিএ কোচিং উদ্বোধন করে দিলেন। এটা আরেকটা নতুন ব্যবসা।"

আমি গ্লাসে আবার চুমুক দিলাম। আমার গলা জ্বলতে লাগল। কাশতে কাশতে বললাম, "এগুলো বিয়ার, নাকি মদ?"

গোপালের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তার ব্যবসায়িক পরিসংখ্যান এবং হুইস্কি দুটোকেই অবজ্ঞা করেছি।

"ভাল লাগছে না?" গোপাল বলল, "এটা গ্লেনফিডিখ, প্রতি বোতল চার হাজার করে। ওই নীল লেবেলের বোতলটা কি খুলব? ওটা দশ হাজার করে প্রতিটা।"

এটা দামের ব্যাপার না, আমি বলতে গিয়েও বললাম না। "আমি আসলে হুইস্কি খাই না, আমার জন্য একটু বেশি কড়া হয়ে যায়।"

গোপাল হাসলো, "ও, এই ব্যাপার? জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে না? ওটা খেয়ে দেখুন, নতুন ধরনের স্বাদ পাবেন জীবনে।"

আমি গ্লাসে আবার চুমুক দিলাম, এবারো নাক মুখ কুঁচকে ফেললাম। গোপাল হেসে আমার গ্লাসে আরও পানি ঢেলে দিল। এতে অবশ্য হুইস্কির স্বাদ কিছুই থাকল না কিন্তু আমি স্বস্তি পেলাম।

"জীবনকে তো উপভোগ করতে হবে, তাই না? আমাকে দেখুন, আমি এ বছর চার কোটি উপার্জন করতে যাচ্ছি, কিছুটা এনজয় না করলে কি হয়?"

পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় নিজের উপার্জনের কথা বলা অর্থহীন। সম্ভবত এই একটা মাত্র দেশই আছে যেখানে কারো টাকা থাকলে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে হয়, নয়তো তার হজমকার্য সম্পন্ন হয় না।

তার প্রশ্নটি সম্ভবত সে নিজেকেই করেছে। তার কালো চোখগুলো আসলে আমার কাছ থেকে আরও বেশি মনোযোগ চাচ্ছে। তার পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির উচ্চতা, ফর্সা, পরিপাটি আঁচড়ানো চুলসহ বাকি সবকিছুই স্বাভাবিক।

"হ্যা, অবশ্যই, এনজয় করাই তো উচিত..." আমি এতটুকু বলতেই সে আমাকে থামিয়ে দিল।

"সামনের বছর আমার পকেটে পাঁচ কোটি আসবে।"

সে সম্ভবত আমি যতক্ষণ না বাধা দিচ্ছি ততক্ষণ তার উপার্জনের ভবিষ্যৎবাণী করতেই থাকবে। বিস্মিত হওয়ার ভান করলাম, "পাঁচ কোটি?"

গোপাল দাঁত বের করে হাসল।

"Baby, eat this, for I have made it," এটা নিশ্চয়ই তার পছন্দের টি-শার্ট শ্লোগান হবে।

"অবিশ্বাস্য," আমি মৃদু স্বরে বললাম। একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করলাম, "উপরতলায় কি কি আছে?"

"বেডরুম এবং বেলকনি। চলুন আপনাকে দেখাই।"

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। প্রথমেই পড়ল একটা শোবার ঘর। ঘরের ভেতর রাজা-বাদশাদের মত বিশাল খাট। আমি বেলকনি থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

গোপাল বলল, "এগুলো সবই এক সময় পতিত জমি ছিল। আমার দাদার চাষের জমি।"

আমি আন্দাজে বললাম, "১০ একর?"

"না, ১৫ একর। আমাদের আরও ১৫ একর ছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজের ফান্ডের জন্য ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।"

সে ক্যাম্পাসের পূর্বদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওখানে একটা শপিংমল হচ্ছে।"

আমি বললাম, "ভারতের সবগুলো শহরেই এখন শপিংমল হচ্ছে।"

"ইন্ডিয়া চকমক করে উঠছে চেতন স্যার," এ কথা বলে সে আমার গ্লাসের সাথে তার গ্লাস টুং করে টোকা মারলো।

গোপাল আমার চারগুণ ড্রিংক করছে। আমি আমার প্রথমটুকু শেষ না করতেই সে পঞ্চমবারের মত তার গ্লাসে ঢালল। আমার গ্লাসেও ঢালতে চাইল, আমি না করাতে বলল, "আপনারা তো আসলে স্টাইলের জন্য পান করেন, তাই না?"

"আমি আসলে তত বেশি খাই না," একথা বলে ঘড়ির দিকে তাকালাম, দশটা বাজে।

সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ডিনার করেন কখন?"

"আপনি যখন করবেন তখনই করা যাবে।" যদিও আমি মনে মনে চাইছিলাম সে যেন এখনই করে।

"যাক, তাড়াহুড়ার তো কিছু নেই, একজন শিক্ষিত এবং একজন অশিক্ষিত দুজনে মিলে ভালই কাটছে সময়।" একথা বলে গোপাল তার গ্লাস উপরে তুলে ধরল।

আমি মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলাম। আমার পাকস্থলি খাবারের জন্য গর্জন করছে। আবার বসার ঘরে চলে এলাম আমরা।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আসলেই প্রফেসরের বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

আমি হাসলাম, "আসলে প্রেমে পড়লে মানুষ অনেক পাগলামি করে। ওরকম কিছু একটা আর কি।"

গোপাল জোরে হেসে উঠল। সে তার গ্লাসের সবটুকু গিলে ষষ্ঠ বারের মত আবার ঢালল। "প্রেম? প্রেমের কথা বাদ দিন, প্রেম জীবনকে বিষিয়ে তোলে।"

"এটা তো অনেক কঠোর হয়ে গেল," আমি বললাম। "এজন্যই কি এখনো মিসেস ডিরেক্টর নেই?"

ঢালার সময় গোপালের হাত কাঁপছিল। তাকে আর খেতে নিষেধ করা উচিত কি না বুঝতে পারছি না।

"মিসেস ডিরেক্টর!" গোপাল তাচ্ছিল্যভরে হাসলো। সে তার বোতল শক্ত করে ধরল।

"আস্তে গোপাল, আপনি অনেক দ্রুত খাচ্ছেন। এটা ক্ষতিকর।"

গোপাল শব্দ করে বোতলটা কফি টেবিলে রাখল, "ক্ষতিকর কেন? আমার জন্য কাঁদতে যাবে কে? আমি বাঁচলে জীবনকে উপভোগ করতে চাই, মরলে কার কি?"

"আপনার বাবা-মা?"

গোপাল মাথা নাড়ল।

"বন্ধুবান্ধব?"

"সফল লোকদের বন্ধুবান্ধব থাকে না," গোপাল দৃঢ়কণ্ঠে বলল। "এটা সত্যি, তাই না?"

তার বিলাসবহুল বাড়ি আমার কাছে শীতল আর বিচ্ছিন্ন লাগল। আমি হুইস্কির বোতলটা সরিয়ে নিয়ে বারে রেখে এসে বললাম। "নিরাশাবাদী, তাই না? অদ্ভুত, আপনি তো ভালই করছেন।"

"কিসের ভাল, চেতনজি?" গোপাল বলল, সম্পূর্ণ মাতাল, আর ধরে নেয়া যায় একেবারে সৎ এখন।

গোপাল বিশাল টিভি, মিউজিক সিস্টেম, আমাদের পায়ের নিচের দামি কার্পেটের দিকে তাড়াহুড়ো করে দেখাল।

"এসবের মানে কি? আমি এতকিছুর মধ্যেও নিঃসঙ্গ।"

আলোচনা গম্ভীর পর্যায়ে চলে গেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, "আচ্ছা আপনি তো আমার প্রেমিকা সম্পর্কে বইয়ে পড়েছেন, আপনার কি খবর? আপনার ছিল কখনো?"

গোপাল কিছু বলল না কিন্তু তাকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। সে তার গ্লাস কফি টেবিলে রেখে দিল।

ওটা আসলে স্পর্শকাতর বিষয়, আমি অনেক দেরিতে বুঝলাম।

তার বমি বমি ভাব হচ্ছে।

"আপনি ঠিক আছেন তো?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

সে কিছু না বলে দৌড়ে বাথরুমে চলে গেল। আমি তার বমির শব্দ শুনতে পেলাম। সময় কাটানোর জন্য আমি তার বুকশেলফ দেখতে লাগলাম। গঙ্গা টেক কলেজের ফ্রেমে বাধা খবর, ট্রফি, কলেজের ভিজিটরদের সাথে গোপালের ছবি দেখতে পেলাম। ভাবলাম, আমার ছবিও খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে এখানে।

বিশ মিনিটেও যখন গোপাল এল না, আমি গৃহকর্মীকে ডাকলাম। সে আমাকে বাথরুমের সামনে নিয়ে গেল। দরজায় টোকা দিলাম কিন্তু কোন শব্দ নেই। জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম কিন্তু তাতেও কিছু হল না।

"মনে হয় দরজা ভেঙ্গে ফেলতে হবে," কাজের লোকটি বলল।

ভেবে অবাক হলাম, কিভাবে আমি একটি কলেজের ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসে বারানশির অপরিচিত একটি বাড়ির বাথরুমের দরজা ভাঙতে বাধ্য হচ্ছি।

হাসপাতালের চাদরের খসখস শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনটা বাজে। আমি গোপালকে বারানশির লঙ্কা মোড়ে হেরিটেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।

গোপাল তার গলা ম্যাসাজ করতে করতে বিছানায় উঠে বসল। তার মাতাল অবস্থা দেখে আমার কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। যদিও তখন মাতাল হয়েছিল ছাত্র, আর এখন স্বয়ং ডিরেক্টর।

"আপনি সারারাত এখানে ছিলেন?" গোপাল অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"আমার সামনে আমার আমন্ত্রণকারীকে মরতে দিতে পারি না!" বললাম তাকে।

"আমি আসলে দুঃখিত, আমি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম," গোপাল দাঁত বের করে হাসল।

"আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যা, এখন কোন সমস্যা নেই।"

"আমি শুধুমাত্র এখনকার কথা বলছি না, আপনি ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক আছেন তো?"

গোপাল তার মাথা ঘুরিয়ে অন্যপাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন কাটছে জীবন?"

গোপাল নিরুত্তর।

এক মিনিট পরে উঠে দাঁড়ালাম। "আমাকে এখন যেতে হবে। ফ্লাইট ছাড়ার আগে একটু ঘুমুতে হবে।" দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

"আপনার কি মনে হয় মানুষ হিসেবে আমি ভাল?" গোপাল জানতে চাইল।

তার অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম।

"বলুন না, আসলে কি আমি ভাল মানুষ?" সে আবার জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ ঝাঁকালাম। "আমি আপনাকে ঠিকমতো চিনি না, গোপাল। আপনি অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দর করে করেছেন, আমাকে দারুণভাবে আপ্যায়িত করেছেন। আমার কাছে তো আপনাকে যথেষ্ট ভালই লাগছে।"

"আপনার তাই মনে হয়?"

"আপনি যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। এটাকে সহজভাবে নিন। এমনকি দামি হুইস্কিও ক্ষতিকর হতে পারে," আমি বললাম।

সে হেসে মাথা নেড়ে আমার কথার সমর্থন জানাল। "আমি মদ কমিয়ে দিব। আর কোন কিছু?"

"আপনি যথেষ্ট তরুণ। ভালোবাসার বিষয়টি এখনই বাদ দেবেন না।" বলে আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, "আমাকে এখনি যেতে হবে। এখন তো সকালের আরতির সময়ই হয়ে গিয়েছে।"

"এটাই তার নাম," গোপাল বলল।

আমার আর থাকার ইচ্ছা না থাকলেও আটকে গেলাম। "কার নাম, কিসের নাম?" আমাকে যেতে হবে, আর এসব আমার কোন বিষয় না জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম।

"আরতি," বলল সে।

"আরতি কে? আপনি যাকে পছন্দ করতেন?" আমি অনুমান করলাম।

"পছন্দ শব্দটা যায় না, চেতনজি।"

"আপনি তাকে ভালবাসতেন?" হেসে বললাম।

"বারানশির সব সাধু আর পণ্ডিতদের কল্পনা করুন। তাদের সবার উৎসর্গ একত্রিত করলে যা হবে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।"

আমি উদাহরণটা আত্মস্থ করলাম। কৌতুহল আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। নিজেকে আর একটা প্রশ্ন করার সুযোগ দিলাম, "সেও কি আপনাকে ভালোবাসতো?"

গোপাল প্রশ্নটির মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিবিষ্ট হয়ে গেল। "সে আমাকে শুধু ভালোই বাসতো না, আমাকে জয় করে নিয়েছিল।"

আমি শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে নিলাম। সামনে একটা বিশাল দিন। নির্ঘুম রাত কাটানোটা খুবই বাজে কাজ হবে। কিন্তু আমি নিজেকে বলতে শুনলাম, "তো, শেষপর্যন্ত কি হল আপনার আর আরতির মধ্যে?"

গোপাল হাসলো। "এটা কোন ইন্টারভিউ না, চেতনজি। হয়ত আপনি বসে এই নির্বোধ মানুষটার সম্পূর্ণ গল্প শুনুন, নয়ত চলে যান। আপনার ইচ্ছা।"

তার কাঠকয়লার মত চোখে আমার চোখ পড়ল। এই তরুণ ডিরেক্টরের কোন একটা ব্যাপার আমাকে উৎসুক করে তুলেছে। তার অস্বাভাবিক উপার্জন, তার কাঠিন্য,

তার পোড় খাওয়া কথাবার্তা অথবা হয়ত এই অদ্ভুত পবিত্রশহর আমাকে তার সম্পর্কে আরো জানতে উৎসুক করে তুলছে।

আমি বিরাট একটা হাই তুললাম। গোপাল তার পাশের একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল।

"ঠিক আছে, আপনার গল্প বলুন," বসে পড়লাম আমি।

"কিছু পানীয় নিলে কেমন হয়?" গোপাল বলল।

আমি তার দিকে চোখ বড় করে তাকালাম।

সে হেসে বলল, "আমি বলতে চাচ্ছি চা।"

আমরা এক পট অতিগরম মশলা চা আর গ্লুকোজ বিস্কিট অর্ডার করলাম। আলোচনার জন্য এরচে উপযুক্ত আর কি হতে পারে?

"কোথা থেকে শুরু করব?" গোপাল বলল।

"আরতিকে দিয়েই শুরু করুন। যে মেয়েটির জন্য আপনার এ অবস্থা।"

"আরতি? সে তো আমাকে প্রথম দিনই বিপদে ফেলে দিয়েছিল," বলল গোপাল।

আমি চায়ের মধ্যে বিস্কিট ডুবিয়ে শুনতে লাগলাম।

অধ্যায় ১

"অলস বাবা-মা, প্রতিদিন মাখন-রুটি," দ্বিতীয় সারির একটা নীল প্লাস্টিকের টিফিন বক্স বন্ধ করতে করতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম। আমি আর রাঘব পরের ডেস্কে গেলাম।

"বাদ দে না গোপাল! যে কোন সময় ওরা চলে আসবে," রাঘব বলল।

"চুপ..."

"আমি পুরি-আলু এনেছি, চল ভাগ করে খাই। অন্যেরটা চুরি করা ঠিক না।"

আমি একটা ছোট, গোল স্টিলের টিফিনবক্স নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করলাম, "এটা খুলে কিভাবে মানুষ?"

আমাদের কারোরই তীক্ষ্ণ নখ নেই এই হতচ্ছাড়া বাক্সটার ঢাকনা খোলার জন্য। আমরা সকালের অ্যাসেম্বলি ফাঁকি দিয়েছি সাপ্তাহিক টিফিন চুরি অভিযানের জন্য। জাতীয় সঙ্গীত শুরু হতে আরো দশ মিনিট বাকি। তারপর ফাইভ-সি ক্লাসের সবাই হুড়োহুড়ি করে চলে আসবে। এরই মধ্যে আমাদেরকে টিফিন খুঁজে বের করে খেয়ে আবার রেখে দিতে হবে।

রাঘব ঢাকনাটা খুলে বলল, "এটার মধ্যে আচার-পরোটা, খাবি?"

"বাদ দে," বলে আমি বাক্সটা আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম। আমার চোখ এক ব্যাগ থেকে অন্য ব্যাগের উপর ঘুরতে লাগল। "পেয়েছি," প্রথম সারির একটা গোলাপি ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম। "এই ব্যাগটা দামি মনে হচ্ছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই ভাল টিফিন এনেছে, চল।"

আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সিটের দিকে দৌড়ে গেলাম। আমি বার্বি ব্যাগটা খামচে সামনের জিপারটা খুললাম। ভেতরে চকচকে লাল চারকোণা টিফিন বক্স, ঢাকনাতে একটা চামচ রাখার জায়গাও আছে। ঢাকনাটা খুলতে খুলতে বললাম, "দারুণ বক্স তো!"

ছোট এক বক্স চাটনি আর বড়সড় এক পিস কেক। বিরাট সাফল্য।

"আমার শুধু কেকটা দরকার," কেকের টুকরাটা তুলতে তুলতে বললাম আমি।

"পুরোটা খাওয়া ঠিক হবে না," রাঘব বলল।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললাম, "আমি এক কামড় খেলে ও তো বুঝে ফেলবে।"

"কেটে দু-টুকরো করে এক টুকরো খেয়ে অন্যটা রেখে দে," রাঘব বলল।

"কি দিয়ে কাটব?"

"স্কেল দিয়ে," সে প্রস্তাব দিল।

আমি দৌড়ে আমার ডেস্কে গেলাম, একটা স্কেল এনে সুন্দর করে কাটলাম। "ঠিক আছে? এখন খুশি?" বললাম আমি।

"এটা তার কেক," রাঘব কাঁধ ঝাঁকাল।

"কিন্তু তুই আমার বন্ধু," বলে আমি তাকে এক কামড় সাধলাম। সে নিতে রাজি হল না। আমি বাড়িতে সকালের নাস্তা খাই নি, তাই কেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার আঙুলে ক্রিম লেগে মাখামাখি অবস্থা।

"তুই তোর নিজের টিফিন আনিস না কেন?" রাঘব জানতে চাইল।

আমি কেক ভরা মুখে বললাম, "এতে বাবার কষ্ট হবে। এমনিতেই তাকে দুপুর আর রাতের খাবার বানাতে হয়।"

"তাই?"

"আমি বাবাকে বলি আমার ক্ষুধা লাগে না।"

বাবা একটা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। ভোর ৬ টায় বাসা থেকে বেরিয়ে যায়, আমারও আগে। আমি আমার আঙুল থেকে চকলেট ক্রিম চেটে খেলাম। এখন আমরা জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি।

"আমি তোর জন্য টিফিন আনতে পারি," রাঘব বলল, জাতীয় সঙ্গীতের সম্মানার্থে তার সাথে আমাকে দাঁড়াতে বাধ্য করল।

"বাদ দে, তোর মা প্রতিদিনই বিরক্তিকর পুরি বানিয়ে দেয়," আমি বললাম।

আমরা ছাত্রছাত্রিদের ক্লাসে ফেরার পথে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। আমি বাকি কেকটুকু ঠেসে মুখে ভরে দিলাম।

"জলদি কর, জলদি," বলল রাঘব।

আমি টিফিন বক্সটা বন্ধ করে বার্বি-ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, এখানে বসে কে?" রাঘব জিজ্ঞেস করল।

আমি গোলাপি ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে বাদামি কভারের একটা খাতা পেলাম। কভারের উপরের লেখা পড়তে লাগলাম, "আরতি প্রতাপ প্রধান, বিষয়: গণিত, ক্লাস: ফাইভ, শাখা: সি, বয়স: ১০, রোল: ১, সানবিম স্কুল।"

"বাদ দে, আমাদের কাজ শেষ?" রাঘব বলল।

আমি আরতির ব্যাগটা চেয়ারের উপর, ওটার আসল জায়গায় রেখে দিলাম।

"চল," বলে আমরা দৌড়ে পেছনের সারিতে গিয়ে আমাদের চেয়ারে বসে ডেস্কে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে অসুস্থতার ভান ধরলাম, অ্যাসেম্বলি না করার অজুহাত।

ফাইভ সি ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রি ক্লাসে ঢোকার পর চার ডজন দশ বছর বয়সি ছেলেমেয়ের চেঁচামেচিতে ক্লাসরুমটা ভরে উঠল।

ঠিক এক মিনিট পরে আমাদের ক্লাসটিচার, সিমরান গিল ম্যাডাম আসার সাথে সাথেই সব চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল। বাচ্চারা সবাই ঠিকভাবে বসার আগেই ম্যাডাম বোর্ডে বড় করে লিখলেন, "গুণন।"

আমি সোজা হয়ে বসলাম, আমার ঘাড় যতটা সম্ভব উঁচু করে রোল ১, আরতি প্রতাপ প্রধানকে দেখতে লাগলাম। সে একটা সাদা স্কার্ট, সাদাশার্ট, লাল কার্ডিগান পরেছে। চুলের বেণী লাল ফিতায় বাধা। ম্যাডামের দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে বসে আছে।

"ইউউ," চিৎকার করে আরতি লাফিয়ে উঠল। সে তার চেয়ার থেকে একটা চকলেট মাখানো স্কেল তুলল। তার স্কার্টের পেছনে চকলেটের দাগ লেগে আছে। "ওহ্ মাই গড!" আরতির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে ক্লাসের সবাই তার দিকে তাকাল।

"আরতি, বসো!" গিল ম্যাডাম এত জোরে বললেন যে পেছনের সারির ছেলেমেয়েরাও ভয়ে কেঁপে উঠল। গিল ম্যাডাম শব্দ পছন্দ করেন না, সেটা সুন্দর বেণী করা কোন মেয়ে করলেও।

রাঘব আর আমি চিন্তিত দৃষ্টি বিনিময় করলাম। আমরা প্রমাণ ফেলে রেখে এসেছি।

"ম্যাডাম, কেউ আমার চেয়ারে একটা ময়লা স্কেল রেখে গিয়েছে। আমার নতুন স্কুল ড্রেস নষ্ট হয়ে গিয়েছে," বিলাপের সুরে বলল আরতি।

ক্লাসের সবাই হেসে উঠলে আরতি কাঁদতে লাগল।

"কি?" ম্যাডাম বললেন। চক রেখে হাত মুছে আরতির কাছ থেকে স্কেলটা নিলেন তিনি।

আরতি ফোপাতেই থাকল। ম্যাডাম দুই সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি যার পাশ দিয়েই যাচ্ছেন, সে ভয়ে চেয়ারের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ চকলেট কেক এনেছে কে?"

"আমি এনেছি," বলল আরতি। সে তার টিফিনবক্স খুলতেই বুঝতে পারল কিভাবে তার নিজের কেকই তার জামা নষ্ট করেছে। তার আর্তনাদ কয়েক ডেসিবেল বেড়ে গেল। "কে যেন আমার কেক খেয়ে ফেলেছে," আরতি এত জোরে চিৎকার করল যে পাশের ফাইভ-বি ক্লাস থেকেও শোনা যাবে নিশ্চয়ই।

কেকের অর্ধেকটা মাত্র, আমার বলতে ইচ্ছে করছে।

রাঘব আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "স্বীকার করবি?"

"পাগল হয়েছিস?" আমিও ফিসফিস করে জবাব দিলাম।

গিল ম্যাডাম আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাডাম সোনালী রঙের স্লিপার পরেছেন যেটার চামড়ার ফিতার উপরে নকল ক্রিস্টাল বসানো। আমি হাত মুঠি করলাম, আঙুলগুলো এখনো পিচ্ছিল।

ম্যাডাম পেছন থেকে হাটতে হাটতে আবার সামনে চলে গেলেন। পার্স থেকে একটা টিস্যু নিয়ে স্কেলটা মুছলেন। "এটা কার তাড়াতাড়ি বলে ফেল, নয়তো শাস্তি অনেক খারাপ হবে," সতর্ক করে দিলেন তিনি।

আমি না শোনার ভান করে গণিত খাতা বের করলাম।

"জিএম কে?"

আমি স্কেলে কম্পাস দিয়ে আমার নামের আদ্যাক্ষর লিখে রেখেছিলাম, ম্যাডাম পড়ে ফেলেছে। *ধুর!*

আমাদের ক্লাসে দু'জনের নামের অদ্যাক্ষর জিএম। একজন গিরিশ মাথুর, প্রথম সারিতে বসা। সে কোন রকম দেরি না করে দাঁড়িয়ে গেল।

"আমি এটা করি নি, ম্যাম," বলে গলায় চিমটি কেটে ধরল সে। "ভগবানের দোহাই, ম্যাম।"

ম্যাডাম ওর দিকে আড়চোখে তাকালেন, এখনো সন্দিহান।

"আমি গঙ্গার কসম করে বলছি ম্যাম," বলতে বলতে গিরিশ কেঁদে ফেলল।

গঙ্গার রেফারেন্স কাজে দিল। সবাই বিশ্বাস করল তাকে।

"আরেকজন জিএম কে? গোপাল মিশ্রা!" ম্যাডাম আমার নাম ঘোষনা করলেন।

ক্লাসের সবগুলো চোখ আমার দিকে ফিরল। ম্যাডাম আমার ডেস্কের দিকে হেঁটে আসলেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। না আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করলাম না ম্যাডাম।

ঠাস! ঠাস! দুটো চড় খেলাম। গাল দুটোতে যেন হুল ফুটছে।

"খাবার চুরি, না? চোর নাকি তুমি?" ম্যাডাম বললেন। ম্যাডাম আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বৃটিশ কুইন্স মিউজিয়াম থেকে কোহিনূর হীরা চুরি করে ফেলেছি, যেটার কথা দুইদিন আগে সামাজিক বিজ্ঞান স্যার বলেছিলেন।

আমি মাথা নিচু করে রাখলাম। ম্যাডাম ঘাড়ের পেছনে কষে চড় মেরে বললেন, "বের হয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে!"

আমি ক্লাসের বাইরে পদার্পন করলাম, যদিও ফাইভ-সি ক্লাসের সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আরতি, যাও বাথরুমে গিয়ে পরিস্কার হয়ে আস," গিল ম্যাডাম বললেন।

আমি দেয়ালের দিকে মুখ করে রইলাম। আরতি চোখ মুছতে মুছতে আমাকে অতিক্রম করে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ড্রামা কুইন! আধপিস চকলেট কেকের জন্য কত কিছু! মনে মনে ভাবলাম আমি।

যাহোক, এভাবেই আমি, গোপাল মিশ্রা, মহান আরতি প্রতাপ প্রধানের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবশ্যই বলব, যদিও এটা আমার গল্প, এখানে আমাকে খুব একটা ভাল লাগবে না। মোটকথা, শুরু করার জন্য ১০ বছর বয়সি একটা চোর পছন্দের পাত্র হবে না নিশ্চয়ই।

আমার জন্ম বারানশিতে, যাকে আমার সামাজিক বিজ্ঞান স্যার বলেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শহরগুলোর একটি। খৃস্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীতেই এখানে মানববসতি শুরু হয়েছিল। বরুণা এবং আশী এ-দুটো নদীর নামে শহরটির নামকরণ, যেগুলো শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। আমার শহরটাকে মানুষ বিভিন্ন নামে ডাকে–কাশী, বেনারেস অথবা বানারাস–এটা নির্ভর করে তার নিজের অঞ্চলের উপর। কেউ কেউ একে মন্দিরের শহর বলে, কারন মন্দির আমাদের এখানে হাজারটা আছে, কেউবা বলে জ্ঞানার্জনের শহর, কারন বারানশিতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি সহজ কথায় বারানশিকে বলি আমার দেশ। আমি গাধোলিয়ার কাছাকাছি থাকি, এটা এত কোলাহলপূর্ণ এক জায়গা যে আপনাকে ঘুমুতে হলে সবসময় কানে তুলার বল গুজে রাখতে হবে। গাধোলিয়া শহরটা গঙ্গা নদীর ঘাটের কাছে। তাই শহরের ভীরভাট্টা যদি বেড়ে যায়, আপনি দৌড়ে ঘাটে চলে

গিয়ে গঙ্গা নদীর তীরে বসে মন্দিরগুলো দেখতে পারেন। কেউ কেউ আমার শহরটাকে বলে সুন্দর, পবিত্র আর আধ্যাত্মিক, বিশেষ করে যখন বিদেশী কোন পর্যটককে এ শহরের পরিচয় দেয়া হয়। অনেকে একে নোংরা আর আস্তাকুড়ে বলে। আমি মনে করি না আমার শহর নোংরা। আসলে নোংরা মানুষেরাই একে নোংরা করে রাখে।

যাহোক, মানুষ বলে আপনার জীবনকালে একবার হলেও বারানশিতে আসা উচিৎ। তবে, আমরা অনেকে আজীবনই এখানে কাটিয়ে দিচ্ছি।

আমার পকেটে একটা পেন্সিল ছিল। ওটা দিয়ে আমি দেয়ালে বড় করে 'ফাইভ সি' লিখলাম। এতে আমার সময়টাও ভাল কাটল, আবার আমাদের ক্লাসটাকেও সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সে টয়লেট থেকে বেড়িয়ে এল–মুখ ভেজা, সম্পূর্ণ ড্রামা কুইনের ভাব এবং দৃষ্টি কঠোরভাবে আমার দিকে নিবদ্ধ–ক্লাসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

সে এদিকে আসার সময় আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। "তুমি দেয়ালে দাগ দিচ্ছ!" বলল সে।

"যাও, নালিশ কর গিয়ে," আমি বললাম। "যাও।"

"তুমি আমার টিফিন চুরি করলে কেন?" সে বলল।

"আমি তোমার টিফিন চুরি করি নি," বললাম তাকে। "আমি তোমার চকলেট কেকের থেকে তিন কামড় খেয়েছি। যেটা তুমি বুঝতেও পারতে না।"

"তুমি আসলেই একটা বাজে ছেলে," আরতি বলল।

অধ্যায় ২

আমাদের পারিবারিক উকিল দুবে-কাকা চারটা লাড্ডুর একটা ছোটবাক্স আমাদের দিকে ঠেলে দিল।

"মিষ্টি? মিষ্টি কিসের?" বাবা বললেন।

দুবে-কাকা আমাদের বাসায় এসেছেন। বাবা আর আমি আমাদের অতিপ্রাচীন ডাইনিং টেবিলে তার মুখোমুখি বসে আছি।

"শুনানির একটা তারিখ দিয়েছে," দুবে-কাকা বলল। "সুখবরটা আসতে এত দেরি হল, আমার মনে হল একটু মিষ্টিমুখ করা দরকার।"

আমি ভাবলাম, ড্রামা কুইন আরতিকে তার কেকের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু লাড্ডু দিতে পারলে ভাল হত। আমি একটা চকলেট কেক কিনে তার ডেস্কে ঠাস করে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেক কেনার টাকা আমার কাছে নেই। বাবা আমাকে কোন পকেট খরচের টাকা দেয় না। আসলে তার নিজের পকেটেই তেমন টাকা নেই।

আমার মায়ের অসুস্থতা আমাদের সব সঞ্চয় নিঃশেষ করে দিয়েছে। আমার বয়স চার হবার দুই সপ্তাহ আগেই সে মারা যায়। আমি তার বা তার মৃত্যু সম্পর্কে বেশি কিছু মনে করতে পারি না। বাবা বলেন, মা মারা যাবার একমাস পর্যন্ত তাকে মায়ের ওড়না পরে আমার পাশে ঘুমুতে হত। তার মৃত্যুর পরে জমি নিয়ে বিবাদ শুরু হল। এ কারনেই দুবে-কাকা এখন আমাদের বাসার নিয়মিত অতিথি।

"একটা শুনানির দিন দেয়াতেই আপনি মিষ্টি নিয়ে এসেছেন?" বাবা কাশতে কাশতে বললেন। এই কেস বাবাকে তার নিজের জমি তো ফিরিয়ে দিচ্ছেই না বরং তার শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে তুলছে।

"আসলে, ঘনশ্যাম কেসটা কোর্টের বাইরে মীমাংসা করতে চাচ্ছে," দুবে-কাকা বলল।

ঘনশ্যাম টায়াজি, আমার বাবার সম্মানিত বড় ভাই, আমাদের সাথে প্যাচ খেলছে। আমার দাদা তার দুই ছেলের জন্য লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের কাছে ত্রিশ একর কৃষিজমি রেখে গিয়েছেন, যা সমান ভাগে ভাগ হবার কথা ছিল। দাদার মৃত্যুর পরপরই সম্পত্তির অর্ধেক যা বাবার নামে ছিল তা বন্ধক রেখে ঘনশ্যাম চাচা ব্যাংক থেকে লোন নেন কাগজপত্র জালিয়াতি করে আর ব্যাংক অফিসারদের ঘুষ দিয়ে।

ঘনশ্যাম টায়াজি ব্যবসায় লস করে টাকাগুলো খোয়ালেন। ব্যাংক আমাদের কাছে বন্ধকি সম্পত্তি দখলের নোটিস পাঠাল। বাবা প্রতিবাদ করলে ব্যাংক বাবা-চাচা দুজনকেই মামলায় ফাসিয়ে দেন। দুই ভাই আবার একে অন্যকে মামলায় ফাঁসান। এই সকল মামলা অমাদের আইন ব্যবস্থার মহাসড়কে গরুর গাড়ির থেকেও ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

"মীমাংসা?" বাবা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন।

আমি একটা লাড্ডু তুলে পকেটে রাখলাম।

"ঘনশ্যাম আপনাকে কিছু টাকা দিবে। বিনিময়ে সে আপনার জমিটা নিয়ে ব্যাংক আর মামলার মোকাবেলা করবে," দুবে-কাকা বলল।

"কত দিবে?" বাবার প্রশ্ন।

"দশ লাখ।"

বাবা চুপ করে থাকলেন। আমি ঝট করে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিলাম। সে নিশ্চয়ই দুটো পেলে খুশি হবে, ভাবলাম।

"আমি স্বীকার করছি, পনের একরের জন্য প্রস্তাবটা হাস্যকরভাবে কম," দুবে-কাকা বলতে থাকল, "কিন্তু আপনার সম্পত্তিতে তো লোনই আছে কোটি টাকার।"

"লোন তো আমি করি নি!" বাবা এত জোরে বলল যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাবা সাধারণত এত জোরে কথা বলেন না।

"সে তো ব্যাংকে আপনার কাগজপত্র জমা দিয়েছে। আপনার জমির দলিল তাকে দিয়েছেন কেন?"

"সে আমার বড় ভাই," বাবা খুব কষ্টে চোখের পানি ধরে রেখে বললেন। জমি হারানোর চেয়ে ভাইকে হারানোই তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে।

"আপনি আরো টাকা চাইলে বলুন, আমি তাকে বলব। সারাজীবন মামলা চালাবেন নাকি?" দুবে-কাকা বলল।

"আমি কৃষকের ছেলে। আমি এ জমি দিতে পারব না," বলতে বলতে বাবার চোখ লাল হয়ে গেল। "মরার আগপর্যন্ত না। তাকে বলেন, জমি নিতে চাইলে আগে যেন আমাকে খুন করে।"

এরপর বাবা আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। ততক্ষণে আমার হাত তৃতীয় লাড্ডুর কাছে পৌছে গিয়েছে।

"ঠিক আছে, সবগুলো নিয়ে নাও," দুবে-কাকা বলল।

আমি একবার বাবার দিকে একবার দুবে-কাকার দিকে তাকালাম। এরপর বাক্সটা তুলে দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।

তার টেবিলে ঠাস করে বাক্সটা রাখলাম আমি।

"এটা কি?" সে আমার দিকে তকিয়ে বলল।

"আমি তোমার কেক খেয়ে ফেলেছিলাম, আমি সরি," শেষ কথাটা ক্ষীণস্বরে বললাম।

"আমি লাড্ডু খাই না," সে জানিয়ে দিল।

"কেন? তুমি কি ফিরিঙ্গি নাকি?" বললাম তাকে।

"না, লাড্ডু খেলে মানুষ মোটা হয়ে যায়। আমি মোটা হতে চাই না।"

"চকলেট কেক মানুষকে মোটা বানায় না?"

"আমি এটা খাব না," বলে সে ভদ্রভাবে বাক্সটা আমার দিকে ঠেলে দিল।

"ঠিক আছে," বলে আমি বাক্সটা তুলে নিলাম।

"তুমি কি তখন সরি বলেছ?" আরতি বলল।

"হ্যা, বলেছি।" আমি তার খেয়ালি বেণীদুটো খেয়াল করলাম, ওগুলো লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। তাকে একটা কার্টুন চরিত্রের মত লাগছে।

"মাফ করে দিলাম," সে বলল।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম। "সত্যিই তুমি লাড্ডু খাও না?"

"না, মোটা মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হতে পারে না," সে বলল।

"তুমি এয়ার হোস্টেস হতে চাও?"

"হ্যা।"

"কেন?"

"তারা সব জায়গায় উড়ে যেতে পারে। আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখতে চাই।"

"ও আচ্ছা।"

"তুমি কি হতে চাও?" আরতি জিজ্ঞেস করল।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, "বড়লোক।"

সে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন আমার বড়লোক হতে চাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। "তোমরা কি এখন গরিব?"

"হ্যা।"

সে বলল, "আমরা বড়লোক। আমাদের একটা গাড়ি আছে।"

"আমাদের গাড়ি নেই। ঠিক আছে, এখন আমি যাই।" আমি আসার জন্য মুখ ফেরাতেই আরতি আবার কথা বলল।

"তোমার মা তোমাকে টিফিন দেয় না কেন?"

"আমার মা নেই," বললাম আমি।

"মারা গিয়েছেন?"

"হ্যা।"

"ঠিক আছে, বাই।"

আমি আমার চেয়ারে চলে আসলাম। বাক্সটা খুলে সবে একটা লাড্ডু তুলেছি, এমন সময় আরতি আমার দিকে হেটে এল।

"কি?" বললাম তাকে।

"তুমি মাঝেমধ্যে আমার টিফিন খেতে পার। তবে বেশি খেও না। আর কেক বা এরকম মজার কিছু থাকলেও খাবে না।"

"থ্যাংকস," আমি বললাম।

"তবে গোলমাল পাকিও না। তুমি যদি চাও বিরতির সময় আমরা একসাথে খেতে পারি।"

"তাহলে তোমার নিজেরই কম হবে," আমি বললাম।

"তাতে সমস্যা নেই, ডায়েট করছি। আমি মোটা হতে চাই না," বলল আরতি।

অধ্যায় ৩

সাত বছর পরে

"আগে আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসো, পরে ক্রিকেট মাঠে যাও," আরতি বলল।

এক পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরছি। আরতি আর আমি গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহেই এটা করছি। ফুলচাঁদ ভাই, আশী ঘাটের এক মাঝি তার নৌকা আমাকে নিতে দেয়। একটা মোটা গরু আটকে যাবার মত সরু গলি দিয়ে হাটতে হাটতে আমরা ঘাটসংলগ্ন মেইন রোডে চলে এলাম।

"এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, আরতি। রাঘব চেঁচামেচি করবে।"

"তাহলে আমি তোমার সাথে আসি। বাড়িতে বসে বসে বিরক্ত হবার কোন মানে হয় না," আরতি বলল।

"না।"

"কেন?" সে চোখ পিটপিট করে বলল।

"অনেক ছেলে ওখানে। ঐদিনের শিস বাজানোর কথা মনে আছে?"

"আমি ওসব ম্যানেজ করতে পারি," বলল আরতি। সে তার কপালের ওপর বাতাসে চলে আসা চুলগুলো সরাল।

আমি তার সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললাম, "ওদের সাথে কি করা উচিৎ তার কিছুই তুমি জান না।" আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আমার সাথে কি করা উচিৎ তার কিছুই তুমি জান না।

আরতির সুন্দর চেহারা সবসময়ই স্কুলের টিচারদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষ করে তার বয়স যখন পনের হল, সারা স্কুলে তাকে নিয়ে হৈ-চৈ লেগে গেল। "সানবিম স্কুলের সবচে সুন্দরি মেয়ে," "তার অভিনেত্রি হওয়া উচিৎ," অথবা, "সে মিস্ ইন্ডিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে," এই কথাগুলো খুবই কমন হয়ে গেল। অনেকে আবার তাকে খুশি করার জন্য এসব বলতে লাগল। আসলে, তার বাবা একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার আর দাদা এককালের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হওয়ার কারনে সবাই আরতির সুনজরে থাকতে চায়।

তবে হ্যা, আরতি বারানশির হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

সিগরা স্টেডিয়াম ক্রিকেট মাঠে সে ঢুকলেই খেলার বারোটা বেজে যাবে। ব্যাটসম্যান বল মিস্ করবে, ফিল্ডার ক্যাচ ছেড়ে দিবে আর বেকার বখাটেগুলো শিস তো বাজাবেই, আজেবাজে কথা বলতেও ছাড়বে না।

"অনেকদিন রাঘবকে দেখি না," আরতি বলল। "চল, আমি তোমাদের খেলা দেখব।"

"ওর সাথে আগামিকাল কোচিংয়েই দেখা হবে," আমি সংক্ষেপে বললাম। "এখন বাসায় যাও।"

"তুমি কি আমাকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসবে?"

"একটা রিকশা নাও।"

সে আমার কব্জি খাঁমচে ধরল। "তুমি এখন আমার সাথে যাচ্ছ," সে আমার হাত ধরে সামনে পেছনে দোলাতে লাগল। ততক্ষণে আমি তার বাড়ির পথেই হাটছি।

আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যেন সে আমার হাত না ধরে। এটা বার বছর বয়সে ঠিক আছে, কিন্তু সতের বছর বয়সে না। যদিও এটা আমার কাছে বার বছরের তুলনায় সতের বছরেই বেশি ভাল লাগছে।

"কি হল?" সে বলল। "এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমি তোমার হাত ধরে আছি শুধুমাত্র যেন তুমি দৌড় দিতে না পার।"

আমি হাসলাম। আমরা হাটতে হাটতে কোলাহলপূর্ণ মার্কেট এলকা পার হয়ে কিছুটা শান্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকলাম। আমরা আরতির বাবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতাপ ব্রিজ প্রধানের বাংলোর সামনে আসলাম।

সন্ধ্যার আকাশ গাঢ় কমলা রূপ নিল। রাঘব নিশ্চয়ই খেলায় দেরি হওয়ার জন্য রাগ করবে। যাহোক, আমি আরতিকে না করতে পারি না।

"থ্যাংক ইউ," আরতি বাচ্চাদের মত কণ্ঠে বলল। "ভেতরে আসবে?"

"না, এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে," আমি বললাম।

আমাদের চোখাচোখি হল। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম। আমরা খুব ভাল বন্ধু, এর বেশি কিছু না, মনে মনে বললাম।

মৃদু বাতাসে তার চুল উড়তে লাগল। কিছু চুল আলতোভাবে পরশ বুলিয়ে গেল তার মুখে।

"আমার চুল ছেঁটে ফেলা উচিত, বড় চুলের যত্ন নেয়া কঠিন," আরতি বলল।

"না, কাটবে না," আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

"আমি তোমার কারনেই লম্বা রাখছি। বাই!" সে বলল।

আমি ভাবতে লাগলাম, সে কি আমার প্রতি অন্যরকম কিছু অনুভব করছে, যেরকমটা আমি করছি? কিন্তু কিভাবে জিজ্ঞেস করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

"কাল কোচিংয়ে দেখা হবে," হাটতে হাটতে আমি বললাম।

"রাঘব কাশ্যপ," স্যার জোরে ডেকে একটা উত্তরপত্র তুলে ধরলেন।

রাঘব, আরতি আর আমি দুর্গাকুন্ডতে জেএসআর কোচিংয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ভর্তি হয়েছি। জেএসআর নামকরণ করা হয়েছে–মিঃ জোহা, মিঃ সিং এবং মিঃ রায়, এই তিন প্রতিষ্ঠাতার নাম থেকে। এখানে AIEEE (All India Engineering Entrance Exam) এবং IIT JEE (Indian Institute of Technology

Joint Entrance Exam) এর জন্য মোক টেস্ট নেয়া হয়। এআইইইই তে বছরে দশ লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করে যাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস্ অব টেকনোলজিতে চান্স পায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ইচ্ছুক সবাই এ পরীক্ষা দেয়। আমি ঠিক ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই নি। আমার এখানে পড়তে আসার কারন বাবা আমাকে ইঞ্জিনিয়ার দেখে যেতে চান।

রাঘব চল্লিশজন ছাত্রছাত্রিতে ঠাসা ক্লাসের মধ্যদিয়ে তার উত্তরপত্র আনতে গেল।

"আশির মধ্যে ছেষট্টি, চমৎকার রাঘব," স্যার বললেন।

"আইআইটি নিশ্চিত," রাঘব পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা ছেলে ফিসফিসিয়ে বলল। "ও সানবীম স্কুলের সেরা ছাত্র।"

আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি রাঘব তার আইআইটিএন বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে যে কিনা বিএইচইএল-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমি আশির মধ্যে পঞ্চাশ পেয়েছি, নূন্যতম পারফরম্যান্স, যা দিয়ে ক্রিকেট টিমে বার নাম্বার প্লেয়ার হওয়া যায় কিন্তু খেলা যায় না।

"আরো মনযোগ দাও গোপাল," স্যার বললেন। "নিশ্চিত থাকতে হলে তোমাকে ষাটের উপর তুলতে হবে।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। একটা ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে হবে আমাকে। বাবা অনেক বছর হয় কোন খুশির খবর শোনেন না।

"আরতি প্রধান!" স্যার ডেকে উঠলেন। সারা ক্লাস সাদা সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটার দিকে তাকাল, যে আমাদের একঘেয়ে কোচিং ক্লাসগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

আরতি তার উত্তরপত্র হাতে নিয়ে ফিক ফিক করে হেসে ফেলল।

"আশির মধ্যে বিশ পাওয়াটা কি হাসির ব্যাপার?" ভ্রু কুঁচকে স্যার বললেন।

আরতি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পেছনে চলে আসল। তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই। তার জেএসআর-এ ভর্তি হওয়ার কারন, ক) কোচিং ক্লাসে স্কুলের পড়াশোনা রিপিট হবে, খ) আমিও এখানে এসেছি তাই সে সঙ্গ পাবে, গ) কোচিং সেন্টার কখনোই তার কাছে টাকা চাইবে না, যেহেতু তার বাবা শহরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার অর্থাৎ ডিএম হওয়ার পথে।

আরতির বাবার সৎ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। যাহোক, ক্ষমতার স্বার্থেই ফ্রি টিউশন পাওয়া যাচ্ছে।

"আমি এআইইইই ফর্মই পূরন করি নি," আরতি আমার কানে কানে বলল।

"আমার এআইইইই র‍্যাঙ্ক ভয়াবহ হতে যাচ্ছে," লেমনেড নাড়তে নাড়তে বললাম আমি।

আমরা নারাদ ঘাটের কাছে জার্মান বেকারিতে এসেছি। এটা একটা টুরিস্ট জোন যেখানে সাদা চামড়ার মানুষরা বারানশির রোগ-জীবাণু এবং দালালদের হাত থেকে নিরাপদে থাকে। মানুষজন এখানে খাটিয়ায় বসে কাঠের ট্রেতে করে বিদেশী খাবার-

দাবার, যেমন স্যান্ডউইচ, প্যানকেক এসব খায়। দুজন হ্যাংলা বয়স্ক মানুষ এক কোণায় বসে সেতার বাজাচ্ছে, বারানশির এফেক্ট দেয়ার জন্য যেহেতু বিদেশীরা এটাকে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে নেয়।

আমি কখনোই আমার র‍্যাঙ্ক নিয়ে ভাবি না। তবে আরতি ভাবে।

"তার স্কার্ফ দিয়ে চুল বাধার স্টাইলটা আমার পছন্দ হয়েছে," আরতি একজন মহিলা টুরিস্টকে দেখিয়ে বলল। সে অবশ্যই আমার এআইইইই উদ্বিগ্নতা আমলে নিচ্ছে না।

"দশটা মাত্র নাম্বার বেশি পেলেই হয়ে যাবে, নিশ্চিন্তে থাক," রাঘব বলল।

"এক লাখ ছাত্রছাত্রি বসে আছে আমার আর এই দশ নাম্বারের মধ্যে," আমি বললাম।

"অন্যের চিন্তা বাদ দে। নিজের প্রতি মনোযোগ দে," সে বলল।

আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম। একজন টপ-স্টুডেন্ট হলে উপদেশ দেয়া খুব সহজ। আমি আমাকে সমুদ্রের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক কম নম্বরধারীদের সাথে, হাত-পা ছুড়ছি আর চিৎকার চেঁচামেচি করছি নিঃশ্বাসের জন্য। আমাদের উপর দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে, অবান্তর হিসেবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে। মাত্র তিন সপ্তাহ পরে এআইইইই সুনামি আঘাত করবে।

আরতি আমার মুখের সামনে তুরি বাজাল। "কি স্বপ্ন দেখছ বসে বসে? বাদ দাও তো, সব ঠিক হয়ে যাবে," সে বলল।

"তুমি পরীক্ষা দিবে না?" রাঘব আরতিকে বলল।

"নাহ্!" সে হাসতে হাসতে বলল। " 'ম্যায় হু না' মুক্তি পাচ্ছে ঐ সপ্তাহে। শাহরুখ খানের ছবি মিস করি কিভাবে? পরীক্ষা স্থগিত করা দরকার।"

"মজা পেলাম," আমি ব্যঙ্গ করে বললাম।

"তাহলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও না। আসলে কি হতে চাও তুমি?" রাঘব আরতিকে জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে কি কিছু করতেই হবে? আমি ইন্ডিয়ার মেয়ে। আমি কি বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে পারি না? বাড়িতে বসে থাকব আর রান্না করব? অথবা কাজের লোককে বলব রেঁধে দিতে?" বলে সে হাসতে লাগল। রাঘবও সেই হাসিতে যোগ দিল।

আমি এখানে হাসির কিছু পেলাম না। লাখ লাখ হবু ইঞ্জিনিয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে আমাকে কাত করে ফেলবে, এর বেশি আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

"গোপাল সাহেব, এত সিরিয়াস হয়ে গেলে কেন? আমি তো মজা করছি। তুমি জান, আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না," আমার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে আরতি বলল।

"চুপ কর আরতি," আমি বললাম। "তুমি তো আবার এয়ার হোস্টেস হতে চাও।"

"এয়ার হোস্টেস? দারুণ!" রাঘব বলল।

"এটা ঠিক না গোপাল!" আরতি চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি সবাইকে আমার গোপন কথা বলে বেড়াচ্ছ।"

"আরে আমাকেই তো বলেছে, নাকি?" রাঘব বলল।

আরতি আমার দিকে বিরক্তিভরে তাকাল।

"সরি," বললাম তাকে।

আরতি আর আমার সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর। আমরা রাঘবকে বন্ধু হিসেবে দেখি কিন্তু তত কাছের মনে করি না।

"এয়ার হোস্টেস হিসেবে তোমাকে চমৎকার মানাবে," রাঘব কৃত্রিম আবেগের সাথে বলল।

"হ্যা, হয়েছে," আরতি বলল। "আব্বু যেন আমাকে বারানাশির বাইরে যেতে দিবে! এখানে কোন এয়ারপোর্ট আছে? খালি মন্দির আর মন্দির। আমি সম্ভবত মন্দির হোস্টেস হতে পারব। স্যার, দয়া করে মেঝেতে আপনার আসন গ্রহণ করুন। প্রার্থনা এখনি শুরু হবে। আপনার আসনেই প্রাসাদ দিয়ে যাওয়া হবে।"

রাঘব আবার হেসে উঠল তার পেশিময় তলপেট চেপে ধরে। যাদের পেট প্রকৃতিগতভাবে মেদহীন তাদের দেখলে আমার শরীর জ্বলে ওঠে। *ঈশ্বর কেন সব পুরুষের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সিক্স প্যাক দেন না? কেন আমাদের এই জায়গাতেই চর্বি জমাতে হয়?*

রাঘব আরতির সাথে হাই-ফাইভ করল। আমার কান গরম হয়ে যাচ্ছে। সেতার বাদকরা উদ্দীপক বাজনা শুরু করল।

"আরতি, কি আবোল-তাবোল বকা শুরু করেছ?" আমি এত জোরে বললাম যে আমাদের আশেপাশের বিদেশীরা যারা কিনা শান্তি খুঁজতে এখানে এসেছে, সতর্ক হয়ে উঠল।

রাঘব আর আরতির একজন আরেক জনের কথায় মজা খুঁজে পাওয়া আমার কাছে একটুও ভাল লাগছে না।

রাঘব এত জোরে পাইপ দিয়ে লেমনেডে টান দিল যে তার নাক দিয়ে তা বেরিয়ে এল।

"খ্যাত!" আরতি বলতেই তারা দুজনে আবার হাসিউৎসবে মেতে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"কি হল?" রাঘব জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে যেতে হবে, বাবা অপেক্ষা করছে।"

বাবার কাশির শব্দ কয়েকবার কলিং বেলের শব্দকে ছাপিয়ে গেল।

"সরি, শুনতে পাই নি," দরজা খুলতে খুলতে বললেন তিনি।

"তুমি ঠিক আছ তো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা, আরে এটা তো স্বাভাবিক। আমি ডাল আর রুটি বানিয়েছি।"

"এটাও তো স্বাভাবিক।"

বাবা গতবছর ষাটে পড়েছেন। তার বিরামহীন কাশি তার বয়স আশি বানিয়ে ফেলেছে। ডাক্তাররা আশা ছেড়েই দিয়েছেন। আমাদের অবশ্য সার্জারি করার টাকাও নেই। স্কুল থেকে অনেক আগেই তার বিদায় নিতে হয়েছে। পঞ্চাশ মিনিটের একটা ক্লাশে দশটা কাশির বিরতি নিয়ে তো আর পড়ানো যায় না। একটা পেনশন পান যাতে একটা মাসের মোটামুটি তিন সপ্তাহ চলে।

আমি নড়বড়ে ডায়নিং টেবিলে নিঃশব্দে খেতে লাগলাম।

"ভর্তি পরীক্ষা..." এতটুকু বলেই বাবা থেমে পাঁচবার কাশলেন। আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম।

"আমি এআইইইই প্রস্তুতি শেষ করেছি," বললাম তাকে।

"জেইই?" বাবা বললেন। পারিবারিক প্রত্যাশা পূরণ করা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার চেয়েও কঠিন।

"আমার জন্য আইআইটি আশা কোরো না, বাবা," আমি বললাম। বাবার চেহারা কাল হয়ে গেল। "আমি পরীক্ষা দিব, কিন্তু চার লাখের মধ্যে মাত্র তিন হাজার চান্স পাবে...ভেবে দেখ!"

"তুই পারবি, অবশ্যই পারবি। তুই যথেষ্ট মেধাবি," বাবা বললেন। ভালোবাসার কারণে বাবা-মা সবসময়ই সন্তানদের যোগ্যতা বড় করে দেখে।

আমি মাথা নাড়লাম। আমি এআইইইই'র জন্য চেষ্টা করছি, মোটেও জেইই'র জন্য না। আমি এতদিন এটাই ভেবে এসেছি। বাবা যদি বুঝতে পারত আমার চান্স পাওয়া মানে বাড়ি থেকে দূরে চলে যাওয়া। আমাকে যদি এনআইটি আগরতলা বা আরও দূরে কোথাও চলে যেতে হয়?

"ইঞ্জিনিয়ারিংই জীবনের সবকিছু না বাবা," আমি বললাম।

"এটা জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। এখন দ্বিমত করিস না বাবা, অন্তত পরীক্ষার আগমুহূর্তে।"

"আমি দ্বিমত করছি না, মোটেও না।"

রাতের খাবারের পরে বাবা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি তার পাশে বসে তার কপাল টিপে দিতে লাগলাম। তিনি কাশতে শুরু করলেন।

"অপারেশনের কথা চিন্তা করে দেখ," আমি বললাম।

"দু-লাখ দিয়ে?" বাবা চোখ বন্ধ করে বললেন।

আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে চুপ করে থাকলাম। আমি মর্মস্পর্শী বিষয়গুলো তুলতে চাই না। আমরা চাইলে কয়েক বছর আগেই জমির মামলা নিষ্পন্ন করে ফেলতে পারতাম। আদালত এখনো আমাদের তাড়া করছে, জমি নিষ্ফলা পড়ে আছে, আর আমাদের কাছে কোন টাকা নেই।

"টাকা কোথা থেকে পাবি, বল?" বাবা বললেন। "তুই ইঞ্জিনিয়ার হ, ভাল একটা

চাকরি কর, তখন অপারেশন করা যাবে।"

আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। "টায়াজি দশ লাখ দিতে চেয়েছিল। ঐ টাকা এতদিনে ব্যাংকে দ্বিগুণ হয়ে যেত।"

বাবা চোখ খুলে তাকালেন। "জমির কি হত?"

"এই ফালতু জমি দিয়ে কি হবে?"

"এভাবে কথা বলবি না," বাবা আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন। "একজন কৃষক কখনোই তার জমিকে অপমান করে না। বিক্রিও করে না।"

আমি আবার তার কপালে হাত রেখে বললাম, "আমরা এখন আর কৃষক নেই, বাবা। আমরা আর জমি দিয়ে কিছুই করতে পারছি না। তোমার আপন ভাই..."

"যা, গিয়ে পড়তে বস। তোর পরীক্ষা চলে এসেছে।" বাবা আমার রুমের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মাঝরাতে ল্যান্ডফোন বেজে উঠল। আমি ধরলাম। "আমার ঘুম আসছে আরতি," বললাম তাকে।

"তুমি একটার আগে ঘুমাও না, গুল মারা বন্ধ কর।"

"কি হয়েছে?"

"কিছু না, কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"অন্য কারো সাথে কথা বল," আমি বললাম।

"আহা," আরতি কলল। "আমি বুঝতে পারছি তোমার কি হয়েছে।"

"বাই আরতি," আমি বললাম।

"এই, দাঁড়াও। রাঘবের কিছু কথা আমার কাছে মজা লেগেছে, আর তো কিছু না। তুমিই তো আমার বেস্টফ্রেন্ড।"

"ওগুলো মোটেও মজার ছিল না। আর এই বেস্টফ্রেন্ড বিষয়টা কি?

"আমরা আট বছর ধরে সবচে ভাল বন্ধু, যদিও তুমি এখনো আমাকে একটা চকলেট কেকও খাওয়াও নি।"

"আর রাঘব?"

"রাঘব শুধু বন্ধু। আমি ওর সাথে কথা বলি কারন ও তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু," আরতি বলল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"হয়েছে তো, গোপাল। বাড়ির কি খবর?" সে বলল।

"সব সময় যেরকমটি থাকে। তুমি কেমন আছো?"

"ভাল। আব্বু চাচ্ছে এয়ার হোস্টেস হওয়ার আগে আমি যেন কলেজ শেষ করি। কিন্তু স্কুল শেষ করেই কেউ চাইলে শুরু করতে পারে।"

"কলেজে ভর্তি হও। উনি ঠিকই বলেছেন," আমি বললাম।

"আমার এই রেজাল্ট নিয়ে কোন কলেজে ভর্তি হব? আমি তো রাঘব আর তোমার মত স্মার্ট না।"

"রাঘব স্মার্ট, আমি না," তাকে শুধরে দিলাম।

"কেন? এই কোচিংয়ের পরীক্ষার জন্য? তুমি আসলেই একটা বোকা," আরতি বলল।

"বোকা তুমি।"

"আমরা দুজনেই বোকা, ঠিক আছে? রাতে খেয়েছ?"

এই প্রশ্নটা সে আমাকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি রাতে জিজ্ঞেস করছে। আমি তার প্রতি পাগল হয়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি না। "করেছি, ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ মানে? গাধা, যাও ঘুমুতে যাও। ভর্তি পরীক্ষার চিন্তা বাদ দাও।"

"আরতি," এতটুকু বলে আমি থেমে গেলাম।

"কি?"

"তুমি আসলে অনেক সুন্দর।" এরচে ভাল আর কিছু বলার সাহস পেলাম না।

"সুন্দর আর বোকা? নাকি সুন্দরভাবে বোকা?" আরতি হাসল।

"তোমাকে ছাড়া আমি কি করব বল?"

"চুপ কর। আমি তো আছিই," সে বলল।

"আমরা এখন আর ছোট নেই আরতি," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর বলতে হবে না। এবার ঘুমুতে যাও, বুড়ো ভদ্রলোক।"

"আরতি, বল না! তুমি সব সময় এড়িয়ে..."

"আমরা কথা বলব, কিন্তু এখন না। তোমার ভর্তি পরীক্ষার পরে।"

আমি চুপ করে থাকলাম।

"জীবনটাকে জটিল করার দরকার নেই, গোপাল। তুমি কি আমাদের বন্ধুত্বে খুশি নও?"

"হ্যা, খুশি, কিন্তু..."

"কিন্তু, কিন্তু কি? গুড নাইট, সুইট ড্রিমস্, স্লিপ টাইট।"

"গুড নাইট।"

"এটার কাজ শেষ," আমি গণিত বই বন্ধ করতে করতে বললাম।

রাঘব পরীক্ষার আগের রাতে আমার বাসায় এসেছে। আমরা পরীক্ষার আগ মুহূর্তে ত্রিকোনমিতির একটা রিভিশন করলাম, যেটা আমার দুর্বল জায়গা। রাঘব ওর বই তুলে নিল।

"এখন ঘুমা, ঠিক আছে? পরীক্ষার আগে বিশ্রাম খুবই দরকার। আর অনেকগুলো তীক্ষ্ণ পেন্সিল নিস," সে বলল।

বাবা রাঘবকে চলে যেতে দেখে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। "রাতের খাবার খেয়ে যাও," বাবা তাকে বলল।

"আজ না, বাবা," রাঘব বলল। "গোপালের র‍্যাঙ্ক পাওয়ার পরে ভরপেট খেয়ে যাব।"

অধ্যায় ৪

র‍্যাঙ্ক অবশ্য একটা পেয়েছি। ফালতু একটা র‍্যাঙ্ক।

"৫২,০৪৩," স্ক্রিন থেকে আমি পড়লাম। শিবপুরে রাঘবের বাড়িতে এসে এআইইইই ওয়েবসাইটে লগ-ইন করেছি।

আমি নিশ্চিত, এত খারাপ রেজাল্ট করি নি। দশলাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে নয় লাখ পঞ্চাশ হাজারের থেকে এগিয়ে আছি। কিন্তু এনআইটিতে মাত্র ত্রিশ হাজার সিট আছে। কখনো কখনো জীবন মানুষের সাথে নিষ্ঠুর পরিহাস করে। আমি ঐসমস্ত অভাগাদের একজন যারা ভাল করেছে, কিন্তু তত ভাল না যে চান্স পাবে।

"৫,৮২০," রাঘব কম্পিউটারের মনিটর থেকে পড়ল।

রাঘবের বাবা এসে আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন।

"কি এটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার র‍্যাঙ্ক," রাঘব বলল।

"দারুণ!" রাঘবের বাবা উৎফুল কণ্ঠে বললেন।

রাঘব হাসলো। সে এর বেশি কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারল না।

"এটা তোকে ইচ্ছেমত বেছে নেয়ার সুযোগ করে দিল," গর্বিত বাবা বললেন। "তুই দিল্লিতে ইলেক্ট্রনিকস্ পেয়ে যেতে পারিস।"

"লক্ষ্ণৌতে-ও তো এনআইটি আছে, তাই না?" রাঘব বলল। "এটা তো বাড়ির কাছে হবে।"

"এআইইইই'র চিন্তা বাদ দে। জেইই'র জন্য অপেক্ষা করা যাক," রাঘবের বাবা বললেন। তার কণ্ঠ উল্লসিত।

আমি যে এই রুমে আছি তা মনে করতে বাবা-ছেলের কিছুটা সময় লাগল। তারা আমার বিষন্ন চেহারা দেখে থেমে গেলো।

"পঞ্চাশ হাজারে কিছু তো পাওয়া যাবে, তাই না?" কিছু যে পাওয়া যাবে না তা জেনেই রাঘবের বাবা বললেন। উনি আমাকে কষ্ট দিতে চান নি, কিন্তু খুব, খুব খারাপ লাগল আমার কাছে। সারা জীবনে কখনোই নিজেকে এত ছোট মনে হয় নি। মনে হচ্ছে যেন আমি একটা ভিখারি হয়ে রাজার পাশে বসে আছি।

"আমি তোর সাথে পরে দেখা করব রাঘব," একথা বলে তাদের বাড়ি থেকে অতিদ্রুত চলে এলাম। আমি কাউকে আমার চোখের জল দেখাতে চাই না।

রাঘব আমার পেছন পেছন দৌড়ে বাড়ির সামনের গলিতে চলে এল। "তুই ঠিক আছিস তো?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি কঠিনভাবে ঢোক গিলে তার দিকে তাকানোর আগে চোখ মুছে নিলাম।

"আমি ঠিক আছি দোস্ত," মিথ্যা বললাম। "তোকে অভিনন্দন! আমরা তোর কাছে খাওয়া পাওনা হয়ে গেলাম। কিন্তু তোর বাবা ঠিকই বলেছেন। আমরা আসল পার্টি করব জেইই রেজাল্টের পরে।"

আমি এরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকলাম যতক্ষন না রাঘব আমাকে বাধা দিল। "বাবা ঠিক থাকবেন তো?"

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে শক্ত করে গলা চেপে রাখলাম।

"আমি কি তোর সাথে আসব?" সে বলল।

ও আচ্ছা! নিজে ফেল করে প্রথম সারির রেজাল্টধারী একজনকে নিয়ে বাবার সাথে দেখা করতে যাওয়াটা চমৎকার হবে, আমি ভাবলাম।

"চিন্তা করিস না। উনি জীবনে আরও অনেক বেশি খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন," আমি বললাম।

"আজ রেজাল্ট দেয়ার কথা না? কই, পত্রিকায় তো কিছু দেয় নি," আমি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বাবা বললেন। মেঝেতে চারটা পত্রিকা পড়ে আছে।

"না, এখন আর পত্রিকায় রেজাল্ট ছাপায় না। বাবা, এরকম অগোছালো করে রেখেছ কেন?" আমি বললাম। পত্রিকাগুলো তোলার জন্য নিচে ঝুঁকলাম। বললাম না যে রেজাল্ট অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে।

"তাহলে আমরা রেজাল্ট পাব কিভাবে? আজই তো দেয়ার কথা, তাই না?" বললেন তিনি।

আমি নিঃশব্দে পত্রিকাগুলো গাঁদা করে রাখতে লাগলাম। আমার তাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে রেজাল্ট কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে না। কয়েকটা দিন তাহলে শান্তিতে থাকা যাবে, যদিও তা অস্থায়ী। আমি তার বয়সের ছাপপড়া মুখের দিকে তাকালাম, তার চোখের চারপাশে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট। চোখ দুটো আজ যথেষ্ট উজ্জ্বল।

"আমরা কি এনআইটি লক্ষ্ণৌ চলে যাব, বল তো?" বাবা বললেন। তার ছেলে ফেল করেছে তা জানতে পাঁচ ঘণ্টার ভ্রমন করতে খুশি যেন।

"বাবা!" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"কি?"

"চল রান্না করতে হবে," বলে আমি রান্নাঘরের দিকে গেলাম। সুপ্রাচীন গ্যাসের চুলাটা ছয় বারের চেষ্টায় জ্বলল। চুলার উপর একটা পাতিলে ডাল সেদ্ধ করার জন্য পানি বসিয়ে দিলাম।

বাবা আমার পেছনে দাঁড়িয়েই রইলেন। "রেজাল্ট তো জানতে হবে, তাই না? চল যাই," বললেন আমাকে। যখন বয়স্ক মানুষেরা কোন কিছুর পেছনে লাগে সেটার

শেষ না দেখে ছাড়ে না।

"আমাকে রান্না করতে দাও তো," বললাম তাকে। "রান্না হয়ে গেলে আমি তোমাকে ডাকব।"

কোন কিছুতে ব্যর্থ হবার পরে সেটা বাবা-মাকে জানানো ব্যর্থতার কষ্ট থেকেও অনেক বেশি কষ্টকর। পরবর্তি এক ঘণ্টা আমি রান্না করলাম। জীবনটা কি আর কখনো আগের মত হবে? একটা ফালতু পরীক্ষা, আধাডজন ভুল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর আমার জীবনটাকে আজীবনের জন্য বদলে দিয়েছে।

বাবা আর আমি একসাথে খেতে বসলাম, তার আশাবাদী চোখ দুটো আমার দিকেই বিদ্ধ হয়ে রইল। খবরটা লুকিয়ে রেখে তেমন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

রাতের খাবার শেষে আমি বাবার কাছে গেলাম। নরমস্বরে বললাম, "আমি রেজাল্ট জানি বাবা।"

"কি পেয়েছিস?" তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

"আমার র‍্যাঙ্ক ৫২,০৪৩।"

"এটা কি ভাল?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"তুই কি ভাল কোন শাখায় ভর্তি হতে পারবি না?"

"আমি এনআইটিতে চান্স পাব না," বললাম তাকে।

বাবার মুখের ভাব বদলে গেল। এমনভাবে তাকালেন যেটা দেখে সব সন্তানই ভয় পায়। যে দৃষ্টি বলে, "আমি তোর জন্য কী না করলাম, আর দেখ তুই কি করেছিস!"

মাথার মধ্যে বুলেটের আঘাতও সেই দৃষ্টি থেকে ভাল।

বাবা বিক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের চারপাশে পায়চারি করতে লাগলেন। "কিভাবে তুই এত খারাপ রেজাল্ট করলি?"

সবাই ভাল করতে পারে না বাবা, নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থী পারে নি। কিন্তু আমি এটা বলতে পারলাম না।

"এখন কি করবি?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ভাবলাম আমি কিছু অপশন বলব কিনা–আত্মহত্যা, হিমালয়ে প্রায়শ্চিত্ত বা শ্রমিকের মত পরিশ্রমী জীবন–এরকম কিছু?

"আমি সরি বাবা।"

"আমি তোকে আরও পড়তে বলেছিলাম," তিনি বললেন।

কোন্ বাবা-মা এটা বলে না?

নিজের রুমে চলে গেলেন তিনি। আধঘণ্টা পরে আমি তার বেডরুমে ঢোকার সাহস করতে পারলাম। তিনি মাথায় একটা গরম পানির বোতল চেপে ধরে রেখেছেন।

"আমি বিএসসি করবো, বাবা," বললাম তাকে।

"তাতে লাভ কি হবে, হাহ্?" এত জোরে বললেন যেটা একজন অসুস্থ মানুষের জন্য বেমানান।

"আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরি খুঁজব, তখন অনেক সুযোগ বেরিয়ে যাবে," আমি বলতে বলতেই কথাগুলো বানিয়ে ফেললাম।

"সাধারণ একজন গ্র্যাজুয়েটকে চাকরি দেবে কে?" বাবা বললেন।

ঠিক, একজন 'সাধারণ' গ্র্যাজুয়েটের কোনই দাম নেই।

"আমাদের প্রাইভেট কলেজে পড়ার মত টাকা নেই বাবা," আমি তাকে স্বরণ করিয়ে দিলাম।

তিনি মাথা নাড়লেন। কিছুক্ষন ভেবে বললেন, "আরেকবার চেষ্টা করবি?"

বাবা অযৌক্তিক কোন পরামর্শ দেন নি। কিন্তু তিনি এটা বললেন কঠিন একটা সময়ে।

এমনিতেই ভর্তি পরীক্ষা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সেটা আরেকবার দেয়ার চিন্তা আমার শারীরিক যন্ত্রণার কারন হয়ে দাঁড়াল। "বাদ দাও তো বাবা," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "তুমি যদি জমিটার নিষ্পত্তি চাইতে তাহলে আমি প্রাইভেট কলেজে পড়তে পারতাম। তুমি কর নি তাই আমাদের ভুগতে হচ্ছে।"

আমার বাবা গরম পানির বোতল তার কপালে জোরে চেপে ধরলেন। তাকে অনেক ব্যথিত দেখাচ্ছে, যার কারন আমি এবং মাথাব্যথা। "যা ভাগ," বললেন তিনি।

"আমি সরি," যন্ত্রের মতো বললাম তাকে।

"পরীক্ষায় ফেল করে বাবার সাথে চেঁচাচ্ছিস। তুই তো ঠিক পথেই যাচ্ছিস বেটা," চোখ বন্ধ অবস্থায় বললেন তিনি।

"আমি কিছু একটা ঠিকই করব বাবা। আমি তোমাকে হতাশ হতে দেব না। একদিন আমি অবশ্যই বড়লোক হব," বললাম তাকে।

"বড়লোক হওয়া এত সহজ না। কঠোর পরিশ্রম দরকার, যেটা তুই করিস না।"

আমার তাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া পঞ্চাশ হাজার র‍্যাঙ্ক পাওয়া সম্ভব নয়, সেটার মূল্য থাকুক বা না থাকুক। আমার আরও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে আমার কেমন লাগছে। উনি যদি বুঝতে পারতেন আমার চিৎকার করে কাঁদতে মন চাইছে, আর খুব ভাল লাগত যদি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন।

আমি আমার রুমে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। এত বছরে আমি কখনোই আমার মা-কে এতটা অনুভব করি নি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সে যদি পাশে থাকত! আমি সেই ছয়টা নাম্বার বেশি না পাওয়ার জন্য নিজেকে ইচ্ছেমত ভর্ৎসনা করলাম। পরীক্ষার দিনটির কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হচ্ছে আমার মস্তিষ্ক যদি ঐসময়ে চলে যেতে পারত, ঐ দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারত, তাহলে আমি আর সেই ভুল করতাম না।

আফসোস নামক এই অনুভূতিটা সম্ভবত মানুষের অন্যতম আত্মশাস্তি ব্যবস্থা। আমরা আফসোস করতেই থাকি, যদিও এর কোনই ফায়দা নেই। আমি হতবুদ্ধি হয়ে বিছানায় বসে রইলাম।

মাঝরাতে বসার ঘরে এসে আরতিকে কল করলাম।

"হেই, তুমি ঠিক আছ তো?" তার কণ্ঠ শান্ত।

সে আমার রেজাল্ট জানে কিন্তু জেনেও সে কল করে নি। জানত আমি শান্ত হলে তাকে কল করব। আরতি আর আমার মধ্যে সময়বোধ চমৎকার।

"আমরা নৌকায় কথা বলব," আমি বললাম।

"কাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় আশী ঘাটে চলে এসো তাহলে," সে বলল।

আরতির সাথে কথা শেষ করে বিছানায় চলে গেলাম। শুয়ে রইলাম কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলাম কোন লাভই হল না। বাবার সাথে কিছু বিষয়ে সমাধানে না আসা পর্যন্ত ঘুম আসবে না।

আমি তার রুমে গেলাম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তিনি, গরম পানির বোতল তার মাথার পাশে পড়ে আছে।

আমি বোতলটা একপাশে সরিয়ে রাখলাম। বাবা জেগে উঠলেন।

"আমি সরি বাবা," বললাম তাকে।

তিনি কিছুই বললেন না।

"বাবা তুমি আমাকে যা করতে বল আমি তাই করব। আমি আবার চেষ্টা করব যদি সেটাই তোমার ইচ্ছে হয়। আমি ইঞ্জিনিয়ার হবই, বাবা।"

উনি একটা হাত আমার মাথায় রাখলেন। যেটি আমার আবেগের জন্য একটা স্পর্শকাতর মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াল। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

"আমি অনেক কঠিন পরিশ্রম করব।" আমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

"প্রভু তোর সহায় হবেন, যা, ঘুমুতে যা," বললেন তিনি।

আমি ভোর সাড়ে পাঁচটায় আশী ঘাটে পৌছলাম। ফুলচাঁদ ভাই, আমার মাঝিবন্ধু আমার হাতে বৈঠা দিতে দিতে হাসলো। সে এত বছরে আমার থেকে কোন টাকা নেয় নি। আমি এক ঘণ্টার জন্য তার নৌকা নেই, বিনিময়ে তাকে চা-বিস্কুট খাওয়াই। যেখানে বিদেশীরা এক ঘণ্টার জন্য পাঁচশ রুপি দেয়।

মাঝেমধ্যে আমি তাকে বিদেশীদের সাথে ইংরেজিতে দরদাম করতে সাহায্য করি। প্রতিবারে সে আমাকে দশ পার্সেন্ট কমিশন দেয়। হ্যা, আমি এভাবেও উপার্জন করতে পারি। হয়ত খুব বেশি হবে না, কিন্তু টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট। শুধুমাত্র বাবা যদি বুঝতে চাইতেন।

"সাড়ে ছয়টার মধ্যে চলে এসো কিন্তু," ফুলচাঁদ বলল। "কিছু জাপানি টুরিস্ট

বুকিং দিয়ে রেখেছে।"

"আমি আধাঘণ্টার বেশি সময় নেব না," বললাম তাকে।

সে হেসে বলল, "তুমি একটা মেয়ের সাথে যাচ্ছ, সময় ভুলে যাওয়াটা তো স্বাভাবিক।"

"ভুলব না।"

"তার সাথে কি তোমার হয়ে গেছে?" ফুলচাঁদ নোঙরের রশি খুলতে খুলতে বলল। ছোট শহরগুলোতে সবাই একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একসাথে দেখলে তাদের সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

"ফুলচাঁদ ভাই, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই চলে আসব," বলে নৌকায় উঠে গেলাম।

জবাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল।

"সে স্কুল থেকেই আমার সাথে পড়ে। আমি তাকে আট বছর ধরে চিনি।"

হাসলো সে। তার পানের দাগপড়া দাঁত ভোরের আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল।

"আমি আপনাকে জাপানিদের সাথে দরদামে সাহায্য করব। আমরা দুজনে মিলে তাদের গলা কাটব," বৈঠা হাতে ধরে বললাম।

আরতি ঘাট থেকে বিশ মিটার দূরে বসে আছে মাঝি আর সাধুদের চোখের আড়ালে। সে আস্তে আস্তে করে এক পা এক পা দিয়ে নৌকায় উঠল। আমি তীর থেকে নৌকা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলাম।

"ঐ দিকে যাই চল," পশ্চিম দিকে যেতে বলল আরতি। ঐ দিকটা মোটামুটি শান্ত। পূর্বদিকে দশাশ্বমেধ ঘাটে সকালের আরতি শুরু হয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাট। প্রচলিত আছে, ওখানে ব্রহ্মা দশটা ঘোড়া বলি দিয়েছিলেন। আর এ জায়গাটা বারানাশির গঙ্গাতীরের সকল পূজার কেন্দ্র।

আমি নৌকা আরও দূরে সরিয়ে নিলে ঘণ্টা আর ভজনগীতির শব্দ অস্পষ্ট হয়ে এল। একটু পরেই বৈঠার পানিতে আঘাত করার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকল না।

"এটা হতেই পারে," আরতি বলল।

সূর্যের আলো পড়ে তার চেহারা থেকে যেন হলুদাভ আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে। এটা তার জাফরান আর লাল ওড়নার সাথে চমৎকার মানাচ্ছে।

আমার হাত আর কাঁধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নৌকা বাওয়া বন্ধ করে বৈঠা রেখে দিলাম। গঙ্গার মাঝখানে কোথাও নৌকা স্থির হয়ে থাকল। আরতি আমার পাশে বসার জন্য উঠে দাঁড়াল। তার নড়াচড়ায় অল্প কেঁপে উঠল নৌকা। সবসময়ের মত সে আমার ক্লান্ত হাত নিয়ে ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। থুতনি ধরে আমার মুখ তার দিকে ফেরাল সে।

"আমার ভয় হচ্ছে আরতি," মৃদুস্বরে বললাম আমি।

"কেন?"

"আমি জীবনে কিছুই করতে পারব না।"

"বোকা," বলল সে। "যারা এআইইইই'তে ভাল র‍্যাঙ্ক পায় না তারা কি জীবনে কিছুই করতে পারে না?"

"আমি জানি না। আমার নিজেকে খুবই...খুবই পরাজিত মনে হচ্ছে। আমার কারনে বাবা অনেক কষ্ট পেয়েছে।"

"সে কি ঠিক আছে?"

"সে চায় আমি যেন আবার চেষ্টা করি। আমাকে ইঞ্জিনিয়ার দেখার ইচ্ছায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

"তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও?" আরতি বলল।

"আমার বাবা ডিএম না। দাদা মন্ত্রী ছিলেন না। আমাদের পরিবার একটা সাধারন ভারতীয়পরিবার। আমরা কখনোই এধরনের প্রশ্ন করি না। আমরা শুধু জীবিকা উপার্জন করতে চাই। আর ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা সুন্দরভাবে করার সুযোগ দেয়," আমি উত্তর দিলাম।

"কত পুরনো আমলের চিন্তা-ভাবনা!"

"পেট ভরার চিন্তা মানুষের সবসময়ই করতে হয়, আরতি।"

সে হেসে আমার বাহুর উপর তার একটা হাত রাখল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তাকে জরিয়ে ধরা অবস্থায়ই আমি আমার মুখ তার মুখের কাছে নিয়ে এলাম।

"কি করছ তুমি?" আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বলল আরতি।

"আমি...আমি শুধু..."

"না," আরতি বলল। "তুমি তো আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করে ফেলবে।"

"আমি আসলেই তোমাকে পছন্দ করি," বললাম তাকে। ভালবাসি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সাহস পেলাম না।

"আমিও তোমাকে পছন্দ করি," সে বলল।

"তাহলে চুমু দিলে না কেন?"

"আমি চাই না তাই।" সে আমার মুখোমুখি বসল। "আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি অনেক বছর ধরে আমার বেস্টফ্রেন্ড। কিন্তু আমি তোমাকে আগেই বলেছি..." এতটুকু বলেই সে থেমে গেল।

"কি?"

"আমি তোমাকে ওভাবে দেখি না।"

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

"গোপাল, বোঝার চেষ্টা কর। তোমার মন এমনিতেই খারাপ তাই আমি চাই না..."

"তুমি কি চাও না, আরতি? আমাকে কষ্ট দিতে? কিন্তু তুমি সেটা দিয়েছ।"

আমি ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা পঞ্চাশ বাজে। ফিরে যেতে হবে। আমি বৈঠা হাতে নিলাম। "তোমার জায়গায় যাও," আমি বললাম। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গেল। ঘাটে পৌছার আগপর্যন্ত আমরা একেবারেই চুপ থাকলাম। ফুলচাঁদ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার হাসি বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যখন আমি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম।

নৌকা থেকে নামলাম আমরা।

"আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবে?" আরতি বলল।

"আমার সাথে কথা বলবে না," বললাম তাকে।

"তুমি অনেক বাজে হয়ে যাচ্ছ।"

"আমি একটা বাজে ছেলে, তুমি জান না? এজন্যই তো এআইইইই'তে চান্স পাই নি।"

অধ্যায় ৫

এআইইইই'র মত জেইই'তে-ও চান্স পেলাম না। রাঘব পেয়েছে র‍্যাঙ্ক ১,১২৩। এটা তাকে বারানশির ছোটখাট একজন সেলিব্রেটি বানিয়ে ফেলেছে। পরদিন লোকাল পত্রিকায় বড় করে খবর ছাপল। জেইই-তে আমাদের এলাকা থেকে মোট চারজন চান্স পেয়েছে। চারজনের মধ্যে শুধু রাঘবই বারানশি থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। বাকি তিনজন পরীক্ষা দিয়েছে কোটা থেকে।

"ওরা কোটায় গিয়েছে কি করতে?" পত্রিকা থেকে মুখ তুলে চিন্তিত ভঙ্গিতে বাবা বললেন।

আমার চান্স পাওয়ার আশা বাবা আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাই জেইই-তে চান্স না পাওয়ায় তার কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

"কোটা জেইই কোচিংয়ের রাজধানী। দশ হাজারের মত ছাত্রছাত্রি সেখানে চলে যায়," আমি ব্যাখ্যা করলাম।

প্রতি বছর ইন্ডিয়ার এই ছোট শহর কোটা থেকে এক হাজার শিক্ষার্থী অর্থাৎ মোট আইআইটি-তে চান্সপ্রাপ্তদের এক তৃতীয়াংশ চান্স পায়।

"বলিস কি?" বাবা বললেন। "কিভাবে সম্ভব?"

কাঁধ ঝাঁকালাম। আমি ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কথা বলতে নারাজ। আমি ক্লাস টুয়েলভ্-এ ৭৯ পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছি। চাইলেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি করতে পারি। ১২০ কিলোমিটার যাতায়াত করা অবশ্য খুব কঠিন হবে কিন্তু আমি প্রতিসপ্তাহে বাবাকে দেখে যেতে পারব।

"রাঘব কোন আইআইটিতে ভর্তি হবে?"

"আমি জানি না," বললাম। "বাবা, তুমি কি আমাকে দুশ' টাকা দিতে পারবে? আমাকে কলেজের ভর্তি ফরম কিনতে হবে।"

বাবা আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছি। "তুই আগামি বছর এআইইইই পরীক্ষা দিবি না?" জানতে চাইলেন তিনি।

"আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ওখান থেকে পরীক্ষা দিব," বললাম তাকে।

"তুই এখানে পড়াশোনা করলে প্রস্তুতি নিবি কিভাবে?"

"আমি একবছর সময় নষ্ট করতে পারব না," বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।

আমাকে রাঘবের সাথে দেখা করতে হবে। এখনো তাকে অভিনন্দন জানাই নি। এটা ঠিক যে রাঘবের জেইই-তে চান্স পাওয়ায় আমি একটুও আনন্দিত হই নি। আমার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হই নি। শতহোক, আমরা দশ বছর ধরে বন্ধু। আর

সবারই বন্ধুর আনন্দে আনন্দিত হওয়া উচিত। যাইহোক, সে হয়ে যাবে আইআইটি'র ছাত্র আর আমার কোন পরিচয় থাকবে না। কোন কারনে এটা আমার মধ্যে কোন শিহরণ জাগাল না। আমি তার কলিংবেল চাপার সময় হাসির প্র্যাকটিসটা করে নিলাম। রাঘব দরজা খুলেই সোজা আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে," সে বলল।

"অভিনন্দন বস্," আমি বললাম। আমার ঠোঁট প্রসারিত হয়ে হাসিতে রূপান্তরিত হল, দাঁতগুলোও মোটামুটি দেখা গেল।

"এখন আমি বলতে পারব আমি একজন সেলিব্রেটিকে চিনি।"

আমি তার বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম, সাজানো গোছানো তিন বেডরুমের বিএইচইএল-এর দেয়া অ্যাপার্টমেন্ট। তার চান্স পাওয়ার খবর ছাপানো পত্রিকা ডায়নিং টেবিলে পড়ে আছে। রাঘবের বাবা বেড়াতে আসা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সোফায় বসে আছে। তারা কাশ্যপ পরিবারকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আইআইটিতে চান্স পাওয়া বিশাল ঘটনা–অনেকটা এভারেস্ট জয় করা বা মহাকাশ ভ্রমণের কাছাকাছি। জনাব কাশ্যপ দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এটা হয়ত আমার অতিকল্পনা–কিন্তু তার অভিবাদনটা এমন লাগল, যেটা আমরা সাধারনত আমাদের থেকে নিচুশ্রেণীর লোকদের দেই। আমি নিশ্চিত, আমি আইআইটিতে চান্স পেলে তিনি নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াতেন, আমার সাথে হ্যান্ডশেক করতেন। যাহোক, এটা কোন ব্যাপার না। রাঘবের সাথে তার রুমে গেলাম। আমি চেয়ারে বসলাম আর সে বসল খাটে ।

"তো, তোর অনুভূতি কি?" বললাম তকে। আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এরকম একটা ফালতু র‍্যাঙ্ক পেলে কেমন লাগে, যা তাকে একদিনেই কয়লা থেকে হীরা বানিয়ে দিয়েছে।

"অবিশ্বাস্য," রাঘব বলল। "আমি এআইইইই আশা করেছিলাম, কিন্তু জেইই, ওয়াও!"

"কোন্ আইআইটি?" আমি বললাম।

"আমি আইটি-বিএইচইউ'তে ভর্তি হব। এটা একটা ভাল শাখা আর বারানাশিতেই," রাঘব বলল।

আইটি-বিএইচইউ, ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি অ্যাট দি বানারাস হিন্দু ইউনিভার্সিটি–এটা বারানাশির সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজ। এটা জেইই'র মাধ্যমেই ভর্তিপ্রক্রিয়া চালায়। কিন্তু এটা আইআইটির মত এতটা জাকজমকপূর্ণ শোনায় না।

"বিএইচইউ কেন?" আমি বললাম।

"আমি পার্টটাইম সাংবাদিকতা করতে চাই। আর এখানে পত্রিকাগুলোর সাথে আমার যোগাযোগ আছে," রাঘব বলল।

কেউ যখন বড়সড় কিছু করার সুযোগ পায় তখন সেটার মূল্য দিতে চায় না।

রাঘবের লেখালেখির একটা বিষয় আছে। সে সম্পাদকের কাছে কিছু চিঠিপত্র আর কিছু আর্টিকেল ছাপিয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। কিন্তু তার এরকম কথা পাগলামি ছাড়া কিছুই না।

"তুই তোর শখের জন্য আইআইটি ছেড়ে দিবি?" আমি বললাম।

"এটা শখ না। সাংবাদিকতা আমার লক্ষ্য।"

"তাহলে তুই ইঞ্জিনিয়ারিং করছিস কেন?"

"বাবা, আর কি? ওহ্, আমি তাকে বলেছি আমি বিএইচইউ নিচ্ছি কারন এখানে আমি কম্পিউটার সায়েন্সের মত ভাল কিছু সাবজেক্ট পাব। বাবাকে কিছু বলবি না কিন্তু।"

"রাঘব, তুই তবুও..."

"রাঘব!" কাশ্যপ সাহেব বাইরে থেকে ডাকলেন।

"আত্মীয়স্বজন, সরি। আমাকে যেতে হবে," রাঘব বলল। "চল, পরে একসময় দেখা করি। আরতিকেও আসতে বলিস। তোরা আমার কাছে খাওয়া পাওনা হয়ে আছিস।"

সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

যখন কেউ কিছু অর্জন করে তখন সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

"আমি কি করতে যাচ্ছি শুনতে চাস?" আকস্মিকভাবে জিজ্ঞেস করে বসলাম।

রাঘব থেমে গেল। "ওহ্ সরি। অবশ্যই, বল," সে বলল। আমি জানি না তার আদৌ জানার কোন ইচ্ছা আছে নাকি সে বাধ্য হয়ে বলল।

"এলাহাবাদ বিশ্যবিদ্যালয়। সেখান থেকে আমি আগামীবার পরীক্ষা দিব।"

"ভাল তো," রাঘব বলল। "আমি নিশ্চিত আগামীবার তোর হয়ে যাবে। কমপক্ষে এআইইইই তো হবেই।"

মানুষ যখন জেইই-তে চান্স পেয়ে যায় তারা 'কমপক্ষে এআইইইই' এ-ধরনের বাক্য ব্যবহার শুরু করে।

আমি হাসলাম। "বাবা চায় আমি যেন আবার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য একবছর বাদ দেই।"

"সেটাও করতে পারিস," রাঘব বলল। তার বাবা আবার তাকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন।

"যা, ঠিক আছে," আমি বললাম। "আমিও চলে যাব।"

"দেখা হবে দোস্ত।" রাঘব আমার কাঁধ চাপড়ে দিল।

"না বাবা," আমি বললাম। "আমি কোটায় যাব না।"

আমাকে না জানিয়ে বাবা পুরো একসপ্তাহ কোটার উপর গবেষণা করেছেন।

"বনসাল আর রেজোনেন্স সবচেয়ে ভাল," বললেন তিনি।

"তুমি কিভাবে জানলে?"

"আমি একজন রিটায়ার্ড শিক্ষক। এটা জানা আমার জন্য কোন বিষয় না।"

"বাহ্ দারুণ!" আমি বললাম।

"আমি তোকে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত। টিউশন একবছরে ত্রিশ হাজার। থাকা খাওয়ার জন্য প্রতিমাসে তিন হাজার। তাহলে বার মাসে কত হয়? ত্রিশ যোগ ছত্রিশ হাজার..." বাবা নিজে নিজে মিনমিন করতে লাগলেন।

"ছেষট্টি হাজার!" আমি বললাম। "আর একটা বছর নষ্ট। বাবা আমরা কি রাজা?"

"আমার চল্লিশ হাজারের একটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে যেটার কথা তোকে বলি নি," বাবা বললেন। "গত তিন বছরে আমি যতটুকু পেরেছি জমা করেছি। তোর শুরু করার জন্য যথেষ্ট। বাকিটা পরে জোগার করা যাবে।"

"তাই বলে যে কয়টা টাকা আছে টিউশনের পেছনে উড়িয়ে দিতে হবে? এতদূরের একটা জায়গায়? আর এই কোটাইবা কোথায়?"

"রাজস্থানে। দূরে, কিন্তু সরাসরি ওখানের ট্রেন আছে। যেতে বাইশ ঘণ্টা সময় লাগে।"

"বাবা, কিন্তু...আমি কলেজে ভর্তি হলে সমস্যা কোথায়? ওটার জন্য আমাকে টাকা দাও। কমপক্ষে একটা সার্টিফিকেট পাব।"

"এই ফালতু সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে? আর কোচিং না করে তুই ভাল করবি কি করে? তুই অল্প কিছু নম্বরের জন্য চান্স পাস নি। কোটায় গেলে এ-কয়টা নম্বর বেশি পাওয়ার ব্যবস্থা আশা করি হয়ে যাবে।"

আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলাম। আমি কখনোই দ্বিতীয়বার চেষ্টার কথা ভাবি নি, এত দূরে যাওয়ার কথা তো বাদই দিলাম।

"তোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। রাঘবকে দেখ। ও জীবনের জন্য প্রস্তুত," বাবা বললেন।

'রাঘবকে দেখ' নতুন একটা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটা বারানশির সব বাচ্চাদের জোর করে খাইয়ে দেয়া হচ্ছে।

"আমরা এটা করতে পারব না বাবা," ভাবনাগুলো একত্রিত করতে করতে বললাম। "তাছাড়া, তোমার দেখাশোনা করবে কে? এলাহাবাদ কাছাকাছি আছে, আমি প্রতিসপ্তাহে আসতে পারব। তুমিও চাইলে..."

"আমি ম্যানেজ করতে পারব। আমি কি বাড়ির বেশিরভাগ কাজ করি না?" বাবা বললেন।

আরতির কথা আমার মাথায় এল। সে যদিও নৌকায় আমাকে না করেছে, আমি জানি সে আমার প্রতি কতটা যত্নশীল। একটা দিনও এমন কাটে নি যে আমরা কথা

বলি নি। সে-ই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বলেছে, আর আমি তো ইতোমধ্যেই খুঁজে বের করেছি আমার জন্য কোন সাবজেক্ট সবচেয়ে ভাল হবে। তাকে আমি কিভাবে বলব আমি কোটা যাচ্ছি?

তবে আমি কি কারনে বারানাশিতে থাকতে চাচ্ছি তা বাবাকে বলতে পারি না। আমি বললাম, "আমি শপথ করছি আমি কঠোর পরিশ্রম করব বাবা।"

আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমরা টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলাম।

"এখানে থাকলে তোকে বাড়ির কাজকর্ম করতে হবে," বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। "তুই অবশ্যই যাচ্ছিস।"

"তোমার কাছে মাত্র চল্লিশ হাজার আছে, বাকি টাকার কি হবে? যাতায়াত, বই, ভর্তি পরীক্ষার ফি এসবের কি করবে?" আমি বললাম।

বাবা আমাকে তার কুঞ্চিত তর্জনি দেখালেন। এটাতে একটা পুরু সোনার আংটি আছে। "এই ফালতু আংটির কোন দরকারই নেই," বাবা বললেন। "তাছাড়া তোর মায়ের কিছু গয়নাও আছে।"

"তুমি কোচিং ক্লাসের জন্য মায়ের গয়না বিক্রি করবে?"

"আমি এগুলো তোর বউয়ের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তুই ইঞ্জিনিয়ার হ, তারপর নিজেই কিনে দিতে পারবি।"

"তুমি যদি অসুস্থ হয়ে যাও তখন কি হবে? তারচেয়ে তুমি এগুলো রেখে দাও, বিপদের সময় কাজে আসবে।"

"তুই ইঞ্জিনিয়ানিং কলেজে ভর্তি হলেই আমার বয়স দশ বছর কমে যাবে," বাবা হেসে পরিস্থিতি শান্ত করতে চাইলেন।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সামনের পাটির একটা দাঁত নেই। তার হাসি মানে আমার কাছে সবকিছু। আমি কোটার কথা ভাবতে লাগলাম। তারা ছাত্রছাত্রিদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ভালভাবে তৈরি করছে। আবার খারাপ দিকও মাথায় আসছে–টাকা কোথায় পাব, অনিশ্চয়তা আর অবশ্যই আরতির থেকে দূরে থাকতে হবে।

"এই বৃদ্ধ মানুষটার জন্য এটা কর বাবা," বাবা বললেন। "আমি তোর সাথে যেতাম কিন্তু এতদূর জার্নি করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। তাছাড়া এই ছোট্ট বাড়িটাও তো দেখতে হবে।"

"ঠিক আছে বাবা। আমি গেলে একাই যেতে পারব।"

"তোর মা চেয়েছিল তুই ইঞ্জিনিয়ার হবি।"

আমি দেয়ালে মায়ের ছবির দিকে তাকালাম। তাকে খুব হাশিখুশি, সুন্দর আর কমবয়সী লাগছে।

"তোর বাবার যত্ন নিস," মনে হল মা আমাকে বললেন।

"তুই কি যাচ্ছিস?" বাবা বললেন।

"যদি তুমি খুশি হও তাহলে আমি যাব," বললাম তাকে।

"ছেলে আমার!" বাবা আমাকে জরিয়ে ধরলেন–এআইইইই রেজাল্টের পরে এই প্রথম।

"কালোগুলো দেখান আমাদের," আরতি দোকানদারকে বলল। সে বারো পিস কাপড়ের হ্যাঙ্গারের একটা সেটের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

কোটায় আমার যেসমস্ত টুকিটাকি জিনিসপত্র লাগবে সেসব কেনার জন্য আমরা নাদেশার রোডে এসেছি।

"আমি তোমাকে কেনাকাটা করতে সাহায্য করছি বলে ভেব না তুমি বারানাশি ছেড়ে যাওয়াতে আমি খুশি," আরতি বলল।

"আমি যাব না। খালি ঐ কথাটা বল, তাহলে অমি টিকেট ফেরত দিয়ে দিব।"

সে একটা হাত আমার গালে রাখল। "আমার কাছে খারাপ লাগছে আমার বেস্টফ্রেন্ড চলে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার জন্য এটাই সঠিক।"

আরতির হ্যাঙ্গার পছন্দ হয়েছে। এক সেটের দাম পঞ্চাশ রূপি। "আঙ্কেল, আমরা তোয়ালে, সোপ কেস, আরও অনেক কিছুই তো কিনলাম। ডিসকাউন্ট দিবেন কিন্তু।"

দোকানদার ভেংচি কাটার মত একপ্রকার মুখভঙ্গি করল কিন্তু সে তা অগ্রাহ্য করল।

"আসার জন্য ধন্যবাদ। আমি জানতাম না কি কিনতে হবে," আমি তাকে বললাম।

"রান্নার জিনিসপত্র কিছু কিনেছ? ভুলে গিয়েছ, তাই না?"

"আমি রান্না করতে যাব কেন? সেখানে টিফিনের ব্যবস্থা আছে।"

আরতি আমার কথাকে কোন পাত্তাই দিল না। সে ক্রোকারিজ কর্নারে গিয়ে বড় একটা স্টিলের বোল তুলে ধরল।

"ইমার্জেন্সির জন্য," আরতি বলল। "আমি যদি তোমার সাথে কোটা যেতাম তাহলে প্রতিদিন তোমার জন্য রান্না করে দিতাম।"

সে তার সুন্দর হাত দিয়ে চকচকে পাত্রটা তুলে ধরল। রান্নাঘরে তার রান্না করার দৃশ্য আমার মাথায় উঁকি দিল। আরতি এধরনের কথা কেন বলে? আমার কি বলা উচিত? "আমি ম্যানেজ করে নিব," বললাম তাকে।

দোকানদার বিল তৈরি করে দিলে আরতি আমার দিকে তাকাল। সে সবসময় আমাকে সম্মোহিত করে ফেলে। প্রতি সপ্তাহে সে আরও সুন্দর হচ্ছে।

একটা বাচ্চা মেয়ে, যে কিনা তার মায়ের সাথে দোকানে এসেছে আরতির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি টিভির লোক?"

আরতি হেসে মাথা নাড়ল। সে দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, "আঙ্কেল, বিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট।" আরতি কখনোই তার সৌন্দর্যের ব্যাপারে সচেতন না। সে কখনোই আয়নায় তাকে দেখে না, মেকআপ করে না, আর এমনকি কখনো কখনো তার চুল সারা মুখে ছড়িয়ে থাকে। এতে অবশ্য তাকে আরো আকর্ষণীয় লাগে।

"আমরা কি বেরোব?" আরতি জিজ্ঞেস করল।

"কি জানি।"

"কি জানি মানে?"

"ঐসময় তুমি কি উল্টা পাল্টা বললে, 'আমি যদি কোটা আসতাম।' "

"আমি যেতে পারতাম। আমি বাবাকে যদি বলতাম আমি আগামী বছর পরীক্ষা দিব। তুমি জানতেও না।" সে চোখ পিটপিট করল।

আমি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, তার মন্তব্য কতটুকু সিরিয়াস তা বোঝার চেষ্টা করছি। সেটা কি সম্ভব ছিল?

"সত্যি?" আমি তাকে বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম।

"আমি দুষ্টুমি করছিলাম, বোকা। আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি আগ্রাসেন কলেজে মনোবিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে গিয়েছি।"

"আমি ভাবলাম তুমি..."

"তুমি এত বোকা কেন?" সে হাসিতে ফেঁটে পড়ল।

"বোকা মানে?" আমি বললাম। সে আমার গাল টেনে দিল। "ওহ," বলে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম।

অবশ্যই সে কোটায় যাবে না। আর আমি বোকাও না। আমি এসব বুঝতে পারি। তবুও আরতি আমার যুক্তিকে পরাজিত করে ফেলতে পারে। আমি আমার ভাবনার ইতি টানলাম যেহেতু আমি তার সাথে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি জিনিসপত্র গুলো হাতে নিতে নিতে খেয়াল করলাম সে দাম দিচ্ছে।

"দাঁড়াও," আমি বললাম। "আমি দাম দিব।"

"বাদ দাও। চল যাই," সে বলল, আমার কনুই ধরে টেনে নিয়ে আসতে লাগল।

"কত হয়েছে?" মানিব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে বললাম।

সে আমার মানিব্যাগ নিয়ে আমার শার্টের পকেটে রেখে দিল। তার একটা আঙুল আমার ঠোঁটের উপর রাখল।

মেয়েরা এধরনের বিভ্রান্তিকর সিগন্যাল কেন দেয়? সে ঐদিন নৌকায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করল, এরপরেও সে আমার সাথে বিরক্তিকর হ্যাঙ্গার কিনতে দোকানে এল আবার আমাকে দাম দিতে দিচ্ছে না। সে তিনবেলা কল করে জিজ্ঞেস করে আমি খেয়েছি কিনা। আমার প্রতি কি তার টান আছে নাকি নেই?

"তুমি কি সিগরার নিউ ডোমিনোতে যাবে?" সে বলল।

"আমরা কি ঘাটে যেতে পারি?" বললাম তাকে।

"ঘাটে?" অবাক হয়ে বলল সে।

"আমি যাবার আগে বারানাশিতে যতটা সম্ভব ভিজতে চাই।"

আমরা ললিতা ঘাটের সিঁড়িতে নামলাম। এটা ডান পাশের কোলাহলপূর্ণ দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে অনেক নীরব। আমরা পাশাপাশি বসে সন্ধ্যার সূর্যের সাথে গঙ্গার রঙ পরিবর্তন দেখতে লাগলাম। আমাদের বামে, মনিকারনিকা ঘাটে চিতা থেকে আগুন জ্বলছে, যা কখনোই থামে না। এই ঘাটের নাম শিবের কানের দুলের নামে, যা নাকি তার নৃত্যের সময় এখানে পড়ে যায়। এ ঘাটকে শবদাহের জন্য পবিত্র জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সে আলতোভাবে আমার কনুই ধরল। আমি চারপাশে তাকালাম। কিছু টুরিস্ট আর সাধু ছাড়াও এলাকার কিছু মানুষ আছে এখানে। আমি ঝাকুনি দিয়ে কনুই ছাড়িয়ে নিলাম।

"কি হল?" সে বলল।

"না, এটা ভাল না। বিশেষ করে তোমার জন্য।"

"কেন?"

"কারন তুমি মেয়ে।"

সে জোরে আমার কনুইয়ে চড় মারল। "তাতে কি হয়েছে?"

"মানুষ কতোকিছু বলে। যেসব মেয়ে ঘাটে কনুই ধরে বসে থাকে তাদের সম্পর্কে তারা ভাল কিছু বলে না।"

"আমরা শুধুমাত্র খুব ভাল বন্ধু," সে বলল।

এই কথাটাকে আমি ঘৃনা করি। আমি তার জীবনে আমার অবস্থান নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যদিও আমি পরিস্থিতি অপ্রীতিকর করতে চাই নি। "কিন্তু আমি দুদিন পরেই চলে যাচ্ছি," বললাম তাকে।

"তো? আমাদের মধ্যে যোগাযোগ তো হবেই। আমরা ফোনে কথা বলব। তাছাড়া ইন্টারনেটে চ্যাট করতে পারি। কোটায় তো সাইবার ক্যাফে আছে, তাই না?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"এত বিষন্ন হয়ে থেকো না," সে বলল। দূরে মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যার আরতি শুরু হচ্ছে।

"তোমার সমস্যাটা কি?" আমি বললাম।

"কিসের সমস্যা?"

"আমাদের ব্যাপারে। বন্ধু থেকে বেশি কিছু হওয়ার বিষয়ে।"

"প্লিজ, গোপাল, বাদ দাও না।"

আমি চুপ করলাম। অনেক দূরে সন্ধ্যার আরতি দেখা যাচ্ছে। ডজনখানেক সাধু মশালের মত বিশালাকার প্রদীপ হাতে নিয়ে তাল মিলিয়ে ভজনগীতি গাইছে। শতশত টুরিস্ট তাদের ঘিরে রেখেছে। যতবারই দেখা হোক না কেন, বারানাশির ঘাটগুলোর

আরতির এই দৃশ্য প্রতিবারই যেন অভূতপূর্ব মনে হয়। ঠিক আমার পাশে যে আরতি বসে আছে তার মত। সে আজ ময়ূররঙা সালোয়ার-কামিজ আর মাছের মত কানের দুল পরেছে।

"আমি আসলে ঐভাবে দেখি না গোপাল," সে বলল।

"আমার ব্যাপারে?"

"কারোর ব্যাপারেই না। আর তুমি আর আমি যে সবকিছু শেয়ার করি এটাই আমার কাছে ভাল লাগে। তোমার কাছে লাগে না?"

"লাগে, কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি। আমাদের একটা কমিটমেন্ট থাকলে সেটা ভাল হয় না?"

"কমিটমেন্ট? গোপাল, আমরা এখনো কত ছোট!" সে হেসে উঠে দাঁড়াল। "চল, প্রদীপ ভাসাই। তোমার কোটা ভ্রমনের জন্য।"

মেয়েরা কত দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাতে পারে!

আমরা পানির দিকে নেমে গেলাম। সে পাঁচ রুপি দিয়ে ছয়টা জ্বলন্ত প্রদীপ কিনল। আমার হাতে একটা দিয়ে সে একটা ভাসিয়ে দিল। এরপর আমার হাত ধরে বলল, "চল, একসাথে প্রার্থনা করি, সাফল্যের জন্য। তুমি কোটায় যা চাও তা যেন পেয়ে যাও," সে চোখ বন্ধ করে বলল।

আমি তার দিকে তাকালাম। *আমি যা চাই তা কোটায় না, বারানশিতেই ফেলে যাচ্ছি...*

অধ্যায় ৬

কোটা

তেইশ ঘণ্টার গরম, শ্বাসরুদ্ধকর ভ্রমণ শেষে দ্বোয়ার্কা এক্সপ্রেসে করে কোটায় পৌছলাম।

আমি ভিনেটকে ই-মেইল করেছিলাম। ভিনেট বারানাশিরই ছেলে যে কিনা গতবছর কোটায় কাটিয়েছে। ওর কাছ থেকে কোচিং সম্পর্কে জানলাম; বনসাল আর রেজোনেন্সের সুনাম সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এরা আবার নিজেদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র বাছাই করে। আর আমি যদি এ-দুটোর কোনটাতে চান্স না পাই তাহলেও সমস্যা নেই। কোটায় আরো অনেক কোচিং আছে যেগুলো আমার মত বাজে ছাত্রদের চাহিদা পূরণ করবে।

যাহোক, কোচিং শুরু করার আগে আমাকে থাকার জায়গা ঠিক করতে হবে। ভিনেট আমাকে কিছু জায়গার কথা বলেছে যেখানে পেইংগেস্ট হিসেবে থাকা যায়। আমি রেলস্টেশন থেকেই অটো নিলাম। ড্রাইভারকে বললাম, "গায়ত্রি সোসাইটি বিল্ডিং, মহাবীর নগর, বনসাল কোচিংয়ের কাছে।"

অটোড্রাইভার কোটার নোংরা রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চালাতে লাগল। শহরটা অন্যান্য ছোট শহরের মতই অত্যাধিক ট্রাফিক, দূষণ, আর অগণিত টেলিকম, আন্ডারওয়্যার আর কোচিংক্লাসের বিজ্ঞাপনে ভরা। আমি অবাক হচ্ছি, এখানকার বিশেষত্বটা কি? এটা কিভাবে হাজার-হাজার শিক্ষার্থীকে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায় চান্স পাইয়ে দেয়?

"আইআইটি নাকি মেডিকেল?" অটোড্রাইভার জিজ্ঞেস করল। তার চুল যেমন ধূসর, দাঁতের অবস্থাও তাই।

বুঝলাম কোন জিনিসটার কারণে কোটা আলাদা। এখানকার সবাই ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

"আইআইটি," আমি বললাম।

"বনসাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তাদের ভর্তি পরীক্ষা তো সামনের সপ্তাহেই।"

"আপনি এসব জানেন?" ড্রাইভারের জ্ঞান দেখে আমি হতবাক।

সে হেসে পেছনে তাকাল। "আমার পুরো পরিবার পড়াশোনার মধ্যেই আছে। আমার স্ত্রীর খাবারের ব্যবসা আছে, আপনার খাবার ডেলিভারি লাগবে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"শঙ্কর, গ্রামের বাড়ি আলোয়ারে," বলে সে তার গ্রিজ মাখা একটা হাত বাড়িয়ে ধরল।

হাতটা আমি যতটা কম সম্ভব সময় ধরে রাখলাম। "গোপাল, বারানশি থেকে।"

সে টিফিন সার্ভিসের একটা বিজনেস কার্ড আমাকে দিল। দিনে দুই বেলা আর একমাসে খরচ পনের শ' টাকা।

"আমরা খাবারের বিষয়টা দেখি। আপনারা ছাত্ররা পড়াশোনা করেন, এটা তো খুব কঠিন পরীক্ষা।"

"কোন্ পরীক্ষা?" আমি বললাম।

"আইআইটি এবং জেইই। আহ্, গোপাল ভাই, আমরা তত অশিক্ষিত না।"

আমরা গায়ত্রি সোসাইটি কম্পাউন্ডে পৌছলাম। একটা মরচেপড়া লোহার দরজা অনেকগুলো ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টকে আটকে রেখেছে। একজন ঝাড়ুদার বিশাল একটা ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করার নামে ধুলার মেঘ উড়াচ্ছে। আমি বিল্ডিংয়ের সামনে গার্ড পোস্টে এসে দাঁড়ালাম। একজন দারোয়ান ভেতরে বসে আছে।

"কার সাথে দেখা করতে চান?" দারোয়ান বলল।

"আমি একটা রুম ভাড়া করতে চাই," আমি বললাম।

সে আমার দিকে ভালভাবে তাকাল। দেখল আমার দুই হাতে দুটো অতি বোঝাই, অতি পূরনো এবং অতি মেরামতকৃত স্যুটকেস। একটাতে কাপড়-চোপড়, অন্যটাতে সেসব বই যেগুলো এতদিন আমাকে কোথাও চান্স পাওয়াতে পারে নি। আমার পিঠের ব্যাগে আরতি যেসব কিনে দিয়েছিল সেগুলো। তাকে অনেক মিস করছি। একটা টেলিফোন বুথ খুঁজে বের করে তাকে ফোন করতে হবে।

"আইআইটি নাকি মেডিকেল?" দারোয়ান হাতে তামাক গুড়ো করতে করতে জিজ্ঞেস করল। কোটার মানুষজন দেখছি বাইরে থেকে কেউ এলে তার আসার উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না।

"আইআইটি," আমি বললাম। তার নিকোটিন থেকে যদি আমাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিত!

"ফার্স্ট টাইম নাকি রিপিটার?" নিচের দিকে তাকিয়েই সে বলল।

"এটার কি কোন দরকার আছে?" কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

"আছে," বলে সে তামাকটুকু মুখে পুরল। "তুমি ফার্স্ট টাইমার হলে স্কুলেও যাবে, বাড়ির বাইরে অনেক সময় থাকবে। রিপিটাররা শুধু কোচিং ক্লাসে যায়। অনেকে সারাদিন ঘুমায়। অনেক বাড়িওয়ালা এসব পছন্দ করে না। তাই আমাকে বল, আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব।"

"রিপিটার," আমি বললাম। আমি জানি না কেন এটা বলার সময় আমি নিচের দিকে তাকালাম। ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পেলে তামাক খাওয়া দারোয়ানের সামনেও নিজেকে ছোট মনে হয়।

"ওহ্ ঈশ্বর! আরেক রিপিটার," দারোয়ান বলল। "যাইহোক, আমি চেষ্টা করব। আমার ফি আগে ঠিক করি।"

"কি?" আমি বললাম।

"আমি আধ-মাসের ভাড়ার সমান নেই। তোমার বাজেট কত?"

"মাসে দুই হাজার।"

"কি বল?" সে বলল। "এটাকে চার হাজার বানাও, তোমাকে সুন্দর, দু'জনের এয়ার কন্ডিশন্ড রুম ঠিক করে দিই।"

"আমার পক্ষে এত সম্ভব না," বললাম তাকে।

দারোয়ান এমন অবজ্ঞাভরে তাকাল যেন কেউ ফাইভ-স্টার হোটেলে দেশি মদ চাইছে।

"কি?" বললাম আমি। কোটার প্রথম রাত রাস্তায় কাটাতে হয় কিনা তা ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত।

"আসো," বলে সে ইশারা করল। দরজা খুলে আমার স্যুটকেস তার কেবিনে রাখল। সে প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

"তুমি কি অন্য ছেলেদের সাথে থাকতে পারবে? এক রুমে তিনজন?" দারোয়ান বলল।

"তা পারতাম," আমি বললাম। "কিন্তু পড়াশোনা করব কিভাবে? আমার প্রাইভেট রুম দরকার, যত ছোটই হোক।"

পড়ি আর না পড়ি, আমি একা থাকতে চাই।

"ঠিক আছে, ছয় তলায় চল," সে বলল।

আমরা চারতলা পর্যন্ত পৌছলাম। পরিশ্রমে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। প্রচন্ড গরমে অবস্থা কাহিল। "কোটা অনেক গরম। তোমাকে এ আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হবে," দারোয়ান বলল। "বাইরের অবস্থা ভয়াবহ। তাই এই জায়গা পড়ার জন্য ভাল। সারাদিন বাসায় বসে থাকবে আর পড়বে।"

আমারা পঞ্চম তলায় উঠলাম। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু সে কথা থামাচ্ছে না। "আচ্ছা, তুমি কি আসলেই পড়াশোনা করতে এসেছ, নাকি শুধু..." সে বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল।

"শুধু কি?" আমি বললাম।

"সময় কাটানো। অনেকেই এখানে আসে তাদের বাবা-মা তাদের পাঠায় বলে। তারা জানে তাদের চান্স পাওয়ার কোন চান্সই নেই। বরং তারা একবছর তাদের বাবা-মা'র হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে।"

"আমি ভর্তি হতে চাই, আমি ভর্তি হব," বললাম তাকে। আসলে নিজেকেই শোনাতে চাইলাম যেন।

"ভাল। কিন্তু তোমার যদি বিয়ার বা সিগারেট এসব কিছু লাগে তাহলে আমাকে বলবে। এই হাউজিংয়ে এসব নিষিদ্ধ।"

"তো?"

"যখন তোমার পাশে এই বির্জু বন্ধু আছে তোমার আর কোন চিন্তা নেই," সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমরা ছয়তলার একটা ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম, একবয়স্ক মহিলা দরজা খুললেন।

"স্টুডেন্ট," দারোয়ান বলল।

মহিলা আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তার ঘর থেকে ঔষধ আর ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। দারোয়ান আমাকে যে রুম ভাড়া হবে সেটা দেখাল। মহিলা একটা স্টোররুমকে পড়ার আর বেডরুম বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি দারোয়ান আর আমি, আমাদের তিনজনের এ ছোট্ট রুমটাতে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে।

"এটা পড়াশোনার জন্য চমৎকার," দারোয়ান বলল, যে কিনা তার সারাজীবনে পড়াশোনা করেছে কিনা সন্দেহ। "এটা নাও, এটা তোমার বাজেটের মধ্যেই।"

আমি মাথা দোলালাম। রুমে কোন জানালা নেই। বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে অহংকারি আর বধির মনে হচ্ছে। হয়তোবা দুটোই। সে তার চেহারাকে রুক্ষ্ম করে রেখেছে। আমি এখানে থাকতে চাই না। কেন আমি বারানশিতে পড়াশোনা করতে পারলাম না? এই জায়গাটার এত বিশেষত্ব কি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোটা থেকে আমাকে চলে যেতে হবে।

ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে এলাম আমি, দারোয়ান আমার পেছনে দৌড়ে এল।

"এত তাড়াহুড়া করলে কিছুই পাবে না।"

"না পেলে বারানশিতে চলে যাব," বললাম।

আমি ভাবতে লাগলাম মাত্র ছয়টা নাম্বার পেলে আমার জীবনটা কিরকম হয়ে যেত। রাঘবের কথা ভাবলাম। সে নিশ্চয়ই তার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করছে। আরতির আর আমার হৃদয়ের বন্ধনের কথা মনে পড়ছে। বাবার অসুস্থ শরীর আর এই আবর্জনার মধ্যে আমাকে পাঠানোর জন্য তার সংকল্পের কথা মনে পড়ে আমার কান্না চলে এল। আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম।

"অথবা তোমার বাজেট বাড়াও," দারোয়ান আমার ঠিক পেছনে এসে বলল।

"আমি পারব না। আমাকে খাবারের খরচ আর কোচিংয়ের কথাও ভাবতে হবে," বললাম তাকে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচতলায় চলে এলাম। "প্রথম প্রথম এটা হতে পারে। তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে, তাই না?" দারোয়ান বলল।

"সে বেঁচে নেই।"

"অল্প কিছু দিন আগে মারা গেছে?" দারোয়ান জিজ্ঞেস করল। অপরিচিতদের জেরা করতে অনেকের কাছে খুবই মজা লাগে দেখছি।

আমি গার্ড পোস্টে এসে আমার ব্যাগ হাতে নিলাম। "ধন্যবাদ বির্জু," আমি বললাম।

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? দু'জনের একটা রুম নাও," সে একপ্রকার মিনতির স্বরে বলল।

"আমি এখনকার মতো একটা সস্তা হোটেল পেয়ে যাব। আমি একা থেকে অভ্যস্ত। এরপর নিজেই খুঁজে বের করে নিব।"

বির্জু আমার হাত থেকে স্যুটকেস নিয়ে রেখে দিল। "আমার কাছে একটা ভাল রুম আছে," সে বলল। "তুমি যেটা দেখেছ তার ডাবল। একটা জানালা আর ফ্যান আছে। রিটায়ার্ড করা এক দম্পত্তি থাকে সেখানে। আর তোমার বাজেটের মধ্যেই..."

"তাহলে আগে দেখান নি কেন?"

"একটা ঝামেলা আছে।"

"কি ঝামেলা?"

"ঐ ঘরে একজন মারা গিয়েছিল।"

"কে?" আমি বললাম। বিশাল ব্যাপার, মৃত্যু আমি সহজে নিতে পারি। আমার বাড়ি বারানশিতে, সারা দুনিয়া সেখানে মরতে যায়।

"যে ছাত্র সেটা ভাড়া করেছিল। সে চান্স পায় নি, তাই আত্মহত্যা করে দুই বছর আগে। তখন থেকে খালি পড়ে আছে।"

আমি চুপ করে থাকলাম।

"এ কারনেই তোমাকে আগে বলি নি," বির্জু বলল।

"আমি ওটা নিব," বললাম তাকে।

"সত্যি?"

"মড়া পোড়ানো আর ভাসানো দেখতে দেখতেই আমি বড় হয়েছি। কোন্ অভাগা আত্মহত্যা করল সেটা কোন ব্যাপারই না।"

দারোয়ান আমার স্যুটকেস তুলে নিল। আমরা অন্য একটা বাড়ির চারতলায় গেলাম। ষাট বছরের এক দম্পত্তি এখানে থাকে। তাদের ফ্ল্যাট সুন্দরভাবে পরিস্কার করা। ভাড়া দেয়ার রুমে একটা খাট, একটা টেবিল, আলমারি আর একটা ফ্যান আছে।

"পনের'শ," আমি তাদের বললাম। দারোয়ান আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল।

ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা একে অন্যের দিকে তাকালেন।

"আমি জানি এখানে কি হয়েছিল। আর আমার তাতে কোন সমস্যা নেই," বললাম তাদেরকে।

বয়স্ক ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। "আমি আরএল সনি। পিডব্লিউডি'তে চাকরি করতাম," বলে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

আমি তার সাথে হ্যান্ডশেক করলাম। "আমি গোপাল, আইআইটি রিপিটার। আশা করছি এবছর ভর্তি হব।"

অধ্যায় ৭

ব্রোশিয়ারগুলো বিছানার উপর রেখে আমি জুতা আর মোজা খুললাম। সারা দিন বিভিন্ন কোচিং ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আর এখন বিকেল তিনটায় আমার ঘর থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে।

মিঃ সনি আস্তে করে আমার দরজায় টোকা দিলেন। "তোমার লাঞ্চ," বলে আমার পড়ার টেবিলে খাবার রেখে দিলেন।

আমি মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আবহাওয়া এত গরম যে কুশল বিনিময় করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি থাকার আর খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তবে আরতির ভাবনার সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া কোটায় আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কোন একটা ভাল কোচিংয়ে ভর্তি হওয়া। গত তিনদিনে আমি সবগুলো কোচিং ঘুরেছি। তারা সবাই যে মানুষ নামক কিছু প্রাণীকে আইআইটিয়ান বানিয়ে দিয়েছে সে কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। আমি তাদের সবার সুপার সাশ্রয়ী (এটা যে সুপার ব্যয়বহুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না) ফি-এর কাঠামো দেখলাম। মনে হচ্ছে বনসাল, রেজোনেন্স আর ক্যারিয়ার পাথ–সবার পছন্দের শীর্ষে। তাদের প্রত্যেকের আবার নিজস্ব, যথেষ্ট কঠিন ভর্তি পরীক্ষা আছে। এমনকি কোটায় ছোট ছোট কিছু কোচিং আছে যারা কিনা এসব বড় বড় কোচিংয়ে ভর্তির জন্য কোচিং করায়। আর সেই বড় কোচিং থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিতে হয়। আর সেখানে ভর্তি হতে পারলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য পড়াশোনা করতে হবে। অবশ্যই বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার আবার এমবিএ করতে চায়। যার কারনে আবার কোচিং চক্র শুরু হয়। আমার মত ইন্ডিয়ার একজন সাধারন ছাত্রের জীবনে উন্নতি করার চেষ্টায় এই অহেতুক ক্লাস, টেস্ট, প্রস্তুতির ঘুর্ণির মধ্য দিয়েই যেতে হবে। অন্যথায় বির্জুর মত দারোয়ান অবশ্য চাইলেই হওয়া যাবে অথবা আমি যদি আরও সহজ করতে চাই, আমার রুমের আগের ছাত্র মনোজ দত্তের মত গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলেও পড়তে পারি।

যে ফ্যানটা মনোজকে জীবন নামক ভর্তি পরীক্ষা হতে নিষ্কৃতি দিয়েছিল সেটা চালু করলাম। ফ্যানের ব্লেডগুলো রুমের গরম বাতাসকেই আন্দোলিত করতে লাগল।

"বাড়িতে ফোন করেছিলে?" মিঃ সনি জিজ্ঞেস করলেন।

"করেছি," আমি বললাম। তিনি আমাকে প্রতিদিন দু'বার এই প্রশ্নটি করেন। আমার ধারণা, মনোজ দত্ত বাড়িতে ঠিকমত ফোন করত না, যার ফলে তার একাকীত্ববোধ চলে আসে এবং মৃত্যু ঘটে।

"তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবে, ঠিক আছে? মা-বাবা তোমাকে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে," বলে রুম থেকে চলে গেলেন তিনি।

আমি দরজা বন্ধ করে শার্ট খুললাম। গত দশ দিনে নৌকা বাওয়া হয় নি। হাতের পেশিগুলো শিথিল লাগছে। ব্যয়াম করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আগে এই দশ লক্ষ ব্রোশিয়ার বাছাই করতে হবে।

আমি বাবাকে ফোন করেছি, দু'বার। তাকে সুস্থই মনে হয়েছে। আমি বলেছি আগামি বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, যদিও একটা বইও খুলে দেখি নি। এসব নিয়ে ভাবি না। যে কোচিংয়েই ভর্তি হই তারাই আমাকে দিয়ে দৌড় শুরু করাবে।

আমি আরতির সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, তাকে চারবার ফোন করেছি কিন্তু একবারও কথা বলতে পারি নি। প্রথম দুইবার তার মা ধরেছে। সে শান্তভাবে বলেছে আরতি বাইরে গিয়েছে–প্রথমবার বন্ধুদের সাথে, দ্বিতীয়বার কলেজ ভর্তি ফরম জমা দিতে। আমি পরদিন দুবার ফোন দিলে তার মা-ই ধরে আর আমি কিছু না বলেই রেখে দিয়েছি। আমি চাই না আরতির মা বলুক, "এই ছেলেটি এতদূর থেকে এতবার তোমাকে ফোন দেয় কেন?" এটা কোন ভাল প্রভাব ফেলবে না। আরতি বলেছে সে কিছুদিনের মধ্যেই একটা সেলফোন পাবে। আমি চাচ্ছি সে সেটা তাড়াতাড়ি পাক। সবাই এখন সেলফোন ব্যবহার করছে, অন্তত বড়লোক টাইপের যারা।

আমাকে ফোন দেয়ার মত কোন নাম্বার আরতির কাছে নেই। কাল আবার তাকে ফোন করতে হবে।

আমি সবুজ রঙের একটা ব্রোশিয়ার নিলাম। কভারে দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে চেহারার কিছু মানুষের ছবি। এরা এই কোচিং থেকে আইআইটি'র প্রথম সারিতে চান্স পেয়েছে। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেলদের থেকেও বিস্তৃত হাসি তাদের মুখে, কিন্তু তাদের দাঁত সেরকম নয়।

যেহেতু সময় নষ্ট করা আমার পছন্দের কাজ তাই সারাটা বিকাল ব্রোশিয়ারগুলোর তুলনা করে কাটালাম। না, আমি কোর্সের বিষয়বস্তু, সাফল্যের হার, ফি কাঠামো এসবের তুলনা করি নি। আসলে সবাই দাবি করছে তারাই ঐসব বিষয়ে সেরা। আমি সফল পরীক্ষার্থীদের ছবি তুলনা করলাম; সবচেয়ে কুৎসিত ছেলেটি কাদের, সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটি কাদের, যদিও অত সুন্দর কেউই নেই। এসব কাজ করে কোন লাভই নেই, কিন্তু কোটায় থেকেও তো আমার কোন লাভ নেই।

আমি বনসালের ব্রোসিয়ার দেখলাম, কোটার বস। বনসালের শিক্ষার্থীদের কাঁধে একটা করে ব্যাজ লাগানো, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে কোন কলেজে ভর্তি হয় নি। বনসালিটরা কোটার আকর্ষণীয় জনগোষ্ঠী। আমাকে তাদের পরীক্ষায় টিকতে হবে। কিন্তু যে তিনদিন সময় আছে তা প্রস্তুতি নেয়ার জন্য অপর্যাপ্ত। সত্যি বলতে প্রায় সবগুলো কোচিংয়েই এক সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষা হবে। পরের পরীক্ষা আবার প্রায় এক মাস পরে। এখনই কোথাও ভর্তি হতে হবে। অলস বসে থাকলে এই রুমের আগের বাসিন্দার আগেই আমি পাগল হয়ে যাব।

সবগুলো কোচিংয়েই ভর্তি ফরমের দাম এক হাজার করে। চান্স পাই বা না পাই,

ভর্তি হই বা না হই, ফি দিতেই হবে। আমার সাথে পঞ্চাশ হাজার রুপি আছে, বাবা ছয়মাস পরে আরো পাঠাবে বলেছে। অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না। বাছাই করা কয়েকটাতে পরীক্ষা দিতে হবে।

আমি পাঁচটা কোচিং বাছাই করলাম–বনসাল, ক্যারিয়ার পাথ, রেজোনেন্স, আর দুইটা নতুন, কম খরুচে যাদের নাম এইম আইআইটি আর ক্যারিয়ার ইগনিট।

এইম আইআইটি'র ব্রোশিয়ারে লেখা : আমরা সব শিক্ষার্থীর কোচিং করার গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করি। তাই আমরা আমাদের ভর্তি পরীক্ষা পরিচালিত করি না।

অর্থাৎ তারা প্রথম সারির কোচিংগুলোর মত খুঁতখুঁতে না। তারা আসলে বলতে চাচ্ছে, "তোমার কাছে টাকা থাকলেই তোমাকে স্বাগতম।"

বিকেলের বাকি সময়টা আমি ফরম ফিলাপের মত কষ্টকর কাজটা বারবার করলাম। আমি নিজেকে এই বলে সন্ত্বনা দিলাম যে রাতে খাওয়ার আগে আরতিকে একবার ফোন করব।

সন্ধ্যা ৭টায় হাটতে বেরোলাম। রাস্তাঘাটে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিদিনের তাজা বাতাসের ডোজ নেয়ার জন্য বেরিয়ে এসেছে।

আমি একটা টেলিফোন বুথ খুঁজে পেলাম।

"হ্যালো?" ভরাট কণ্ঠে মি: প্রধান বলল। আমি লাইন কেটে দিলাম।

বুথের মিটার শব্দ করে ঘুরল।

"তোমাকে বিল দিতে হবে," দোকানদার বলল নিরসকণ্ঠে। আমি মাথা নাড়লাম।

কারো সাথে কথা বলতেই হবে। বাবার সাথে সকালেই কথা হয়েছে। আমি রাঘবকে ফোন করলাম।

"হ্যালো রাঘব, আমি গোপাল। কোটা থেকে," বললাম তাকে। শেষের শব্দ দুটো মৃদুস্বরে।

"গোপাল! ওহ্, আমরা তো তোর কথাই বলছিলাম," রাঘব বলল।

"আমার কথা? সত্যি? কার সাথে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আরতির সাথে। কেমন আছিস তুই? কোটা কেমন লাগছে? আমরা তোকে অনেক মিস্ করছি।"

"আরতি তোর ওখানে?" আমি হতবাক।

"হ্যা, সাবজেক্ট পছন্দ করার জন্য আমার সাথে কথা বলতে এসেছে। ও সাইকোলজি সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।"

আরতি রাঘবের কথার মাঝখানেই ফোন কেড়ে নিল।

"গোপাল! কোথায় তুমি?"

"অবশ্যই কোটায়। আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম," বললাম তাকে। আমার

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে সে কেন রাঘবের ওখানে গিয়েছে কিন্তু প্রথমেই এটা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

"তুমি পরে আর ফোন কর নি কেন?"

"তোমার কোন নাম্বার তো আমার কাছে নেই যে আমি ফোন করব," সে বলল।

"বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করব তার ফোনে কল রিসিভ করতে পারব কিনা। তুমি বাড়িতে কখন যাবে বল। আমি ফোন করব। কথা আছে।"

"এখন বল। কি হয়েছে?"

"এখন আমি কিভাবে বলব?"

"কেন?"

"তুমি তো রাঘবের সাথে।"

"তো?"

"এখানে কি করছো তুমি?"

"সত্যি বলতে, কিছুই না।"

মেয়েদের *সত্যি বলতে* ধরনের অস্পষ্ট কথা আসলে চিন্তার বিষয়। আবার হয়ত কিছুই না। পুরোটাই হয়তো আমার অতিরঞ্জিত কল্পনা।

"আমাকে তো একটা সাবজেক্ট পছন্দ করতে হবে। আমি কি সাইকোলজি নিব, নাকি হোমসায়েন্স নিব?"

"তুমি কি করতে চাও?" আমি বললাম।

"এয়ার হোস্টেস হওয়ার আগে আমাকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে হবে। এই একটা মাত্র কারণে আমি এসব করছি। আমার একটা সহজ সাবজেক্ট দরকার।"

"ওহ্, তাহলে তোমার এয়ার হোস্টেসের চিন্তা এখনো যায় নি?" আমি বললাম।

"কি বল তুমি? রাঘব বলে কারো স্বপ্ন এত সহজে ত্যাগ করা উচিত না। আমার ধারনা হোম সায়েন্সই ভাল হবে, তাই না? এটা হসপিটালিটির কাছাকাছি। নাকি আমি আগ্রাসেন বাদ দিয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হব?"

আমি চুপ করে থাকলাম। *রাঘব তাকে উপদেশ দিচ্ছে? সে এমন কি হয়ে গিয়েছে? ক্যারিয়ার কাউন্সেলার? সে জেইই-তে চান্স পেয়ে কি মানুষকে উপদেশ দেয়ার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছে?*

"বল না গোপাল," আরতি বলল। "আমি খুবই কনফিউজড।" এরপর আমি তার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

"এখানে হাসির কি হল?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"রাঘব এয়ার হোস্টেসের মত অভিনয় করছে। হাতে একটা ট্রে আর এটা সেটা নিয়ে," সে বলল, খুবই উল্লসিত।

"আমি তোমার সাথে পরে কথা বলব," বললাম তাকে।

"আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু কোন সাবজেক্ট নিব সেটা বলবে কিন্তু," সে বলল।

কিছুটা সিরিয়াস।

"রাঘবকে জিজ্ঞেস কর, সে আমার থেকে ভাল ছাত্র।"

"আহ্ গোপি। কিসব ফালতু কথা বলছ।"

"তুমি একা থাকলে তখন কথা বলব," আমি বললাম।

"আগামিকাল এসময়েই কল কোরো।"

"আচ্ছা, বাই।"

"বাই," আরতি বলল।

"তোমাকে মিস্ করছি," বলতে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল। উত্তরে একটা ক্লিক শুনতে পেলাম শুধু।

আমি আমার রুমে ফিরলাম যেখানে আমার রাতের খাবার আর ব্রোশিয়ারগুলো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আরতি রাঘবের বাসায় উচ্চশব্দে হাসছে, এ দৃশ্য কল্পনা করতে আমার ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

মেজাজ গরম করে একটা ব্রোশিয়ার তুলে নিলাম, আর শেভিং যন্ত্রপাতি থেকে একটা ব্লেড নিয়ে চান্স পাওয়া স্টুডেন্টদের ছবিগুলো কেঁটে টুকরো টুকরো করলাম।

বারানশির ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে এতদিন যে ধরনের কোচিং দেখে এসেছি বনসালকে সেগুলোর সাথে মেলাতে পারলাম না। এটা যেন একটা ইন্সটিটিউট বা বিশাল কর্পোরেট অফিস। আমি বিশাল লবিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এখন কী করব। স্টুডেন্ট আর টিচাররা লম্বা লম্বা পা ফেলে এমন ভাব নিয়ে হোটে যাচ্ছে যেন মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপন করতে যাচ্ছে। কোটার অন্যান্য অনেক কোচিংয়ের মত সামাজিক অবৈষম্য রক্ষার্থে স্টুডেন্টদের নিজস্ব ইউনিফর্ম আছে। এখানে দিল্লীর খুব বড়লোক পরিবারের বাচ্চারা আছে যাদের বাবা-মা আমার বাবা এক মাসে যা আয় করে তারচে বেশি হাতখরচ দেয়। আবার আমার মত বারানশির ছেলেও আছে এখানে পড়ার মত টাকা বা মেধা কোনটাই যার নেই।

পোশাকে সমতা থাকলেও বনসাল বিশ্বাস করে না সব স্টুডেন্ট এক সমান। তাই এখানে বিভিন্ন শ্রেণী আছে, স্টুডেন্টের ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে।

ভর্তি অফিসের লোকটা আমার ভর্তি ফরম নিল। "হাই পারফর্মার?" সে প্রশ্ন করল।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম এ প্রশ্নের উত্তরে কি জবাব দেয়া যায়। "সরি, একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

"যদি ক্লাস টুয়েলভে-এ তুমি ৮৫% এর বেশি নম্বর পাও অথবা এআইইইই র‍্যাঙ্ক ৪০,০০০ এর মধ্যে থাক তাহলে তুমি ৩০% ছাড় পাবে," কাউন্টারে বসা চশমা পরা

লোকটা আমাকে বুঝিয়ে বলল।

"আমার ৭৯% নম্বর ছিল। আর এআইইইই র‍্যাঙ্ক ৫২,০৪৩," বললাম তাকে।

"ওহ্, তাহলে তোমাকে পুরো খরচেই ভর্তি হতে হবে," অফিসার বলল।

আমি চিন্তাও করতে পারি নি আমার এআইইইই র‍্যাঙ্ক কখনো সরাসরি টাকায় রূপান্তরিত হবে।

"আমি কি কোন ছাড় পেতে পারি?" এখানে দরকষাকষি চলে কিনা ভাবতে ভাবতে বললাম।

"সেটা নির্ভর করবে তোমার ভর্তি পরীক্ষার র‍্যাঙ্কের উপর," বলে অফিসার আমার ফর্মে স্ট্যাপল করল। আমাকে একটা রিসিট দিল যেটাই ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড।

"আমাকে কি এই ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতে হবে?" বললাম।

"দুই দিনে আর কি পড়বে? যাহোক, তোমার রেজাল্ট দেখে মনে হয় না তুমি সেই মানের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। আমার সাজেশন হচ্ছে অন্যান্য ইন্সিটিটিউটে আবেদন কর।"

"ধন্যবাদ, আমি করব," বললাম তাকে।

অফিসার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হল কেউ আমাদের শুনছে না। "আমার চাচাত ভাই একটা ইন্সটিটিউট চালু করেছে। সেখানে তোমার জন্য ৫০% ছাড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি," ফিসফিসিয়ে বলল সে।

আমি চুপ করে থাকলাম। সে সবার অলক্ষ্যে দ্রুত আমাকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল : ড্রিম আইআইটি।

"টাকা খরচ করার দরকার কি? কোর্সের বিষয়বস্তু একই। আমার চাচাত ভাই আগে বনসালের টিচার ছিল।"

আমি কার্ডটা দেখতে লাগলাম।

"কাউকে বলবে না কিন্তু, ঠিক আছে?" সে বলল।

অন্যান্য কোচিংয়ে একই রকম অভিজ্ঞতা হল। দেয়ালে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীদের পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে ঢাকা, যেন সন্ত্রাসীদের সন্ধান চাওয়া হচ্ছে, যেটা ভেবে আমি সব জায়গায়ই মজা পাচ্ছি। আরও বুঝলাম ভাল ভাল কোচিংগুলো রিপিটারদের একরকম অবজ্ঞা করে। যাহোক, আমরা একবার ফেল করেছি আর আমাদের জন্য তারা তাদের পরিসংখ্যান নষ্ট করতে পারে না। বড় কোচিংগুলো দাবি করে তারা প্রতি বছর পাঁচশ শিক্ষার্থী আইআইটিতে পাঠায়। অবশ্যই তারা যে দশহাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করায়, যার মধ্যে পাঁচশ চান্স পায় তা জাহির করে না। তার মানে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট চান্স পায়। তবে সবগুলো কোচিং দেখতে গেলে জেইইতে দুই পার্সেন্টেরও কম চান্স পায়। সেখানে কোটার কেচিংগুলো এই রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বাছাই করে ভর্তি করাটা অবশ্য এর প্রধান কারণ। যাহোক, আমার মত যেসব ছাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্ত

হতে এসেছে, তাদেরকে এখানে ভর্তি ফর্ম জমা দিতে লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়।

এইম আইআইটি আর ক্যারিয়ার ইগনিটে তুলনামূলক ছোট লাইন। মজার বিষয় তারা আমাকে স্পট অফার দিল। এমনকি পরেরটা ২০% ছাড় দিল।

"ছাড় শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে যদি তুমি এখনই ভর্তি হও, পরে হলে হবে না," উগ্র সেলস্‌ম্যান অথবা ভর্তি কর্মকর্তা বলল।

"কিন্তু আমি তো এখনও সিদ্ধান্ত নেই নি," বললাম আমি।

"তুমি বনসালের জন্য চেষ্টা করছো, তাই না?" সে আমাকে সবজান্তার দৃষ্টি দিয়ে বলল।

আমি চুপ থাকলাম।

"আমি একজন এক্স-বনসালেট," সে বলল।

"কোটায় এমন কেউ আছে, যে এটা নয়?" বলে আমি চলে এলাম।

অধ্যায় ৮

"গোপাল! তোমার কণ্ঠ শুনে দারুণ লাগছে," আরতি বলল।

সে আমাকে মুহূর্তেই চিনে ফেলেছে। আমার কাছেও দারুণ লাগছে।

"জাহান্নামে যাও, তুমি কোন কেয়ারই কর না," আমি বললাম।

"হাহ্? বোকা নাকি? অবশ্যই কেয়ার করি। প্রথমত, তোমার কোন নাম্বার আছে যেটাতে আমি কল করব?"

"আছে," বলে আমি আমার বাড়িওয়ালার নাম্বার তাকে দিলাম। "কিন্তু বেশি কল কোর না, সে বলেছে সপ্তাহে দু'বারের বেশি না।"

"তো কি হয়েছে? আমি একাই তো তোমাকে কল করব, তাই না?" আরতি বলল।

"হ্যা, যাহোক, কেমন চলছে তোমার? আমার তো একদম বাজে যাচ্ছে এখানে।"

"এটা কি খুব খারাপ? পড়াশোনা শুরু করেছ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না, আমি পারছি না। আগের বইগুলো আবার পড়া শুরু করা খুবই কষ্টকর। সম্ভবত কোন কোচিংয়ে ভর্তি হলে তখন পড়ার অনুপ্রেরণা পাব।"

"আমি যদি ওখানে থাকতাম তোমাকে অনুপ্রেরণা দিতাম," সে হেসে বলল।

"এধরনের কৌতুক কখনো করবে না।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, গোপি। আর একবার চেষ্টা কর। চান্স হয়ে গেলে তোমার ক্যারিয়ার তৈরি হয়ে যাবে।"

"আমি তোমাকে অনেক মিস করছি," বললাম তাকে। আমি আমার ক্যারিয়ারের মত ফালতু বিষয়ে মোটেই আগ্রহী না।

"ওহ্," সে বলল, আমার হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টানোতে কিছুটা ইতস্তত বোধ করছে সম্ভবত। "আমিও তোমাকে মিস করছি।"

"আমার কেউ নেই আরতি।"

"একথা বলবে না। বাবা আছে, রাঘব, আমি...আমরা সবসময় তোমাকে নিয়ে কথা বলি," সে বলল।

"আমরা কেন কাপল হচ্ছি না?"

"না। দয়া করে এসব আবার শুরু কোর না। আমরা এসব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি," বলল সে।

"কেন না? তুমি বল তুমি আমাকে মিস কর। তুমি আমাকে যথেষ্ট কেয়ার কর। তাহলে?"

"আমি তোমাকে অনেক কেয়ার করি, কিন্তু ঐভাবে না। যাহোক, আমাদেরকে

আমাদের নিজ নিজ ক্যারিয়ারের দিকে মনযোগ দিতে হবে। তুমি ওখানে আমি এখানে।"

"আমার যদি একজন গার্লফ্রেন্ড থাকত তাহলে আমি তার সাথে কমপক্ষে কথা বলতে পারতাম। আমি খুব নিঃসঙ্গ আরতি," বললাম তাকে।

"আচ্ছা...গোপাল তুমি হোমসিক হয়ে গেছ। তোমার যখন ইচ্ছা আমার সাথে কথা বোল। তাছাড়া আমরা চ্যাট করতে পারি।"

"ইন্টারনেটে?" আমি অনেকগুলো সাইবার-ক্যাফে দেখেছি আমার বাড়ির আশেপাশে।

"হ্যা, জিমেইলে একটা আইডি খোলো। আমার আইডিটা হচ্ছে flyingaarti@gmail.com। আমাকে ইনভাইট কোর।"

"উড়ন্ত আরতি," আমি হাসলাম।

"চুপ কর।"

আমি আরো জোরে হাসলাম।

"কমপক্ষে এটা তোমাকে খুশি করতে পেরেছে," সে বলল।

"আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।"

"কোন প্রস্তাব নেই। আর এখন শুধু শুধু তোমার টাকা নষ্ট কোর না। আমরা সন্ধ্যায় চ্যাট করব। আমি আমার কেমন যাচ্ছে সে সম্পর্কে বলব আর তুমি তোমার সম্পর্কে বলবে, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা। অ্যাই শোন, আমি কি একটা জনপ্রিয় কিন্তু খুবই ব্যয়বহুল কোচিংয়ে ভর্তি হব, নাকি উঠতি এবং কম খরুচে কোনটায় ভর্তি হব?"

"সবচেয়ে ভাল যেটায় তুমি ভর্তি হতে পার, সবসময়," আরতি তাড়াতাড়ি করে বলল। "আর এখন, বিদায়। আমাকে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকছে।"

কোটায় একসপ্তাহ যেতেই আমি আমার অনেকগুলো সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে গেল। প্রথমত, আমি বনসালের পরীক্ষায় চান্স পাই নি। এটা আমাকে কোটায় থাকার উদ্দেশ্যকেই একপ্রকার পরাভুত করেছে। রেজোনেন্স একেবারে শেষ সময়ে তাদের ফি উল্লেখ করেছে। এটা আমার সামর্থের বাইরে। তাই আমি তাদের পরীক্ষা দেই নি। তবে আমি ক্যারিয়ার পাথের অপেক্ষমান তালিকায় আছি।

"তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অনেকেই বনসাল আর রেজোনেন্সে ভর্তি হয়ে যাবে," ক্যারিয়ার পাথের লোকটা আমাকে বলল।

এমনকি ক্যারিয়ার পাথের অপেক্ষমান তালিকাও মূল্যবান। এইম আইআইটি আর ক্যারিয়ার ইগনিট আমাকে ৩০% ছাড় দিল।

"তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তুমি ক্যারিয়ার পাথে চান্স পেয়েছ, যেটা তোমার সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। এখন আমাদের সাথে কম খরচে পড়াশোনা কর আর পরীক্ষায় চান্স পাও," এইম আইআইটি'র লোকটা বলল।

"ক্যারিয়ার পাথের হাজারো স্টুডেন্টের মাঝে তুমি হারিয়ে যাবে। ইগনিটে তুমি হবে স্পেশাল একজন," প্রাক্তন বনসাইলেট যে কিনা আরেকজন প্রাক্তন বনসাইলেটের কোচিং চালাচ্ছে সে বলল।

যাহোক, পাঁচ দিন পরে ক্যারিয়ার পাথ আমাকে জানালো আমি চান্স পেয়েছি। আমি ক্যারিয়ার পাথের অ্যাকাউন্টেন্টকে কম্পিত হস্তে বিশ হাজার রুপি দিলাম।

"এটাই হবে তোমার জীবনের সবচে ভাল বিনিয়োগ," অ্যাকাউন্টেন্ট বলল।

প্রথম টার্মের জন্য যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করলাম–কোর্সের সিলেবাস, আইডি কার্ড, ক্লাস রুটিন, বিজ্ঞাপন, আর বিভিন্ন শিট যেগুলো আগামি তিন মাস লাগবে। আমি ক্যারিয়ার পাথের তিন সেট ইউনিফর্মও নিলাম। এগুলো পরাতে আমাকে কোন একটা হোটেলের রিসেপসনিস্টের মত লাগছে। আমি কোচিং থেকে এগুলো এসব হাতে নিয়ে বেরোলাম।

"অভিনন্দন!" কালো কোট পরা একজন লোক আমাকে থামাল।

"হ্যালো," আমি অন্য কি বলা যায় ভেবে পেলাম না।

"আমি সঞ্জিব স্যার। স্টুডেন্টরা অবশ্য আমাকে মিঃ পুলি বলে। আমি এখানে ফিজিক্স পড়াই।"

আমি তার সাথে হ্যান্ডশেক করলাম। আমি খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলাম কোটার কোচিংগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিত-ব্যক্তিরা আছে। ক্যারিয়ার পাথে তাদের নিজস্ব জাদুকররা আছে। মিঃ ভার্মা, যে কিনা ম্যাথ পড়ায়, তার কাছে আছে ত্রিকোনমিতি জাদুর কাঠি। মিঃ জাদেজা রসায়ন পড়ান। স্টুডেন্টরা তার নাম দিয়েছে সমতাজি। তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে রসায়নের বিক্রিয়া সমতাকরণের। গুজব আছে তিনি তা প্যাটেন্ট করার চেষ্টাও করেছেন।

"আমি গোপাল, বারানশি থেকে এসেছি।"

"এআইইইই প্রোগ্রাম?" মিঃ পুলি বলল।

"সাথে জেইই, স্যার।"

"ভাল। হাই পটেন্সিয়াল?" সে ক্যারিয়ার পাথের নিজস্ব শ্রেণীবিভাগের প্রতি নির্দেশ করল।

"না, স্যার," বলে আমি নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একবার নিচু নম্বর পেলে দৃষ্টি নিচু করে রাখা শেখা হয়ে যায়।

"ঠিক আছে, ব্যাপার না। অনেক নন-হাই পটেন্সিয়াল স্টুডেন্ট চান্স পেয়েছে। সবকিছুই কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে।"

"আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব, স্যার," বললাম তাকে।

"গুড," বলে মিঃ পুলি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

কোটায় যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই আমি পুরোদস্তুর কোটাইট হয়ে গেলাম। অন্য হাজার হাজার স্টুডেন্টের মত আমার জীবনেও একটা ছন্দ চলে এল। ক্যারিয়ার

পাথ একটা স্কুলের মতই, কিন্তু কোন আনন্দ নেই। ক্লাসে কেউ কোন শব্দ করে না, কারো সাথে দুষ্টুমি করে না অথবা ক্লাস ফাঁকি দেয়ার চিন্তা করে না। আসলে সবাই এখানে নিজের ইচ্ছায় এসেছে এবং একটা বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়েছে।

প্রতিদিন তিন থেকে চারটা ক্লাস হয়, বিকেল থেকে। যাতে ক্লাস টুয়েলভ্-এর স্টুডেন্টরা সকালে তাদের স্কুলে ক্লাস করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তারা স্কুলেই যায় না। একটা প্রাইভেট সিবিএসই স্কুলের সাথে ক্যারিয়ার পাথের একটা চুক্তি আছে। এ স্কুলটার একটা নমনীয় উপস্থিতি নীতি আছে। গুজব আছে স্কুলটা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার কারনে ক্যারিয়ার পাথের কাছ থেকে ভাল একটা ঘুষ পেয়ে থাকে।

ক্যারিয়ার পাথের পাশবিক শিডিউল প্রথমে আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে। লেকচার দুপুর দুইটায় শুরু হয়ে রাত নয়টা পর্যন্ত চলে। এরপর স্টুডেন্টরা বাসায় গিয়ে রাতের খাবার খায় আর 'প্রতিদিনের প্র্যাকটিস শিট' করে, যেটা ঐ দিনের অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে দশটা সমস্যার একটা সেট। আমার সাধারনত মাঝরাতের দিকে শেষ হয়। কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পরে জেগে উঠি এবং পরের দিনের পড়া তৈরি করি। এর মধ্যে টুকিটাকি কাজ যেমন কাপড় ধোঁয়া বা কিছু কেনাকাটা করে ফেলি। আমি এরকম রুটিনের মধ্যে চলে গিয়েছি ভাল প্রস্তুতি নেয়ার জন্য না, বরং আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই। আমি চাইনা কোটার নিঃসঙ্গতা আমাকে মেরে ফেলুক।

এক রাতে আমাদের ক্লাস দেরি করে শেষ হল। আমি সাড়ে নয়টায় সাইবার ক্যাফেতে পৌছলাম, আরতির সাথে চ্যাট করার প্রতিদিনের সময় থেকে আধা ঘণ্টা পরে। আমি অবাক হলাম, সে তখনো অনলাইনে।

আমি প্রতিদিনের মতই মেসেজ টাইপ করলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : হাই!

উড়ন্ত আরতি : হেই!! বল তো আমি কোথায়!

মেয়েদেরকে যদি দুনিয়ার সব ব্যাকরণের নিয়মের প্রচলন করতে দেয়া হত তাহলে বিস্ময়সূচক চিহ্ন ছাড়া সেখানে আর কিছুই থাকত না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কোথায়?

উড়ন্ত আরতি : আমি বিএইচইউ ক্যাম্পাসে। তাদের কম্পিউটার সেন্টারে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কিভাবে গেলে?

উড়ন্ত আরতি : রাঘব কলেজে জয়েন করেছে। সে আমাকে নিয়ে এসেছে। সে বলেছে আমি যে কোন সময় এসে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : এখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে না? তুমি বাসায় যাবে কিভাবে?

উড়ন্ত আরতি : আমি বাবার লাল গাড়িটা নিয়ে এসেছি। আমার সাথে ঝামেলা করবে কে?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : তুমি কয়দিন পরপর রাঘবের সাথে দেখা কর?

আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

উড়ন্ত আরতি : এটা কোন ধরনের প্রশ্ন? বন্ধুদের সাথে দেখা করার হিসেবও তুমি নিবে?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : শুধু বন্ধু, তাই না?

উড়ন্ত আরতি : হ্যা, হ্যা। তোমার তো গোয়েন্দা হওয়া উচিত, ইঞ্জিনিয়ার না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : হুমমম।

উড়ন্ত আরতি : আমি শুধুমাত্র তার ক্যাম্পাস দেখতে এসেছি। তো, তোমার কি খবর?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কোটায় একমাস শেষ করলাম।

উড়ন্ত আরতি : কমপক্ষে এখন আর কোটাকে হতচ্ছাড়া জায়গা বল না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : হ্যা। এখন আমি যথেষ্ট ব্যস্ত। রাত-দিন পড়াশোনা করতে হচ্ছে। অমাদের ক্লাস টেস্টও হচ্ছে।

উড়ন্ত আরতি : ওগুলো ভাল হচ্ছে তো?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : প্রথম পঞ্চাশ পার্সেন্টের মধ্যে আছি। এরকম একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ ক্লাসের তুলনায় খারাপ না।

উড়ন্ত আরতি : আমি শিওর তুমি চান্স পাবেই।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কে জানে? আমি যদি চান্স পাই তাহলে তুমি আমার প্রস্তাব রাখবে?

উড়ন্ত আরতি : আবার শুরু করলে!!!!

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : ?

উড়ন্ত আরতি : আমরা যেমন আছি সেটাই আমার পছন্দ। এরসাথে চান্স পাওয়ার কি সম্পর্ক? তুমি তো আমার ফেবারিট!!!

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : এত বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেয়া বন্ধ কর।

উড়ন্ত আরতি : হাহ্??!!!

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কিছু না। যাহোক, আজ আমি যাই। আমাকে প্রতিদিনের প্র্যাকটিস শিট করতে হবে।

উড়ন্ত আরতি : ঠিক আছে।

আমি আশা করেছিলাম সে আমাকে আরো কিছুক্ষণ চ্যাট করতে বলবে, শুধুমাত্র একটা ফালতু 'ঠিক আছে' বলবে না। আমি রাতে খেয়েছি কিনা তা-ও জানতে চাইল না...

উড়ন্ত আরতি : রাতে খেয়েছ?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : এখনো খাই নি। বাসায় গিয়ে খাব।

উড়ন্ত আরতি : কুল।

মেয়েরা যখন কিছু লুকাতে চায় তখন ছেলেদের মত কথা শুরু করে আর 'কুল' বা এধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : তুমি খেয়েছ?

উড়ন্ত আরতি : রাঘব আমাকে খাওয়াবে, যদিও তার ক্যান্টিনে। কিপ্টুস!

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : তবুও তোমাকে খুব উত্তেজিত লাগছে।

সে সাড়া দিল না। চ্যাটে কেউ যদি উত্তর দিতে দেরি করে, প্রতিটা মিনিট একেকটা ঘণ্টার মত লাগে। পাঁচটা দীর্ঘ মিনিট শেষে সে সাড়া দিল।

উড়ন্ত আরতি : কি?

আমিও তার মত দেরি করার খেলা খেলতে চাইলাম। কিন্তু আমি দশ সেকেন্ডের বেশি দেরি করতে পারলাম না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : কিছু না।

উড়ন্ত আরতি : আচ্ছা যাহোক, রাঘব এসেছে। সে আমাকে হাই বলছে। আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে বাসায় যেতে হবে। পরে চ্যাট হবে। Xoxo...

আমি বুঝলাম না Xoxo দিয়ে সে কি বুঝাতে চেয়েছে। x-গুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরা আর o গুলো দিয়ে চুম বুঝালে খুব ভাল হত। কিন্তু মনে হয় না আরতি তা বুঝাতে চেয়েছে।

সে লগ-আউট করে বেরিয়ে গিয়েছে। ইন্টারনেটের সময় শেষ হতে আরও বিশ মিনিট সময় বাকি আছে। সে সময়টা আমি বেশিরভাগ লোক যা করে কাটায় তাই করলাম–অফিসিয়াল আইআইটি ওয়েবসাইট আর পর্নো দেখা। আমার মনে হয় এ-দুটো জিনিস কোটায় ছেলেরা সবচেয়ে বেশি চায়। আর কোচিং সেন্টারগুলো কমপক্ষে এদের একটা পেতে সাহায্য করে।

অধ্যায় ৯

আরতির জন্মদিন আসতে আসতে কোটায় আমার তিন মাস শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথম বারের মত আমি ক্লাস টেস্টে প্রথম পঁচিশ পার্সেন্টের মধ্যে চলে এলাম। ব্যালেন্সজি আমাকে অভিনন্দন জানাল। আমার রসায়নের নাম্বার বিশ পয়েন্ট বেড়েছে। মিঃ পুলি আমার পদার্থবিদ্যার গড়পড়তা নাম্বার নিয়ে তত খুশি হল না। শিশির স্যার, যেকিনা সম্ভাব্যতার গুরু হিসেবে পরিচিত, আমার সিটের পাশে একটু বেশি সময় দাঁড়াল যেহেতু আমার গণিত নাম্বার দশ পার্সেন্ট বেড়েছে।

পদার্থবিদ্যা ক্লাসে বসে আমি উত্তরপত্র ব্যাগে রাখলাম। তিনশ সিটের লেকচার রুমটার দিকে তাকালাম আমি। মিঃ পুলি হ্যান্ডমাইকে লেকচার দিচ্ছেন আর যতবার তার মনে হচ্ছে সবাই যথেষ্ট মনযোগ দিচ্ছে না, ততবার মাইকে টোকা দিচ্ছেন।

আমাকে আরো অনেকদূর যেতে হবে। ক্যারিয়ার পাথ ক্লাসের কমপক্ষে প্রথম পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে মধ্যে থাকলে চান্স পাওয়ার আত্মবিশ্বাস থাকে।

আইআইটি'র একটা সিট কোন হাসি তামাশার ব্যাপার না," মিঃ পুলি বলল, যদিও কেউ সেটা দাবি করে নি।

এরকম অতিরিক্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ক্লাসে নিজের পজিশন ধরে রাখা আসলেই খুব কঠিন। সেটা করতে একজন ছাত্রকে পুরোপুরি আইআইটি'র মধ্যে ঢুকে যেতে হয়। তাকে এ চিন্তা নিয়েই বাঁচতে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে হয়, ঘুমুতে হয়।

প্রতি ক্লাসের প্রথম বিশজন ছাত্রকে রাজকীয় সম্মান দেয়া হয়। এদেরকে বলা হয় জিইএমএস, যে টাইটেলটা মাঝেমধ্যই ভুলে যাই আমি। জিইএমএস মানে হল 'Group of extra meritorious students.' এরা এতই অতি-পড়ুয়া যে এদের কাছে সেক্স করার চেয়ে পদার্থবিদ্যার সমস্যা সমাধান করা বেশি আনন্দের এবং এদের কাছে আনন্দ মানে পর্যায়-সারণী মুখস্থ করা। ক্যারিয়ার পাথ এদের বিশেষ যত্ন করে যেহেতু পরীক্ষায় এদের প্রথম একশ'র মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে, আর তাদের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাপন সুশোভিত করবে। লাক্স সাবানের অফিসাররা তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ক্যাটরিনা কাইফের সাথে যেভাবে ব্যবহার করে ক্যারিয়ার পাথও জিইএমএসদের ব্যাপারে অনেকটা সেরকম।

অবশ্য আমি এদের কেউ একজন হওয়ার পথে অনেক দূরে আছি। যাহোক পঁচিশ পার্সেন্টের মধ্যে থাকাতেই অনেক ভাল লাগছে। আরতির সাথে এটা শেয়ার করতে মন চাচ্ছে, তাছাড়া তাকে আমি বলেছি তার জন্মদিনে আমি সবার আগে উইশ করব।

বারোটার আগে আগেই টেলিফোন বুথে পৌছে রাত ১১:৫৮ মিনিটে তার নাম্বারে

কল করলাম। তার ফোন ব্যস্ত। আবারো চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হল না। পাঁচবার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাইন পেলাম না।

"অন্য কাস্টমারদের ফোন করতে দিন," দোকানদার লোকটি বলল।

ভাগ্যক্রমে লাইনে শুধুমাত্র একজনই দাঁড়িয়ে আছে, যে গোয়াহাটিতে তার মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবে। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম ১২:০৫ টায় তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

আমি দৌড়ে বুথের ভেতর গিয়ে আরতিকে আবার কল করলাম। লাইন ব্যস্তই দেখাল। কয়েকবার চেষ্টার পরে দোকানদার আমার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। সে বলল ১২:৩০-এর মধ্যে তাকে দোকান বন্ধ করতে হবে। আমি দুই মিনিট পরপর কল করতে থাকলাম কিন্তু কোন লাভ হল না।

জানি না কেন, কিন্তু আমি রাঘবের বাসায় ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আজ শুক্রবার হওয়াতে আমি জানি রাঘব সাপ্তাহিক ছুটিতে বাসায় এসেছে। তার নাম্বারে কল করার আগে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। এতরাতে ফোন বাজলে অবশ্যই বাসার সবাই বিস্মিত হবে। যাহোক, আমার সন্দেহই ঠিক। লাইন ব্যস্ত।

আমি রাঘব আর আরতির নাম্বার একটার পর একটায় কল করতে লাগলাম। কিন্তু কোনটাতেই লাইন পেলাম না। আমার আনন্দ রাগে রূপান্তরিত হওয়ায় আরতির প্রতি শুভেচ্ছা মাটি হয়ে গেল।

এতরাতে আরতিকে রাঘবের উইশ করার কি দরকার? আর জন্মদিনের উইশ এত লম্বা হয়?

দোকানদার বুথের জানালা চেপে ধরল, "আমি আরো বেশিক্ষণ থাকলে পুলিশ ঝামেলা করবে।"

"আপনি কি জানেন এখন কোথায় টেলিফোন বুথ খোলা পাব?" বললাম তাকে।

"রেলস্টেশনে," দোকানদার লাইট নিভিয়ে দিল।

কোন অটোরিক্সা চালক এসময় ন্যায্য ভাড়ায় রেল স্টেশন যেতে চাইল না। দৌড়ালে পাঁচ কিলোমিটার আধঘণ্টায় যাওয়া সম্ভব।

ঠিক একটায় পাঁচ কিলোমিটার দৌড় শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে কোটার এক নাম্বার প্লাটফর্মে পৌঁছলাম। এই সময়ও স্টেশন মানুষে গিজগিজ করছে। একটা ট্রেন আসতেই কোটার যাত্রীরা হুড়মুড় করে সিটের জন্য দৌড় দিল।

আমি একটা টেলিফোন বুথ খুঁজে পেয়ে আরতিকে কল করলাম। এইবার ফোন বাজল। আমি একটা লম্বা দম নিলাম। আমার মেজাজ নিয়ে কখনোই আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। জন্মদিনের মেয়েটা ফোন ধরতেই আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"হ্যালো?" আরতির বদলে প্রধান সাহেব ধরল ফোনটা।

"হ্যালো আঙ্কেল, আঙ্কেল আমি গোপাল," হঠাৎ বলে ফেললাম, যদিও ফোনটা

রেখে দেয়া দরকার ছিল। এতগুলো চেষ্টার পরে তার সাথে কথা বলতেই হবে।

"ওহ্ আচ্ছা। লাইনে থাক," বলে সে আরতির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল।

আরতি ফোনের কাছে এলে আমি তার বাবার সাথে তার কথোপকথন শুনতে পেলাম।

"ফোনে কতক্ষন কথা বলবে? তোমার বন্ধুরা ফোন করেই যাচ্ছে," তার বাবা গজগজ করে বলল।

"আজ আমার জন্মদিন, আব্বু," বলে সে ফোনটা তুলল।

"হ্যাপি বার্থডে আরতি," আমি উত্তেজিত হওয়ার ভান করে বললাম।

"হেই গোপাল! ধন্যবাদ। তোমার ফোন পেয়ে দারুণ লাগছে। তুমি আমাকে উইশ করার জন্য এত রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে?" সে বলল।

আমি পাঁচ কিলোমিটার দৌড়েছি এবং আরো পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ে যেতে হবে, বলতে চেয়েও বললাম না। "আমি একঘণ্টা ধরে ফোনে চেষ্টা করছি।"

"সত্যি?" আরতি বলল।

"হ্যা, লাইন ব্যস্ত ছিল। কে ফোন করেছিল? আমি প্রথম উইশ করতে চেয়েছিলাম," বললাম তাকে।

"ওহ্ আমার কাজিন, তুমি তো জানো ঐ যে ইউএসএ-তে থাকে? আমার আন্টিও ওখানে থাকে, জানো না?"

আরতির কথাগুলো একেবারেই খাপছাড়া লাগল। সে ভুলে গিয়েছে আমি তাকে আট বছর ধরে চিনি। সে মিথ্যা বললে আমি তা বুঝতে পারি।

"তারা এতদূর থেকে একঘণ্টা কথা বলল?"

"একঘণ্টা কোথায়? মাত্র দুই মিনিট কথা বলেছি। হয়তো আমি ফোনটা ঠিকভাবে রাখি নি। বাদ দাও, তুমি কেমন আছ? তুমি এখানে থাকলে খুব ভাল হত।"

"তাই?"

"হ্যা, অবশ্যই! তোমাকে অনেক মিস করি," আরতি বলল। তার কণ্ঠ এতই মিষ্টি লাগল, সে যে দশ সেকেন্ড আগে মিথ্যা বলেছে তা বিশ্বাস করাই কষ্টকর ঠেকল।

"তুমি যদি ফোন ঠিকভাবে না রাখ তাহলে আবার সেটা ঠিক করে রাখল কে?"

"গোপাল! জেরা করা বন্ধ করবে? আমি এসব ঘৃণা করি। আজ আমার জন্মদিন।"

"তুমি জন্মদিনে মিথ্যা বলবে?"

"কি?"

"আমাদের বন্ধুত্বের কসম খেয়ে বল তো রাঘব কল দেয় নি?" আমি বললাম।

"কি?" আরতি খুব জোরে বলল। "কসম? আমাদের বয়স কত, দশ?"

"সে ফোন করেছিল, তাই না? তুমি তার সাথেই কথা বলেছিলে। তোমাদের মধ্যে কি হচ্ছে?"

"এটা আমার জন্মদিন। তুমি কি আজকে এত ঝামেলা না করে পার না?"

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।"

"অনেক রাত হয়েছে। বাবা চারপাশে ঘুরঘুর করছে। কাল কলেজ শেষে ইন্টারনেটে চ্যাট করব, ঠিক আছে?"

"আমার ক্লাস আছে," বললাম তাকে।

"রোববার। তাহলে রোববার চ্যাট করব, দুপুরের দিকে, ঠিক আছে?"

"আরতি, আমাকে সত্যি কথা বল। আমি সত্যি কথাকে সবসময় সম্মান করি।"

"অবশ্যই, ঠিক আছে, এখন বাই। আব্বু আমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে, সত্যি কথা!"

"বাই," আমি বললাম।

হাটতে লাগলাম, কান্না না করার চেষ্টা করলাম অনেক।

রোববার পর্যন্ত ধৈর্য ধর। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

সে রোববারে মোটেও অনলাইনে আসল না। আমি সাইবার ক্যাফেতে দুই ঘণ্টা কাটালাম। দুপুর গড়িয়ে একটা হল, তারপর দুটো। একমাত্র পর্নোই আছে দেখার মত। আমি এতগুলো এক্স-রেটেড ভিডিও নামালাম যে একটা ভিডিও লাইব্রেরি খোলা যাবে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

একটা সামান্য প্রতীজ্ঞা রক্ষা করা কি এতই কঠিন? আমি এই রোবাবার পর্যন্ত শুধুমাত্র তার জন্য অপেক্ষাই করেছি, অন্য কিছু করতে পারি নি। সে-ই সময় নির্ধারণ করেছে, আমি না। আমার রাগ প্রকাশ করা দরকার কিন্তু প্রকাশের কোন জায়গা পাচ্ছি না।

আমি নিরাশ হয়ে কম্পিউটারের সিপিইউ-তে লাথি দিলাম। পাওয়ার চলে গেল।

"কি করছেন আপনি?" সাইবার ক্যাফের মালিক চলে এল।

"সরি, আমার মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেছিলো," বলে দ্রুত চলে এলাম, একটা টেলিফোন বুথে গেলাম। তার ফোনে কল করলাম ধরল তার মা।

"শুভ বিকেল আন্টি, গোপাল বলছি।"

"হ্যালো গোপাল," আরতির মা সংক্ষেপে বলল। তার স্বামী হয়ত ডিএম, কিন্তু সে তার স্বামীর থেকে বেশি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ।

"আন্টি, আরতি আছে?"

"ও তো ভোরবেলায় রাঘবের সাথে কানপুর চলে গিয়েছে।"

"কানপুর?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে রাঘবের সাথে বারানশি হতে তিনশ' কিলোমিটার দূরে গিয়েছে!

"হ্যা, আইআইটি কানপুরে কি যেন অনুষ্ঠান আছে। রাঘব বিতর্ক টিমে আছে। আরতিও অংশগ্রহন করবে। মনে হয় গানেও।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। আরো তথ্য নেয়ার জন্য কি প্রশ্ন করব ভাবছি।

"কোন দরকার?" আরতির মা বলল।

ধুর, অবশ্যই দরকার আন্টি। আমি জানতে চাই আপনার মেয়ের কোন কান্ডজ্ঞান নেই?

"তেমন জরুরি কিছু না। তারা তো রাতের মধ্যেই চলে আসবে, তাই না? রাস্তাঘাট অনেক বিপজ্জনক।"

"অবশ্যই। ওরা সরকারী গাড়ি নিয়ে গিয়েছে। সাথে একজন সিকিউরিটি গার্ড।"

আরতির পাশে আমার নিজের সিকিউরিটি গার্ড বসাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

"ধন্যবাদ আন্টি," বললাম তাকে।

"ঠিক আছে। আর ঠিকভাবে পড়াশোনা কর। তারপর তুমিও একটা ভাল কলেজে ভর্তি হয়ে রাঘবের মত আনন্দ ফুর্তি করতে পারবে।"

"জি আন্টি," ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার অঙ্গীকারের কথা নিজেকে স্মরণ করিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

আমি আমার মানিব্যাগ চেক করলাম। নিজের সৃষ্ট একহাজার টাকা মাসিক বাজেটের একশ' টাকা আছে। নভেম্বর মাসের আরো দশ দিন বাকি। ফোনের পেছনে এত টাকা খরচ করাতে নিজেকে গালি দিলাম।

একবার ভাবলাম তাকে আর তাড়া করব না। *সে কল বা মেইল করুক*। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই তাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না। নিজের সাথেই পাগলের মত কথা বলতে লাগলাম।

সে রাঘবের সাথে প্রেম করতে পারে না। সে বলেছে সে প্রেম করার জন্য প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত হলে সে আমার সাথেই করবে, আশাবাদী গোপাল বলল।

কিন্তু নৈরাশ্যবাদী গোপাল সেটা মানতে পারল না।

আচ্ছা, রাঘব দেখতে ভাল, কিন্তু আরতি এতটা নিচুমনের হতে পারে না। আমি তাকে অনেক বছর ধরে চিনি, আশাবাদী গোপাল তর্ক জুড়ে দিল।

রাঘবের ভবিষ্যতও অনেক উজ্জল, নৈরাশ্যবাদী আমি বললাম।

কিন্তু সে কি শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষার র‍্যাঙ্কের উপর ভিত্তি করে একজনকে পছন্দ করবে? সে তো একটা মেয়ে, কোন ইন্সটিটিউট নয়, আশাবাদী আমি বললাম।

গোপাল তাকে হাসাতে পারে, নৈরাশ্যবাদী আমি'র কথা।

সার্কাসের জোকাররা তাকে আরও বেশি হাসাতে পারবে, আশাবাদী বলল।

এই দুই পাগলের চেঁচামেচিতে আমার মাথা ব্যথা করতে লাগল। মেয়েদের কোন ধারণাই নেই তাদের সামান্য কাজ ছেলেদের উপর কতটা প্রভাব রাখতে পারে। আরতির সাথে আমাকে কথা বলতেই হবে। তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমার মেজাজ আবার আগুনের মত হয়ে জ্বলে উঠল। আমার ইচ্ছে হচ্ছে কোটা স্টেশনে গিয়ে বারানশিতে চলে যাই। ব্যালেন্সজি বা আমার রেজাল্ট বা ফালতু

ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে কোন চিন্তাই আসছেনা।

রাঘব আরতির সাথে যদি কিছু করে, আমি শালা ওকে মেরেই ফেলব।

বাসায় পৌছে ছয়বার কলিং বেল চাপলাম।

"সব ঠিক আছে তো?" আঙ্কেল বলল।

"আমি বালের আত্মহত্যা করতে যাব না, ঠিক আছে?" চিৎকার টেনশন কমাতে সাহায্য করল।

"কি?" সে আমার কথায় স্তব্ধ হয়ে বলল।

"সরি," আমি বললাম। বাড়িওয়ালার সামনে তো আর বাল শব্দটা ব্যবহার করা যায় না।

সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না। তার কথা এত ভাবার কারনে নিজেকে মনে মনে গাল দিতে থাকলাম। সে যে আরেকজনের হতে চলেছে সেটাও না ভেবে থাকতে পারলাম না। ভালবাসা, অফিসিয়ালি, একটা কুত্তারবাচ্চা ছাড়া আর কিছুই না।

অধ্যায় ১০

পরদিন আমাদের একটা সারপ্রাইজ টেস্ট হল–যথারীতি খারাপ হল সেটা। রসায়ন ক্লাসে ব্যালেন্সজি অতি সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর না পারার কারণে বকা দিল আমাকে। এসবের থোরাই কেয়ার করি আমি। আমাকে মেয়েটার সাথে কথা বলতে হবে।

ক্লাসের শেষে আমি একটা সাইবার ক্যাফেতে গেলাম। সে অনলাইনে নেই। আমি জানি না কী করব। তাকে আবার কল করা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

ক্যারিয়ার পাথে আমার একটা জঘন্য সপ্তাহ কাটল। আমার রেজাল্ট আশি পার্সেন্টে নেমে গেল। ক্লাসের পাঁচ ভাগের চারভাগ আমার থেকে ভাল করছে। ক্যারিয়ার পাথ একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেসব শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ উন্নতি বা অবনতি হয়েছে তাদের লিস্ট করে। পরের লিস্টে আমার জায়গা হল।

"এটা মেনে নেয়া যায় না," শিশিরস্যার, সম্ভাব্যতার গুরু এবং ক্যারিয়ার পাথের পার্টনার বলল।

"আমি সরি স্যার," বললাম।

"আশা করছি তুমি নিশ্চয়ই বাজে ছেলেদের সাথে মিশছ না।"

"আমার কোন বন্ধুই নেই," সত্য কথাই বললাম।

"তাহলে বন্ধু তৈরি কর," শিশিরস্যার বললেন। "কোটার সাথে মানিয়ে নিতে তোমার বন্ধু দরকার হবে।"

আমি শিশিরস্যারের দিকে তাকালাম। তাকে যথেষ্ট তরুণ এবং বাস্তববাদী মনে হল। "আমি জানি এটা কত কষ্টের। আমি নিজেও একটা কোটা প্রোডাক্ট।"

রোবাবারে আমি আবার সাইবার ক্যাফেতে গেলাম। সবসময়ের মতই কোন ইমেইল নেই। যাহোক, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অনলাইনে এল।

আমার একটা অংশ ঠান্ডা হল। চ্যাট শুরু করলাম আমি।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: হাই।

সে দুই মিনিটের মধ্যেও উত্তর দিল না। আমি আরেকটা হাই পাঠালাম।

উড়ন্ত আরতি: হাই গোপাল।

সে আমাকে গোপি ডাকে নি। এটা স্বাভাবিক মনে হল না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তোমার কি মন খারাপ?

উড়ন্ত আরতি: না, আমি ঠিক আছি।

মেয়েদের 'আমি ঠিক আছি' যেন কোন জাহাজের সামনে বরফপিন্ড বোঝায়।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: আমরা কি চ্যাট করতে পারি?

উড়ন্ত আরতি: যদি তুমি চেঁচামেচি না কর।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: আমি ঐ দিনের জন্য সরি।

আমি আরো বলতে চাচ্ছি সে কথা দিয়েও গত রোবাবার চ্যাটে আসে নি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সে কেন রাঘবের সাথে আইআইটি কানপুরে গিয়েছিল। যাহোক, আমি এত শক্ত কথা বললে সে আমাকে নীরবতার শাস্তি দিবে যেটা আমাকে খুন করে ফেলবে। প্রথমত, আমি তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে চাই।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: আমার মেজাজের অবস্থা তো জানই, আমি এটা ঠিক করে ফেলব।

উড়ন্ত আরতি: ঠিক আছে। সাধারণ ক্ষমা দেয়া গেল।

আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছে আমি সরি বলতেই সে এটাকে ক্ষমার পর্যায়ে নিয়ে গেল। ইন্টারনেটে চ্যাটের একটা লাভ হচ্ছে এখানে আবেগকে দমিয়ে রাখা যায়। আমি কয়েকটা লম্বা দম নিয়ে স্বাভাবিক কিছু লিখার চেষ্টা করলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তো, কি খবর?

সন্দেহে থাকলে একটা প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

উড়ন্ত আরতি: তেমন কিছু না। কিছু বন্ধু হয়েছে। তেমন বেশি না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: বিশেষ কেউ?

প্রশ্নের শেষে আমি একটা সুপরিকল্পিত স্মাইলি দিয়েছি। এটা আমার তীব্র কৌতুহল এবং রাগ ঢেকে দিয়েছে।

উড়ন্ত আরতি: আহহা, গোপি।

এখানে, আমার ডাকনাম চলে এসেছে। তার মন হালকা হয়েছে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: ঠিক আছে তো, আমাকে বল। তুমি আমাকে বলবে না? তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে।

উড়ন্ত আরতি: আমি জানি না। তুমি খুব মন খারাপ কর।

আমার হৃদপিন্ড ধক্‌ধক্ করতে লাগল। আমি প্রতিটা শব্দ একবারে টাইপ করতে লাগলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি : বল, বল। তাড়াতাড়ি বল

তাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য আমি এত্তোগুলো স্মাইলি দিয়েছি।

উড়ন্ত আরতি: আচ্ছা, একজন বিশেষ কেউ আছে।

একটা লোহার ছুরি যেন আমার বুকে বিদ্ধ হল। ব্যথা চেপে আমি টাইপ করতে লাগলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি:

উড়ন্ত আরতি: তুমি তাকে চেন।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি:

উড়ন্ত আরতি: আসলে খুব ভাল করে চেন।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: বল, কে

উড়ন্ত আরতি: মি: বিএইচইউ, আর কে?

ছুরিটা আমার হৃদপিন্ডকে এখন টুকরো টুকরো করছে। আমার দাঁত শক্ত করে চেপে ধরলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: সত্যি?

যতক্ষণ দম আছে স্মাইলি দিয়ে যাচ্ছি।

উড়ন্ত আরতি: হ্যা। সে একটা পাগল। পাগল স্টুপিড রাঘব!!! সে আমাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তো...তোমরা খুবই ঘনিষ্ঠ?

উড়ন্ত আরতি: মোটামুটি।

আমি আর স্মাইলি দিতে পারলাম না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: মোটামুটি?

উড়ন্ত আরতি: চুপ, এসব জিজ্ঞেস কোরো না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তোমরা ওটা করে ফেলেছ?

উড়ন্ত আরতি: কি বল, গোপি। না। এখনো না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: মানে?

উড়ন্ত আরতি: মানে হ্যা...ওহ্, আমাকে বিব্রত কোর না।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: কি বাল বলছ এসব?

উড়ন্ত আরতি: মানে???

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: আমি ভেবেছিলাম তুমি এসব কাজে মোটেই আগ্রহী না।

উড়ন্ত আরতি: কোন কাজে?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তুমি বলেছ শুধুমাত্র বন্ধুত্বই যথেষ্ট। আমার সাথে। অন্য যে কারো সাথে।

উড়ন্ত আরতি: বলেছিলাম? আমি জানি না। এটা মোটামুটি হঠাৎ হয়ে গেল।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: এটা কিভাবে মোটামুটি হয়ে গেল? তুমি মোটামুটি তোমার কাপড় খুলে ফেললে?

আমার উত্তেজিত মেজাজ আবার ফিরে এল আর কন্ট্রোল তার হাতে নিয়ে নিল।

উড়ন্ত আরতি: তোমার ভাষা ঠিক কর।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: কেন? তুমি কি কোন ভাল কেউ নাকি? নোংরাদের মত আচরন করছ।

সে জবাব দিল না। আমি লিখতেই থাকলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: কারণটা কি দয়া করে বলবে? সে জেইই-তে চান্স পেয়েছে তাই?

উড়ন্ত আরতি: চুপ কর গোপাল। তার আর আমার মধ্যে সম্পর্কটা খুবই বিশেষ।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তাই? এটা বিশেষ হল কিভাবে? তুমি কি তার সাথে সেক্স করেছ নাকি? কোথায়? হোস্টেলে নাকি কানপুরে?

সে উত্তর দিল না। আমি বুঝতে পারলাম খুব বেশি বলে ফেলেছি। যাইহোক,

চ্যাটের একটা লাইন মুছে ফেলা সম্ভব না। আর আমি তার কাছে আবার ঐ বালের ক্ষমাও চাইব না।

আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিন মিনিট পরে স্ক্রিনে একটা মেসেজ আসল: উড়ন্ত আরতি অফলাইনে।

আমি স্ক্রিন রিফ্রেশ করলাম। আরেকটা নোটিফিকেশন এসেছে: উড়ন্ত আরতি আর কন্ট্যাক্টে নেই।

সে আমাকে তার লিস্ট থেকে রিমুভ করে দিয়েছে।

"আপনার কি সময় বাড়াতে হবে?" সাইবার ক্যাফের মালিক জিজ্ঞেস করল।

"না, তার দরকার হবে না, অনেকদিনই দরকার হবে না," আমি বললাম।

আরতি আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করার দিন থেকেই আমি আমার প্রতিদিনের প্র্যাকটিস শিট করা বন্ধ করে দিলাম। আমি সাইবার ক্যাফেতেও যাই না। বরং আমি আমার বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার পাশে শামান চা দোকানে বসে থাকি। স্টুডেন্টরা এক হাতে চায়ের কাপ আর অন্যহাতে শিট নিয়ে ডজনখানেক বেঞ্চ দখল করে বসে থাকে। আমি দোকানে পড়ার কোন জিনিস আনি না। আমি বসে থাকি, সময় নষ্ট করি, ভিড়-ভাট্টা দেখি আর কাপের পর কাপ চা খাই।

একদিন চা খেয়ে দেখলাম আমার সাথে টাকা নেই।

"আমি দুঃখিত," দোকানদার শামানকে বললাম, "আমি কাল টাকা দিয়ে দিব।"

অপরিচিত কেউ একজন সামনে এসে দোকানদারকে দশ রুপি দিল। "ব্যাপার না," আমাকে বলল সে।

"ওহ্, ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"বনসাল?" সে বাকি টাকা নিতে নিতে বলল।

"ক্যারিয়ার পাথ," আমি বললাম। "কাল তোমাকে দিয়ে দিব। মানিব্যাগ ভুলে বাসায় রেখে এসেছি।"

"আরে সমস্যা নেই," বলে সে হাত বাড়িয়ে দিল। "আমি প্রতীক, বাড়ি রায়পুর।"

শেভ করা মুখে তাকে পরীক্ষার্থীর মত লাগছে না, আর্টিস্টের মত লাগছে।

"রিপিটার?" প্রতীক বলল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"কোয়াইটার," সে বলল।

"সেটা কি?"

"কোটায় থেকে চেষ্টা করেছ। কাজ হয় নি। এখনো এখানেই ঝুলে আছ কিছুদিন শান্তি পাবার জন্য।"

আমি হাসলাম। "আমার র‍্যাঙ্ক ছিল ৫০,০০০। আমার ধারনা আমি আরেকবার চেষ্টা করলে হয়তো চান্স হয়ে যাবে।"

"তুমি পেতে চাও?" প্রতীক জিজ্ঞাসা করল।

আমি চুপ করে থাকলাম। আমরা দুজন দোকানের বাইরে বাঁশের টুলে বসে আছি।

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোয়াইটার হওয়ার পথে আছ," সে বলল।

"আমি ঠিক আছি। কিছুটা মন খারাপ। ক্যারিয়ার পাথের সামনের বেতনটা দেয়া হয় নি। বাবার কাছে এত টাকা ক্যাশ নেই।"

"চলে যাও," প্রতীক বলল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে সাধল। আমি না করে দিলাম।

"আমি যেতে পারব না। বাবার সব আশা আমাকে ঘিরে। সে টাকা ধার করে পাঠাবে।"

প্রতীক মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল।

"আমি ক্লাসের প্রথম পঁচিশ পার্সেন্টের মধ্যে এসেছিলাম," আমি যে এখানে আছি সেটা বোঝানোর জন্য বললাম।

"পৌছেছিলে? তুমি এখনো কোর্স করছ, ঠিক?"

"গত কয়েক সপ্তাহে পেছনে পড়ে গিয়েছি।"

"কেন?"

"কিছু না," আমি চায়ে চুমুক দিলাম।

প্রতীক তার কাপ খালি করে আরেক কাপের অর্ডার করল। "এটা কি কোন মেয়ের কারণে?" সে বলল।

"আমি তোমাকে চিনিও না। আমি তোমার টাকা কাল দিয়ে দিব। জেরা করা বন্ধ কর," বললাম তাকে।

"আহা, ঠিক আছে। আমি শুধুমাত্র কথা বলছি," সে হেসে আমার কাঁধ চাপড়ে দিল।

চুপ করে থাকলাম। আরতির সাথে অগণিত নৌকা ভ্রমণের দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে। আমি কিভাবে খালি হাতে বাইতাম। পরে সে কিভাবে আমার হাত ম্যাসাজ করে দিত...মনে হতেই আমি হাত মুঠিবদ্ধ করলাম।

আমি তাকে ঘৃণা করি। কিন্তু অনেক অনেক মিস করি।

প্রতীক কোন কথা উচ্চারণ না করেই দুটো সিগারেট শেষ করে ফেলল।

"হুম। একটা মেয়ে," আমি অসন্তোষভরে বললাম।

"ছেড়ে চলে গিয়েছে?" সে হেসে বলল।

"কখনো আসেই নি আমার কাছে।"

"এরকম হয়। আমরা অভাগা। আমরা সহজে কোন জিনিস পাই না। নম্বর, র‍্যাঙ্ক, মেয়ে–কোনকিছুই আমাদের জন্য সহজ না।"

"হ্যা, সবাই আমাদের ঘোরায়। কোটার ক্লাস থেকে শালার বাসা পর্যন্ত সব," আমি বললাম।

"শালার বাসা, হ্যা? তোমাকে খুব মজার মানুষ মনে হচ্ছে।" প্রতীক আমার সাথে

হাই-ফাইভ করল।

"আমি বরং বাসায় যাই।"

"আমাদের বাসা নেই। আমরা হচ্ছি এমন মানুষ যারা সব কিছুর বাইরে। না বাসা, না স্কুল, না কলেজ, না চাকরি। কিছুই নেই আমাদের। শুধু কোটা আছে," সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

প্রতীক রেজোনেন্সে পড়ে, একজন রিপিটার। সে প্রথমবারেই কোয়াইটার হয়ে গিয়েছে। আর এখন পুরোপুরি আশা ছেড়ে দিয়েছে। প্রতি রাতে শামানের দোকানে এসে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

একদিন চা যথেষ্ট মনে হল না। মিঃ পুলি আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে।

"বের করে দিয়েছে তো কি হয়েছে? এটা তো আর আসল কলেজ না," প্রতীক বলল।

"আরে এত বোরিং লেকচার যে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম," বললাম তাকে।

সে হাসলো।

"আমি আজ তাদের দ্বিতীয় কিস্তি দিলাম, এরপরও আমার সাথে এমন ব্যবহার করল।"

"শান্ত হও, আমাদের আজ চায়ের থেকে বেশি কিছু দরকার," প্রতীক উঠে দাঁড়ালে আমরা দোকান থেকে বেড়িয়ে আসলাম।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"আমার বাসায়," সে বলল।

প্রতীকের রুম কোটার অন্যান্য কঠোর পরিশ্রমী রিপিটারের মত লাগল না। বইয়ের থেকে বিয়ারের বোতলের সংখ্যাই বেশি, সিগারেটের টুকরোর সংখ্যা কলমের চাইতে বেশি। দেয়ালে রেজোনেন্সের সার্কুলারের বদলে স্বল্পবসনা মেয়েদের ছবি ঝুলছে।

"তুমিতো এখানে আসলেই খুঁটি গেড়ে বসেছো," বললাম তাকে।

"আমি চাইলে পারতাম। বাবা-মা এবছরের পরে আর কোন টাকা দিবে না," সে বলল। আলমারি থেকে পুরনো মদের একটা বোতল বের করল সে। একটা গ্লাসে আমার জন্য নির্জল রাম ঢালল যেটার স্বাদ খুবই বিস্বাদ।

"এবছর শেষে কি হবে?" আমি বললাম।

"কিছু না। বাবা-মা বাস্তবতা বুঝতে পারবে। তারা দুজনেই শিক্ষক। আশা করছি দুটো বছর এবং তাদের সঞ্চয়ের অর্ধেকটা নষ্ট হওয়াতে তারা বুঝতে পারবে তাদের ছেলে কোন ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাবে না।"

"তুমি কঠোর পরিশ্রম করলে কিন্তু পাবে," বলে আমি আমার ড্রিংক একপাশে সরিয়ে রাখলাম।

"না, আমি পাব না," প্রতীক বলল। তার কণ্ঠ দৃঢ়। "তিন পার্সেন্টেরও কম

স্টুডেন্ট চান্স পায়। বেশিরভাগই পায় না, স্বাভাবিক সম্ভাব্যতা। কিন্তু বাবা-মায়ের মাথায় এসব কথা ঢোকাবে কে? যাহোক, তোমার ড্রিংক এক চুমুকে শেষ কর।"

রাম খেতে গরম আর তেতো ঔষধের মত লাগল। আমি জোর করে গলা দিয়ে নামালাম। আমাকে আরতির চিন্তা থেকে বাঁচতে হবে। কখনো কখনো একটা কষ্টের অনুভূতি থেকে বাঁচতে আরেকটা কষ্টের অনুভূতির আশ্রয় নিতে হয়।

আমি আবার রাম চাইলাম। তারপর আবার। তাড়াতাড়িই আরতি আর ততটা কষ্টকর লাগল না।

"তুমি তাকে ভালবাসতে?" প্রতীক জিজ্ঞেস করল।

"ভালবাসা কি?"

"ভালবাসা হচ্ছে আইআইটি পরীক্ষায় চান্স পেলে তোমার বাবা-মা তোমাকে যা দিত," সে বলল।

আমরা হাই-ফাইভ করলাম। "আমার ধারণা আমি বাসতাম," একটু পরে বললাম।

"কয় বছর ধরে?" সে একটা সিগারেট ধরাল।

"আট বছর।"

"বল কি! তোমাদের কি জন্মের সময় হাসপাতালে দেখা হয়েছিল?" প্রতীক বলল।

আমি মাথা দোলালাম। পরবর্তী তিন ঘণ্টায় আমি তাকে আমার একপক্ষীয় ভালবাসার গল্পসমগ্র শোনালাম। প্রথম যেদিন আমি তার কেক চুরি করেছিলাম সেদিন থেকে যেদিন শেষবারের মত সে আমার হাত ম্যাসেজ করে দিয়েছিল, আর শেষমেষ যেদিন সে লগ-আউট করল, আমাকে তার লিস্ট থেকে রিমুভ করে দিল সেদিন পর্যন্ত।

প্রতীক চুপ করে শুনল।

"তো? তোমার কি মনে হয়? কিছু বল," আমি বললাম। অবাক হলাম সে এখনো সজাগ।

"তুমি অনেক কথা বলতে পার, ম্যান!" সে আমাকে সবটুকু রাম ঢেলে দিল।

"সরি," আমি ঘুমকাতুরে গলায় বললাম।

"ঠিক আছে। তাকে ভুলে যেতে চেষ্টা কর। তার জেইই বয়ফ্রেন্ডের সাথেই তার মঙ্গল কামনা কর।"

"আমি তাকে ভুলতে পারছি না। সে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করার পর আমি একদিনও পড়াশোনা করি নি।"

"মন খারাপ কোর না। তুমি আরেকটা মেয়ে পাবে। সবাই মেয়ে পায়। এমনকি যার রেজাল্ট সবচেয়ে খারাপ সে-ও। তুমি কি ভেবেছ, ইন্ডিয়ার এত জনবসতি কিভাবে এল?"

"আমি কখনো বিয়ে করব না," বললাম।

"তো কি করবে? তোমার হাতকে বিয়ে করবে?" প্রতীক হাসিতে ফেঁটে পড়ল।

ছেলেরা আসলেই ফাল্তু। তারা যে রিলেশনশিপ সম্পর্কে কিছু জানে না তা কিছু ফালতু কৌতুক দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়।

"আমি বরং যাই," বললাম তাকে।

সে আমাকে থামাল না, মেঝেতে শুয়ে পড়ল, এতই ক্লান্ত যে বিছানায় যেতে পারছে না। "তোমার গ্রিপ আলগা কোর না," সে চিৎকার করে বলল যখন আমি তার বাসা থেকে বেরোচ্ছি।

গ্রিপ। হ্যা, এটাই ঠিক শব্দ। এসব ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম হল আপনার এগুলোর ওপর দখল থাকতে হবে। একটা গেমপ্ল্যান থাকতে হবে। কোনগুলো আপনার সবল বিষয় আর কোনগুলো দুর্বল বিষয়। আপনি কি দুর্বল বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করছেন? আপনি কি টেস্টগুলোর রেজাল্ট পর্যালোচনা করছেন? আপনি কি সারাদিন অন্য কিছু চিন্তা না করে শুধুমাত্র পরীক্ষা নিয়ে ভাবছেন? আপনি কি আপনার খাবার এবং গোসলের সময় কমিয়ে এনেছেন যাতে করে পড়ার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়? এই সবগুলো প্রশ্নের জবাব যদি হ্যা হয় তাহলেই আপনি বলতে পারবেন আপনার দখলে আছে। এটাই একমাত্র উপায় যখন আপনি সিটের আশা করতে পারেন। অবশ্যই, আপনি ঐসব প্রাকৃতিকভাবে প্রতিভাধর ছাত্র হতে পারেন যাদের বেশি পড়ার দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই তা না, আমাদের বাবা-মায়ের মধ্যমপ্রজাতির জিনের কারনে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐসব বাবা-মা যারা এসব বাজে জিন দিয়েছে তারাই বুঝতে অনেক বেশি সময় নেয় যে তার সন্তান আইনস্টাইন নয়।

আমি আমার দখল হারিয়ে ফেলেছিলাম। কমপক্ষে আরতি আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করার তিনমাস পর্যন্ত। নেশাগ্রস্ত প্রতীক অমার নতুন এবং একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠল। আমি ক্লাসে যেতাম, যদিও আমার নেশাগ্রস্ততার কারনে বেনজিন স্ট্রাকচার বা রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ কি জিনিস তা বুঝতে পারতাম না। আমি প্র্যাকটিস শিট করতে চেষ্টা করতাম কিন্তু মনযোগ দিতে পারতাম না। শিক্ষকরা আমাকে কোয়াইটার হিসেবে দেখতে লাগল, আমার দিকে মনযোগ দেয়া বন্ধ করে দিল। আমি একটা বাজে ছাত্র হয়ে উঠলাম, একজন আশাহীন ছেলে যে এখানে আছে কারণ সে কোচিংকে টাকা দিয়েছে।

আমার আরেকটা সমস্যা বেড়ে উঠল। আমার খরচ বেড়ে গিয়েছে, কারন আমাকে রামের জন্য টাকা খরচ করতে হয়। প্রতীক প্রথমে আমার দাম দিয়ে দিত, কিন্তু কিছুদিন পরে সে আমাকে আমার দাম দিতে বলল। আমি জানি বাবা ধার করে শেষ কিস্তির টাকা দিয়েছে, এখন তার কাছে কোন টাকা নেই কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।

একরাতে আমি টেলিফোন বুথ থেকে বাসায় ফোন করলাম।

"সরি, গতসপ্তাহে কল করি নি বাবা," আমি বললাম।

"না, ঠিক আছে। তুই ভাল করে পড়াশোনা করছিস," বাবা বলল। তার কণ্ঠ দুর্বল।

"বাবা, কিছু সমস্যা আছে," বললাম তাকে।

"কি?"

"আমাকে কিছু বই কিনতে হবে। এগুলো নাকি ম্যাথের জন্য সবচেয়ে ভাল।"

"কারো কাছ থেকে ধার করা যায় না?"

"কঠিন," আমি বললাম। "সবাই যার যারটা নিজের কাছে রাখতে চায়।"

বাবা থামলেন। আমি চুপ করে থাকলাম এক-লাইনে এতগুলো মিথ্যা বলার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

"কত লাগবে?"

"দুই হাজার। খুবই দরকার।"

"ঠিক আছে।"

"তোমার কাছে কি টাকাটা আছে, বাবা?"

"এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠালে কি হবে?"

"কি পরিমাণ ধার করেছ তুমি, বাবা?" আমি বললাম।

"পঞ্চাশ হাজার," বললেন তিনি। "ত্রিশ হাজার তোকে পাঠিয়েছি, ছাদটা ঠিকঠাক করতে আরও কিছু লেগেছে।"

"তোমার চিকিৎসার বিলের কি অবস্থা?"

"হাসপাতালে বিশ হাজার টাকা বাকি আছে।"

"তুমি আরও ধার করবে, তাই না?"

"হয়তো।"

"তুমি যা পারো পাঠাও। আমি এখন যাব। এটা অনেক ব্যয়বহুল কল," তাড়াতাড়ি এ অগ্নিপরীক্ষা থেকে বাঁচতে আমি বললাম।

"তুই চান্স পাবি, তাই না গোপি?"

"হ্যা, হ্যা, আমি পাব।"

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। আমার কাছে অসহ্য লাগছে। আমাকে পড়াশোনা শুরু করতে হবে। *আমি আবার পঁচিশ পার্সেন্টে যাব, তারপর পাঁচ পার্সেন্টে।* সারারাত পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু প্রথমে রামের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্খা কাজ করছে। আমার প্রতীজ্ঞা দুর্বল হয়ে গেল। আমি প্রতীকের বাসায় গেলাম, রাতের বেশিরভাগটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। কোন কিছুই আমাকে পড়াশোনায় অনুপ্রাণিত করতে পারল না। এভাবেই আমার জন্মদিন চলে এল।

অধ্যায় ১১

কোটায় আসার পাঁচ মাস পরে আমার জন্মদিন এল। জন্মদিনকে আমার কাছে তেমন বিশেষ কোন দিন মনে হল না, আমি অন্যান্য দিনের মত ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাহোক, আমার জন্মদিনের গভীর রাতে মি: সনি আমার দরজায় নক করল।

"ফোনে কেউ একজন তোমাকে চাইছে," সে ঘুমকাতুরে গলায় বলল।

"কে?" আমি অবাক হয়ে বললাম। "বাবা?"

"একটা মেয়ে," মি: সনি বলল। "আর, শুভ জন্মদিন।"

"ধন্যবাদ," বলে আমি ফোন উঠালাম। *কে হতে পারে?* ভাবলাম। ক্যারিয়ার পাথের কোন শিক্ষক? আমি কোন ভুল করেছি কি?

"শুভ জন্মদিন, গোপাল," আরতির চমৎকার কণ্ঠ যেন কোটার গরম আবহাওয়ায় বৃষ্টি ফোঁটার মত নেমে এল। আবেগ আমাকে উচ্ছ্বসিত করে ফেলল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

"আরতি?" আমি বললাম। চোখের পানি গাল দিয়ে গড়াতে লাগল। আটকাতে পারলাম না।

"তার মানে তুমি এখনো আমার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পার? আমি ভেবেছিলাম তোমার সাথে লুকোচুরি খেলা খেলব। আমরা কি কথা বলতে পারি? নাকি তোমাকে বিরক্ত করছি?"

আমি আমার মাথার মধ্যে আরতির সাথে কথা বলার এ দৃশ্য লক্ষ লক্ষবার কল্পনা করেছি। আমি ভেবেছিলাম সে যদি কল করে তাহলে তাকে একদমই পাত্তা দেব না। যেন আমি তাকে চিনিই না। অথবা খুব ব্যস্ততার ভান করব। অবশ্যই এ-ধরনের সব প্রস্তুতি জানালা দিয়ে পালাল। "না, না আরতি," আমি বললাম। "তুমি আমাকে মোটেই বিরক্ত করছ না।"

মাসের পর মাস আমি মোটেও শান্তি পাই নি। জন্মদিন বছরে একবারই কেন আসে?

"তো, জন্মদিনে বিশেষ কিছু করছো?" আরতি বলল।

"তেমন কিছু না। রাতে এক বন্ধুর সাথে খেতে যাব।"

"বন্ধু? ডেট না?" সে তার ট্রেডমার্ক করা দুষ্টকণ্ঠে বলল।

"প্রতীক। একটা ছেলে," আমি বললাম।

"ওহ, আচ্ছা," আরতি বলল। "তাহলে তো দারুণ।"

"শেষবার চ্যাটের জন্য আমি দুঃখিত।"

সে চুপ করে থাকল।

"আমার ওসব বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু তুমি আমাকে রিমুভ করে দিলে..."

"কেউ আমার সাথে কখনো ওভাবে কথা বলে নি।"

"আমি সরি।"

"ঠিক আছে। যাহোক, আজ তোমার জন্মদিন। আমি চাই না তোমার মন খারাপ থাকুক।"

"রাঘবের কি খবর?" আমি নিজেকে সংযত করতে না পেরে বললাম। অন্য যেকোন কিছু থেকে আমি তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে জানতে বেশি আগ্রহী।

"সে তো দারুণ। বিএইচইউ-তে তার প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছে।"

"অনেক পড়ছে নিশ্চয়ই।"

"না, তত বেশি না। আসলে সে ক্যাম্পাসের ম্যাগাজিন সম্পাদনা করছে। ওটা নিয়েই কথাবার্তা বলে।"

"তাহলে তো ভালই," আমি বললাম। সে এখনো তাদের দুজনের সম্পর্কে কিছুই বলে নি। আমি আগের বারের মত এত কৌতুহল দেখাতে চাইলাম না।

"সে একটা দারুন মানুষ, গোপাল। তোমার তাকে দেখা দরকার। সে পৃথিবীর জন্য কত কিছু করতে চায়।"

রাঘব পৃথিবীর জন্য কি করতে চায় তা আমার কাছে কোন বিষয়ই না, যতক্ষণ না সে পৃথিবীর একজন মানুষকে ছেড়ে দিচ্ছে। "আমি কখনো বলি নি সে খারাপ," বললাম তাকে।

"ভাল। আর আমি তাকে নিয়েই সুখি। তুমি যদি আমাকে বন্ধুর মত দেখ, তোমাকে সেটা মেনে নিতে হবে।"

"আমরা বন্ধু?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"তা না হলে আমি কথা বলতাম না, তাই না?" সে বলল।

আমি তাকে বলতে চাইলাম সে গত তি মাস ধরে আমার সাথে কথা বলছে না। কিন্তু মেয়েরা তাদের বিশ্বাসের বিপক্ষে প্রমাণ দেখালে খুবই মন খারাপ করে ফেলে।

"হ্যা, তা ঠিক," বললাম আমি, আবার কথা বলার আগে কিছুক্ষণ থামলাম। "তার মানে, আমরা কথা বলতে পারি?"

"হ্যা, যতক্ষণ না তুমি আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দাও। আর..."

"আর কি?"

"রাঘব আর আমাকে মেনে নাও।"

"আমার কি না মেনে কোন উপায় আছে?" বললাম তাকে।

"সেটাই কথা। আমি চাই তুমি এটা খুশিমনে মেনে নাও। তুমি তোমার মনের মানুষকে খুঁজে পেলে আমিও খুশি হব।"

ও, তার মানে রাঘব তার মনের মানুষ।

লোহার ছুড়িটা আবার আমার পেটে চলে এসেছে। কি বলব ভেবে বিস্মিত

হলাম। "আমি মেনে নিয়েছি," কিছুক্ষণ পরে বললাম। যা-ই হোক না কেন, আমি তার সাথে আবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। সে চলে যাওয়ার পরে আমার কোটাজীবন দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছে।

"দারুণ। কারণ আমি তোমাকে মিস করি," সে বলল, "বন্ধু হিসেবে।" শেষ সীমারেখার উপর জোর দিয়ে বলল সে।

মেয়েরা সবসময় একটা সূক্ষ্ম সীমানা রেখে দেয় যাতে কেউ পরে তাদের কিছু বলতে না পারে। যেমন আমি যদি তাকে বলি, "তুমিতো বলেছ আমাকে মিস কর," সে লাফিয়ে বলবে, "কিন্তু আমি তো বলেছি বন্ধু হিসেবে!" যেন আমরা একটা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েদের বোঝা খুবই কঠিন। আমি বাজি ধরতে পারি ক্যারিয়ার পাথের জিইএমএসরা-ও তাদের বুঝতে পারবে না।

"তুমি শুনছো?" সে আমার চিন্তার শেকলে বাধা দিয়ে বলল।

"হ্যা," আমি বললাম।

"আচ্ছা, আমাকে যেতে হবে। আবারো শুভ জন্মদিন!"

"ধন্যবাদ, বাই। তোমার সাথে কথা হবে নাকি চ্যাট..." বলে আমি থেমে গেলাম।

"আমি চ্যাটে তোমাকে আবার অ্যাড করব," হেসে বলল সে।

"আবারো সরি," বললাম আমি।

"বোকার মত কথা বলবে না, জন্মদিনের ছেলে। তুমি কাছে থাকলে তোমার গাল টেনে দিতাম," সে বলল।

এটাই। সে আবারো এটা করল–একটা স্নেহমাখা কথা বলে আমাকে আবারো দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিল। সে কি আমাকে পছন্দ করে নাকি করে না? ওহ, আচ্ছা, রাঘব তার মনের মানুষ, আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম।

"চ্যাট হবে," বলে সে ফোন কেটে দিল।

আমার কাছে এত ভাল লাগছে যে টেবিলের ওপর রাখা পদার্থবিদ্যা সমাধানটা চুমু দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমাকে পড়াশোনা করতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে।

ক্যারিয়ার পাথ কখনো জানবে না আমি কেন আবারো সর্বোচ্চ উন্নতিপ্রাপ্ত ছাত্রদের লিস্টে এলাম। আরতি আমাকে পুণরায় পড়াশোনা করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। হয়ত এটা ছিল চ্যাটে তার সামান্য 'সারা দিন কেমন কাটল?' বলা। আমি তার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে চাই, সারা দিনে কি কি কাজ করেছি তার রিপোর্ট দেই। স্যার ক্লাসে যে সমীকরন শিখিয়েছেন, স্যার আমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন (বিশেষ করে আমার প্রশংসা), আর রাতে কিভাবে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তাকে বলি।

সত্যি বলতে আমি এখনো তাকে প্রভাবিত করতে চাই। আমি কখনোই তার মন

পরিবর্তনের আশা ছাড়ি নি। মিঃ আশাবাদী গোপাল কখনোই আশা ত্যাগ করে না।

হয়তো আজ সে চ্যাটে আমাকে বলবে রাঘবের সাথে তার সেভাবে যাচ্ছে না, অথবা তার বয়ফ্রেন্ডের থেকে আমার সাথেই সে বেশি যোগাযোগ করছে।

যাইহোক, সে কখনোই এসব কথা বলে না। যদিও কখনো কখনো সে কাছাকাছি চলে আসে। একবার সে আমাকে বলেছে রাঘব একটা একগুয়ে পোকা। রাঘব তার কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশনার কারনে দু-দু'বার মুভি দেখার তারিখ পরিবর্তন করার পরে সে এটা বলেছে। আমি কল্পনাও করতে পারি না কোন ছেলে আরতির সাথে থাকার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারে। আমি ক্যারিয়ার পাথের পরীক্ষা বাদ দিতে পারি, ফালতু একটা ম্যাগাজিনের ফালতু প্রকাশনার কথা বাদই দিলাম, কিন্তু আমি তাকে এসব বলি নি। আমি আমার অবস্থান জানি; আমি, যে কিনা কখনোই নিজেকে রাঘবের সাথে তুলনা করতে পারি না।

একদিন সন্ধ্যায় চ্যাটে তাকে আমার ক্লাসের পার্ফমেন্স সম্পর্কে বললাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ আমি বিশে পৌছে গিয়েছি।

উড়ন্ত আরতিঃ কিসের বিশ?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ ক্লাসে আমার অবস্থান। ক্লাসের আশি পার্সেন্ট আমার থেকে খারাপ করছে। আমার সর্বোচ্চ রেজাল্ট!

উড়ন্ত আরতিঃ ওয়াও! দারুণ!

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ আরও অনেক দূর যেতে হবে।

উড়ন্ত আরতিঃ তুমি যেতে পারবে, সময় তো আছে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ সময় বেশি নেই অবশ্য। জেইই আর এআইইইই দুই মাসের মধ্যেই হবে।

উড়ন্ত আরতিঃ তুমি পারবে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ আমিও তাই আশা করি। কোর্সের মাঝের দিকে অবস্থা যদিও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

উড়ন্ত আরতিঃ কিভাবে?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ তেমন কোন কারণ না। মনযোগ দিতে পারছিলাম না। যাইহোক, কোটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে চাচ্ছি।

উড়ন্ত আরতিঃ আমি জানি...অনেকদিন তোমাকে দেখি না। মিস্ করছি তোমাকে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ সত্যি?

উড়ন্ত আরতিঃ অবশ্যই। দেখ, রাঘব সারা সপ্তাহ আমাকে *চাক দে ইন্ডিয়া* দেখাবে বলে ঘুরিয়েছে। তুমি এখানে থাকলে আমি তোমার সাথেই দেখতে পারতাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরিঃ তুমি আমার সাথে মুভি দেখতে যাবে?

সে উত্তর দিল না। আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: ??

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: তুমি আছ?

সে উত্তর দিল না। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, অসঙ্গত কোন কিছু বললাম কিনা? আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরে আবার লিখলাম।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: হেই, তোমার মন খারাপ? ভুল কোন কিছু বলে ফেললে আমি দুঃখিত...তুমি দয়া করে...

উড়ন্ত আরতি: হেই, সরি...

উড়ন্ত আরতি: বয়ফ্রেন্ড ফোন করেছিল মাফ চাওয়ার জন্য। সে তার কাজ শেষ করেছে। আমরা মুভি দেখতে যাচ্ছি।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: ওহ, দারুণ।

উড়ন্ত আরতি: তুমি কি বলছিলে...দাঁড়াও। অবশ্যই তুমি ফিরে এলে আমরা মুভি দেখতে যেতে পারি। তুমি দুঃখিত কেন?

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: না, আমি মনে করলাম...

উড়ন্ত আরতি: আচ্ছা, আমাকে যেতে হতে হবে। রেডি হতে হবে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: ঠিক আছে।

উড়ন্ত আরতি: তার মনযোগ পেতে আমাকে দেখতে অত্যন্ত আকর্ষনীয় হতে হবে। নয়তো সে আমাদের ডেটিংয়ের সময় তার আর্টিকেলের প্রুফ-রিডিং করতে থাকবে।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: আচ্ছা, আমিও গিয়ে পড়াশোনা করি।

উড়ন্ত আরতি: আর মাত্র দুই মাস। এরপর আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করতে পারব।

গোপাল কোটা ফ্যাক্টরি: হ্যা, থ্যাঙ্কস।

উড়ন্ত আরতি: Xoxoxo.

এবং উড়ন্ত আরতি লগ-আউট করল।

আমি যত ধীরে সম্ভব হেটে বাসায় আসতে লাগলাম। মোটের ওপর, বই ছাড়া আমার আর কোন দিকে তাকানোর উপায় নেই। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাদের দুজনকে থিয়েটারে বসে হাতে হাত রাখা দৃশ্য কল্পনা না করার। আমি ভাবতে লাগলাম আরতির সাথে যোগাযোগ রাখা মোটেও ঠিক হবে কিনা। কিন্তু শেষবারের অতল গহ্বরে পড়ার দৃশ্য মনে পড়ে গেলে ভাবলাম, হৃদয়ে কয়েকটা ছুড়ির খোঁচা পুরোপুরি মন ভেঙে যাওয়ার চাইতে ভাল।

ক্যারিয়ার পাথের টিচাররা জেইই পরীক্ষার আগের রাতে আটটায় ঘুমিয়ে যেতে বলল। শেষ ক্লাসে সবাই অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য দিল। ব্যালেন্সজি মহাত্মা গান্ধি থেকে মোহাম্মদ আলি পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের উদাহরণ দিল, যারা কখনো আশা ছাড়ে নি, সব প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে জয়ী হয়েছে। আমি আলির মত করে আমার হাতে

কিল দিলাম আর গান্ধিজীর মত কোচিং 'কুইট' করলাম দুনিয়ার অন্যতম কঠিন ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য। বাসায় ফেরার পথে আমি দুজনকে কল করলাম আমার ধারণা যারা আমার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন দেখতে চাইবে।

"আমার দোয়া সবসময় তোর সাথে থাকবে, আমার গোপি। কাল তোর সুযোগ তোর পরিবারের নাম উজ্জল করার," বাবা বললেন।

"ধন্যবাদ বাবা," আমি কথা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বললাম।

এরপরে আমি আরতির নাম্বারে কল করলাম।

"হ্যালো?" একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। এটা তার বাবার কণ্ঠ না।

"আমি কি আরতির সাথে কথা বলতে পারি," বললাম তাকে।

"অবশ্যই, কে বলছেন?" কণ্ঠটা বলল।

"গোপাল।"

"হাই গোপাল, আমি রাঘব," কণ্ঠটা বলল।

আমি ফোনটা প্রায় ফেলে দিতেই গেছিলাম। "রাঘব?" আমি প্রায় এক বছর তার সাথে কথা বলি না।

"তুইতো কোন যোগাযোগই রাখিস না, গোপাল। যদিও এটা আমারও ভুল," রাঘব বলল।

আমি জানি না আমার আর আরতির সম্পর্কে রাঘব কতটা জানে, বিশেষ করে আমাদের বিচ্ছেদ এবং নতুন করে যোগাযোগ চালু হওয়ার ব্যাপারে। আমি কথার সুর এবং বিষয় দুটোই স্বাভাবিক রাখলাম। "বিএইচইউ-এর কি খবর?"

"এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ভাল। এটা অন্যান্য কলেজের মতই। শুধু ফ্যাকাল্টিটা ভাল। তোর কি খবর?"

"কাল জেইই, বুঝতেই পারছিস।"

"হ্যা, আমি জানি। আমাদের কলেজও সেন্টার। তুই এখানে এসে পরীক্ষা দিচ্ছিস না?"

"শেষ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস চলছে। তাছাড়া, আমার এআইইইই ফাইনাল রিফ্রেশার কাল শুরু হচ্ছে।"

"ভাগ্যিস আমি এসব শেষ করে এসেছি, দোস্ত," রাঘব হাসলো। নির্দয়ভাবে অবশ্যই না কিন্তু আমি মনে কষ্ট পেলাম। কেউ কারো দুর্বল জায়গায় আঘাত করলে সেটা সরাসরি না হলেও ব্যাথা লাগে।

"আমিও শেষ করে ফেলব, আশা করছি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে," আমি বললাম।

"তুই চান্স পেয়ে যাবি। আরতি বলল তুই যথেষ্ট ভাল করছিস।"

তার মানে তারা আমাকে নিয়ে কথা বলে, ভাবলাম। "কি জানি? প্রশ্নের উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগই ভাগ্যের উপর।"

"ঠিক," রাঘব বলল।

আমরা একটা বিশ্রী 'কিছু-বলার-নেই' মুহূর্তে উপস্থিত হলাম। এটা তার ভুল, সে ভুলে গিয়েছে আমি আরতির জন্য কল করেছি।

"তো, আরতি কি কাছাকাছি আছে?"

"ওহ, হ্যা, একটু লাইনে থাক।"

আমি তার হাসি শুনতে পেলাম। রাঘব আমাকে নিয়ে কোন কৌতুক করেছে কিনা কে জানে।

"হেই! বেস্ট অব লাক, জেইই বালক," আরতি বলল।

"ধন্যবাদ। এটা দরকার ছিল।"

"আমি বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্য প্রার্থনা করতে।"

"সত্যি?"

"হ্যা। আমি এই অলস রাঘবকে জোর করে গোসল করতে এবং সাথে যেতে রাজি করিয়েছি," বলে সে আবার হাসা শুরু করল। "আমরা এইমাত্র ফিরে এলাম...হেই, রাঘব থাম...থাম...লাইনে থাক, গোপাল।"

আমি তাদের ব্যক্তিগত হাসি-তামাশা শোনার জন্য ফোন করে টাকা দিচ্ছি। আমি শুনছি আরতি রাঘবকে বলছে তাকে অনুকরণ করা বন্ধ করার জন্য কিন্তু রাঘবের মনে হয় এরচেয়ে ভাল কিছু করার নেই।

"হ্যালো," ষাট সেকেন্ড পরে আমি বললাম।

"হেই, সরি," বলে আরতি নিজেকে সামলে নিল। "ঠিক আছে," এখন আমি তার দিক থেকে অন্য দিকে তাকাতে পেরেছি। গোপি, তুমি পরীক্ষার হলে সুপার-আত্মবিশ্বাস নিয়ে যাবে, ঠিক আছে?"

"হ্যা," আমি বাধ্য ছেলের মত বললাম। তার আমার প্রতি মায়ের মত সহজাত আচরণটা খুব পছন্দ করি।

"আমি চাই তুমি অনুভব কর যে তুমি জীবনে যেকোন জায়গায় যেতে পারবে। কারন আমি জানি তুমি পারবে," আরতি বলল।

আমি তোমাকে পাব না, বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। তবুও এই বড় পরীক্ষার জন্য আমাকে উৎসাহ দেয়ায় ভাল লাগল। "এআইইইই শেষ হলে তার পরবর্তি চার ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনে করে চলে আসব।"

"হ্যা, আমরাও অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি চলে এসো। রেজাল্ট বেরোলে আমরা একসাথে তোমার সাফল্য সেলিব্রেট করব।"

"যদি আমি চান্স পাই," বললাম তাকে।

"এভাবে ভাববে না। বিশ্বাস কর যে তুমি ইতোমধ্যেই চান্স পেয়ে গিয়েছ," আরতি বলল। "আমার জন্য।"

তার শেষ কথাটি আমার জন্য সারা দুনিয়ার সমান। *হ্যা, আমি চান্স পেতে*

চাই–তার জন্য।

শহর ভিন্ন, কিন্তু কোটার জেইই পরীক্ষাকেন্দ্র আমাকে গতবছরের অনুভূতি ফিরিয়ে দিল। বাবা-মায়েরা ট্যাক্সি এবং অটো ভর্তি করে আসছে। কিছু বড়লোক বাচ্চারা এয়ার কন্ডিশনড্ গাড়িতে এল। মায়েরা ছোট পূজা-অর্চনা করছে তাদের সন্তানের জন্য, মজার বিষয়, তারা তাদের বিজ্ঞানের পান্ডিত্য দেখাতে যাওয়ার আগমুহূর্তে। আমার পরিবার থেকে কেউই নেই আমাকে নিয়ে এসব করার জন্য। এটা আমার কাছে কোন বিষয় না। মাথায় তিলক এবং মুখে দই কোন কাজের কথা না। একবার ভেতরে গেলে সারা দেশের পাঁচ লাখ পরীক্ষার্থীর নিরানব্বই পার্সেন্টকে মোকাবিলা করতে হবে।

আমার শুরুটা ভালই হল। প্রথম কয়েকটা প্রশ্ন খুব সহজেই সমাধান করলাম। মাঝখান থেকে কঠিন শুরু হল। কিছু প্রশ্ন এসেছে ঐসব অধ্যায় থেকে যেগুলো পড়ানো হয়েছিল যখন আমি মাতাল এবং হতাশ জীবন কাটাচ্ছিলাম। একটা প্রশ্নে এসে আটকে গেলাম। ভাবলাম সমাধান করতে পারব, চেষ্টা করতে লাগলাম, এবং দশ মিনিট অপচয় করলাম। প্রশ্নটা আগেই ছেড়ে দেয়া দরকার ছিল। জেইই-তে দশ মিনিট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মনে মনে নিজেকে লাথি মেরে পরের প্রশ্নে গেলাম। যতগুলো সম্ভব প্রশ্ন শেষ করতে লাগলাম যতক্ষণ না ভয়ঙ্কর ঘণ্টাটা বাজল।

পরীক্ষক আমার খাতা ছিনিয়ে নিলেন যদিও আমি শেষ একটা উত্তর লিখতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম। ঐ একটা প্রশ্ন ছেড়ে দেয়া মানে র‍্যাঙ্ক পাঁচশ পিছিয়ে যাওয়া, কিন্তু...জেইই শেষ!

"কেমন হল?" বাবা সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি যতটা সম্ভব সৎ হবার চেষ্টা করলাম। "গত বারের থেকে ভাল।"

"ভাল। কিন্তু বসে থাকিস না। এআইইইই-র জন্য পুরোপুরি মনযোগ দে।"

"হ্যা দিব," বললাম আমি।

আরতির সাথে সংক্ষেপে চ্যাট করলাম। সে ভবিষ্যৎবাণীর মত সবকিছু সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত থাকতে বলল। তার কলেজে টার্ম ব্রেক চলছে। তার বাবা-মা ইউএসএ'তে তার চাচিকে দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

"যদি আমি কল বা চ্যাট করতে নাও পারি আমি তোমাকে শিকাগো থেকে মেইল করব," সে বলল। এআইইই পরীক্ষার জন্য শুভকামনা করে আমাকে অনেকগুলো মেইল পাঠাল।

আরতি আরও লিখল রাঘবও ছুটিতে আছে, এবং একটা লোকাল পত্রিকায় ইন্টার্নি করছে।

"তো রাঘবের বাবা-মা তাদের হবু ইঞ্জিনিয়ার ছেলের পত্রিকায় কাজ করা নিয়ে

মোটেই সন্তুষ্ট না। আমি বুঝি না এখানে সমস্যাটা কোথায়?" আরতি তার একটা মেইলে লিখল।

যখন মানুষ বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে এবং তাদের শখ নিয়ে কাজ করছে, আমি তখন এআইইইই নিয়ে আছি। আমি মসৃণভাবে পরীক্ষা দিলাম, গত বারের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। কিন্তু এটা দ্রুতগতির পরীক্ষা। কেউই বলতে পারে না সে অন্যদের তুলনায় ভাল করেছে কিনা। প্রশ্নের সত্তর পার্সেন্ট উত্তর করতে পারলেই সে ভাগ্যবান। আমার মনে হচ্ছে গত বারের তুলনায় ভালই হয়েছে। যা-ই ঘটুক না কেন, আমি আমার উত্তরপত্র জমা দিয়ে দৌড়ে বাসায় চলে এলাম। একটা ট্রেন আছে যেটা আমাকে ধরতে হবে।

প্রতীক আমাকে স্টেশনে বিদায় দিতে এল। আমার ভারি ব্যাগ ট্রেনে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করল সে।

"তুমি রায়পুরে যাচ্ছ কবে?" আমি বললাম।

"যখন তারা আমাকে নিতে আসবে," প্রতীক ঔদ্ধত্যের সাথে বলে আমাকে বিদায় জানাল।

অধ্যায় ১২

বারানশি

শুধুমাত্র বারানশির দৃশ্য আর গন্ধ স্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এল। আমি কাউকে আমার আসার ব্যাপারে জানাই নি, আমি চাই নি বাবা অটোরিক্সার পেছনে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করুক। সে আমাকে বলেছে এ পর্যন্ত যা ধার-দেনা করা হয়েছে তার পরিমান দেড় লাখ টাকা। পাওনাদাররা প্রতি মাসে তিন পার্সেন্ট করে সুদ গুণছে।

"তুই একটা ভাল কলেজে ভর্তি হলে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া আমাদের সস্তায় লোন দেবে," বাবা আমাকে বলেছে।

এমনকি গাধোলিয়ার ময়লা আর কোলাহলপূর্ণ রাস্তাও আমার কাছে চমৎকার লাগছে। নিজের জন্মস্থানের মত কোন জায়গাই হয় না। যে কোন কিছুর আগে আমার আরতির সাথে দেখা করতে হবে। বারানশির প্রতিটা ইঞ্চি আমাকে তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মানুষ আমার শহরে আসে মহান প্রভুর উপস্থিতি অনুভব করতে, আর আমি সবজায়গায় শুধু তারই উপস্থিতি অনুভব করছি। যাহোক, আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে প্রথমে।

আমি বাসার কলিং বেল চাপলাম।

"গোপাল!" বাবা চিৎকার করে তার দুর্বল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"বারানশির কথা অনেক মনে পড়ত, বাবা। বাড়ির কথা মনে পড়ত। তোমার কথা মনে পড়ত।"

বাড়ি আগের থেকে অনেক অগোছালো দেখাচ্ছে। আমার ধারনা বাবা বেশি পরিষ্কার করতে পারে না। আমি ঘর ঝাড় দেয়ার জন্য একটা ঝাড়ু নিলাম।

"বাদ দে, তুই একবছর পরে এসেছিস। কি করছিস এসব?" বলে বাবা আমার হাত থেকে ঝাড়ুটা কেড়ে নিলেন।

দুপুরে আমরা লকলকে ডাল আর শুকনো চাপতি খেলাম। বাড়ির খাবার অমৃত লাগল। বাবা অনেকদিন কথা বলার লোক পান নি, তাই মুখভর্তি খাবার নিয়েই কথা বলতে থাকলেন।

"মামলা কিছুই চলছে না। ঘনশ্যাম শুনানির দিনেও আসছে না। আমার ধারণা সে ভাবছে আমি তাড়াতাড়ি মারা যাব। এরপর এটার সমাধান করা তার জন্য সহজ হবে," বললেন তিনি।

"কি বলছ তুমি, বাবা?"

"তার অনুমানই ঠিক। আমার ফুসফুস আর কতদিন চলবে?" একথা বলার সাথেসাথেই কাশতে লাগলেন।

"তোমার কিছুই হবে না। আমি উকিলের সাথে কথা বলব।"

"কোন লাভ নেই। তাকে দেয়ার মত টাকা নেই। সে এখন আমার কলও ধরে না। এসব কথা বাদ দে। তোর রেজাল্ট কবে হবে?"

"এক মাসের মধ্যেই," আমি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললাম, ভাবছি আমি কি আগে আরতিকে কল করব নাকি হাত ধোবো।

ডাল মাখা আঙুল দিয়েই তার নাম্বারে ডায়াল করলাম আমি।

"হ্যালো?" সে বলল।

"সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণ চলবে, ম্যাডাম?" আমি বললাম।

"গোপাল! তুমি এসেছো? কখন এলে?"

"একঘণ্টা হল। আমরা কখন দেখা করছি?" আমি বললাম। "সন্ধ্যায় ঘাটে?"

"হ্যা, ঠিক আছে, আচ্ছা দাড়াও। না, আমাকে রাঘবের কলেজে যেতে হবে। তুমিও আমার সাথে আসো।"

"না, ধন্যবাদ।"

"না কেন? সে তো তোমারও বন্ধু।"

"আমি প্রথমে তোমার সাথে দেখা করতে চাই।"

"আমরা রাস্তায় দেখা করব। আমি বাবার গাড়ি পাঠিয়ে দিব। আসবে, ঠিক আছে?"

আমার কিছুই করার নেই। আমি তাকে দেখার জন্য আরও একদিন অপেক্ষা করতে নারাজ।

"রাঘব কিছু মনে করবে না?"

"সে অবাক হবে। এটা একটা বড় অনুষ্ঠান।"

"অনুষ্ঠান?"

"তোমার সাথে দেখা হলে তখন বলব। ওয়াও, প্রায় এক বছর, তাই না?"

"তিনশ পাঁচ দিন।"

"তুমি দেখছি মুখস্তবিদ হয়ে ফিরেছ। দেখা হবে।"

সরকারি প্রতিনিধিদের উপরে লাল লাইটওয়ালা সাদা গাড়িতে বসে থাকলে ক্ষমতার একটা ভাব চলে আসে। ট্রাফিক সুবিধা, পুলিশদের অকারনেই স্যালুট পেয়ে ভাবা স্বাভাবিক, এটা কি আমি, নাকি সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা?

গাড়িটা আমাকে ডিএম'র বাংলোতে নিয়ে গেল। যেটা কিনা ফিটফাট ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। মোট দুই একর জায়গায় একটা সর্পিল ড্রাইভওয়ে আছে।

"আরতি ম্যাডামকে বলুন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি," ড্রাইভারকে বললাম।

আমি তার বাবা-মায়ের সাথে কোটা বা সামনের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে

আলোচনা করতে চাচ্ছি না।

দূর থেকেই তার গোলাপি সালোয়ার কামিজ দেখা গেল। সে কাছে আসলে তার চেহারা দেখতে পেলাম–কোন মেকআপ নেই শুধুমাত্র লিপগস ছাড়া। গত তিনশ পাঁচ দিনে আমি এরচে সুন্দর আর কিছু দেখি নি। যখন সে গাড়ির দরজা খুলছে আমি আমার অতি উৎসাহ দমন করলাম।

"হাই আরতি," বললাম তাকে।

"এত ফর্মাল হওয়ার কি দরকার? এদিকে আসো," বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার চুমকি বসানো ওড়না আমার বুকে খোঁচা দিল, তার সুগন্ধ ঢুকে গেল আমার মাথায়। "রাঘবের কলেজ," তার ড্রাইভারকে বললে ওই লোক বুঝে নিল।

"তো, কি খবর তোমার? ফিরে এসে খুব খুশি লাগছে না?" সে বলল।

"এটা আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন। আমি আর কখনোই বারানশি ছেড়ে যাব না," ব্যাগ্রকণ্ঠে বললাম।

"এটা যদি আইআইটি'র জন্য হয়?" বলে সে চোখ টিপল।

আমি উত্তর দিতে পারলাম না।

"কি? তুমি আইআইটি'র জন্য প্রয়োজনে বারানশি ছেড়ে যাবে, ঠিক?"

আমি নিজেকে সামলে নিলাম। "তখন তো করার কিছুই থাকবে না। যাহোক, রাঘবের অনুষ্ঠানটা কি?"

"সে তার কলেজ ম্যাগাজিন পূনর্গঠিত করছে। আজ নতুন একটা ইস্যু নামবে।"

"সে কি আদৌ বিটেক করছে? আমি সবসময় তার ম্যাগাজিন সম্পর্কেই শুনে আসছি।"

আরতি হাসলো। ওহ্ ঈশ্বর, আমি এই হাসিটাই মিস করছিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছে এটা রেকর্ড করে বারবার শুনি।

"সে করছে," আবারও হাসলো। "যদিও আমিও তাকে ভুয়া ইঞ্জিনিয়ার বলি।"

"খবরের কাগজের ইন্টার্নশিপ কেমন চলছে?"

"খারাপ না। যদিও তারা তাকে বেশি কিছু লিখতে দিচ্ছে না। তাদের কাছে তার নিবন্ধগুলোকে..." বলে সে সঠিক শব্দ খুঁজতে লাগল, "খুব বেশি সংস্কারপন্থী আর অন্যরকম লাগছে।"

আমরা ছড়ানো-ছিটানো বিএইচইউ ক্যাম্পাসে পৌছালাম। পরিচ্ছন্ন লন আর সুন্দর সুন্দর বিল্ডিংগুলো দেখে মনে হয় বারানশির তুলনায় অন্য কোন দেশে চলে এসেছি।

"জি-১৪ হল," আরতি ড্রাইভারকে বলল।

আমরা পাঁচশ সিটের অডিটরিয়ামে ঢুকলাম, যার ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্টেজের ওপরে নতুন ম্যাগাজিন কভারের বিশাল ব্যানার ঝুলছে। রাঘব সবকিছু বদলে ফেলেছে; লেআউট, কভার এবং এমনকি টাইটেলও। কভারে লিখেছে *"বিএইচইউ*

ক্যাম্প, অথবা ভূমিকম্প।" বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত নামের চমৎকার প্রয়োগ আমার নজর কাড়ল। ম্যাগাজিনের ট্যাগলাইনে লিখেছে: "দুনিয়া কাঁপিয়ে দাও।"

আরতি আর আমি দ্বিতীয় সারিতে বসলাম। আলো কমিয়ে ছেড়ে দেয়া হল মিউজিক। পূর্বাভাসস্বরূপ মানুষের গুঞ্জন শুরু হল।

"রাঘবই এসব কাজের নেপথ্যে," আরতি আমাকে বলল। "অনেক কাজ তার এখনো বাকি। সে আমাদের সাথে পরে দেখা করবে।"

স্টেজে দশজন স্টুডেন্টের একটা দল এল। তাদের আপদমস্তক কাল আটসাট পোশাকে ঢাকা যার উপরে কঙ্কালের ছবি। অতিবেগুনী আলোতে কঙ্কালগুলো ফুটে উঠল।

ছেড়ে দেয়া হল মাইকেল জ্যাকসনের *ম্যান ইন দ্য মিরর*।

I'm gonna make a change
For once in my life

কঙ্কালগুলো শারিরীক কসরতপূর্ণ নাচ শুরু করলে দর্শকরা উচ্চরব করে উঠল। গান বাজতেই থাকল।

If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change.

"এটা কি কোন ম্যাগাজিনের প্রকাশনা নাকি নৃত্যানুষ্ঠান?" আমি চাপা হেসে বললাম।

"প্রথমে লোকদের আনন্দ দিতে হয়। তাদের মনযোগ আকর্ষন করে তারপর যা বলার তা বলতে হয়," আরতি বলল।

"কি?" আমি তার দিকে তাকালাম। তার চেহারা অতিবেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত।

"এটাকেই রাঘব বলে–আনন্দ দিয়ে বদলে দাও।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। ঘুরে ভীড়ের দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে ভাবলাম এদের মধ্যে কতজন কোটায় সময় কাটিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ি এদের মধ্যে একতৃতীয়াংশ আমি যে শহরটা থেকে এইমাত্র এসেছি সেখান থেকেই এসেছে।

আমি না ভেবে পারলাম না: *হলে এতগুলো সিটের মধ্যে একটা মাত্র সিট কি আমি পাব না?*

কঙ্কালেরা তাদের কাজ শেষ করেছে। দর্শকেরা তুমুল করতালি দিল। কাল স্যুট পরা একজন লম্বা লোক স্টেজে এল। "গুড মর্নিং বিএইচইউ," তার পরিচিত কণ্ঠে হল পূর্ণ হয়ে গেল।

"এটা রাঘব," তার পরিবর্তনে হতভম্ব হয়ে আমি বললাম। আমি তাকে কখনো স্যুট পরা দেখি নি। তাকে একদম রকস্টার মনে হচ্ছে। তার ফিট বডি দেখে বুঝা যায় সে কলেজের স্পোর্টস সুবিধার ভালই ব্যবহার করছে। তার তুলনায়, কোটায় একবছর থাকায় আমাকে যথেষ্ট মোটা আর বয়স্ক লাগছে।

রাঘব কথা শুরু করল।

"এটা কোন সাধারন কলেজ না। আপনারা কেউই সাধারন শিক্ষার্থী না। আমাদের ম্যাগাজিনও সাধারন থাকতে পারে না। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপণ করছি, *বিএইচইউ ক্যাম্প*!"

ম্যাগাজিন কভারের উপর স্পটলাইটের আলো পড়ল। দর্শকরা উল্লাস করে উঠল। জোরে করতালি দিয়ে উঠল আরতি, সে অপলক স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে।

"পৃথিবী বদলে গিয়েছে। আমাদের কলেজ, আমাদের শহর, আমাদের দেশও বদলানো দরকার," রাঘব বলতে লাগল। "কে বদলাবে এসব? আমরা। এটা শুরু হচ্ছে এখানে। আমরাই পৃথিবী কাঁপিয়ে দিব।"

দর্শকরা আবারো হর্ষধ্বনি করে উঠল, তার কথায় নয় বরং তার কণ্ঠের প্রত্যয়ে।

রাঘবের সম্পাদকীয় টিমের ছাত্ররা স্টেজের উপরে উচ্চস্বরে বলতে লাগল "বিএইচইউ ক্যাম্প, বিএইচইউ ক্যাম্প।" দর্শকরা তাদের সাথে কণ্ঠ মেলাল।

"আমরা সেসব তথ্য ছাপব যা ছাপার সাহস কারো নেই। যেসব বিষয় আমাদের উপর প্রভাব ফেলে। কোন বুলশিট না," রাঘব বলল।

সম্পাদকীয় টিম স্টেজের উপর থেকে নেমে এসে সবাইকে ম্যাগাজিনের কপি দিতে লাগল।

রাঘব তার কথা বলতে লাগল। "আমাদের প্রথম কভার স্টোরি হচ্ছে আমাদের হোস্টেলের রান্নাঘরগুলোর অবস্থা নিয়ে। আমাদের গোপন টিম গিয়ে ছবি তুলে নিয়ে এসেছে। দেখুন আপনার খাবার কিভাবে তৈরি হচ্ছে।"

আমি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে থাকলাম। অনেকগুলো ছবি রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরের মেঝেতে তেলাপোকা, খাবারের উপর মাছির ওড়াওড়ি এবং কর্মীরা তাদের পা দিয়ে ময়দা পিষছে। ঘৃণার একটা শিহরণ দর্শকদের মধ্য দিয়ে যেন প্রবাহিত হল।

"ইউউ," আরতি ছবিগুলো দেখে বলল। "আমি আর কখনোই এখানে খেতে যাচ্ছি না।"

"*বিএইচইউ ক্যাম্প* আমাদের কলেজকে পরিবর্তন করে দিবে। এই ছবিগুলো ডিরেক্টর স্যারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে," রাঘব বলল। "তবে এটা ভাবার কোন কারন নেই যে *বিএইচইউ ক্যাম্প* শুধুমাত্র সিরিয়াস বিষয় নিয়েই তৈরি। এখানে অনেক কৌতুক, গল্প আর কবিতাও আছে। এখানে এমনকি ডেটিং থেকে শুরু করে জীবনবৃত্তান্ত লিখার টিপসও আছে। আপনার পাঠ আনন্দদায়ক হোক। বিএইচইউ দীর্ঘজীবী হোক!"

সে স্টেজ থেকে চলে যাওয়ার পরেও এক মিনিট পর্যন্ত দর্শকদের করতালি চলতে থাকল।

রাঘব আরতির দিকে দুই পিস রুটির একটা প্লেট ঠেলে দিল। "বাটার টোস্ট। এটা পরিষ্কার, আমি নিশ্চিত," সে আরতিকে বলল।

অনুষ্ঠান শেষে আমরা রাঘবের কলেজ ক্যান্টিনে এসেছি। আরতি সতর্কতার সাথে স্যান্ডউইচ হাতে নিল।

"ক্যান্টিন ঠিক আছে। হোস্টেলের রান্নাঘরেই কেবলমাত্র সমস্যা," রাঘব বলল। "আর এখন এটা ঠিক হয়ে যাবে। গোপাল খাচ্ছিস না কেন?"

আমি একটা পরোটা অর্ডার করেছি। এটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছি। রাঘব আরতির স্যান্ডউইচ হাতে নিয়ে তাকে খাইয়ে দিল। আরতি হাসলো, পিত্তি জ্বলে উঠল আমার।

"কোটা কেমন লাগল তোর কাছে?" রাঘব আমাকে জিজ্ঞেস করল। "আমাদের এখানে বস্তা বস্তা ছেলেমেয়ে এসেছে কোটা থেকে।"

"আমি যদি ভাল কোথাও চান্স পাই তাহলে কোটা অতুলনীয়। আর না পেলে ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য জায়গা।"

"তুই চান্স পেয়ে যাবি। তোর তো গতবছরই প্রায় হয়ে গিয়েছিল।" রাঘব তার ডান হাত দিয়ে মশলা মাখানো ডোসা ছিঁড়ল। তার বা হাতে *বিএইচইউ ক্যাম্প*-এর একটা কপি।

"তুই বদলে গেছিস, রাঘব," আমি বললাম।

"কিভাবে?" সে আমার দিকে তাকাল।

"এই ম্যাগাজিন আর সব। এসব কেন?"

"কেন? এসব আমার ভাল লাগে, স্রেফ এজন্যই," সে বলল।

আরতি কোন কথা বলল না। সে স্রেফ আমাদের কথা বলা দেখে যেতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম তার মাথায় কি ভাবনা চলছে। *সে কি আমাদের তুলনা করছে? ঠিক আছে, আমি রাঘবের সমান না। শুধুমাত্র তাকে ভালবাসার পরিমাণটা ছাড়া। কোন মানুষই তাকে আমার মত এতটা ভালবাসতে পারবে না।*

"তুই এরকম একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতে আসিস নি। এখানকার মানুষ ভাল একটা চাকরি পাওয়ার জন্য গাধার খাটুনি খাটে," আমি বললাম।

"এটা তো একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললি। আমাদের চারপাশের বিষয়গুলোর কি হবে? খাবার রান্না করা হচ্ছে অপরিষ্কার পরিবেশে। ল্যাবগুলোতে মান্ধাতার আমলের মেশিন ব্যবহার করছে। আমাদের শহরের দিকে দেখ। বারানশি এত নোংরা কেন? আমাদের নদীগুলো পরিষ্কার করবে কে?" রাঘবের কালো চোখে উত্তেজনা।

"আমরা না," প্রতিবাদ করলাম আমি। "আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা করাই যথেষ্ট কঠিন।"

রাঘব তার চামচ তুলে নিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করল। "এটাই দৃষ্টিভঙ্গি," সে

বলল, "এটাই আমি বদলাতে চাচ্ছি।"

"ওহ্, রাখ তোর বদলানো," আমি বললাম। "কেউই কিছু বদলাতে পারে না। হোস্টেলের বাবুর্চি তোর মায়ের মত রান্না কখনো করবে না। আর বারানশি দুনিয়ার ডাস্টবিন হয়ে আছে হাজার বছর আগে থেকে। সবাই এখানে তাদের পাপ ফেলতে আসে। কেউ কি আমাদের কথা মোটেও চিন্তা করে আমরা যারা এখানকার বাসিন্দা, ফেলে দেয়া বিষয়গুলো নিয়ে যাদের ভাবতে হয়?"

"আচ্ছা, আমরা কি এতটা সিরিয়াস না হয়ে পারি না? আমার বিরক্ত লাগছে," আরতি বলল।

"আমি শুধু..." বললাম তাকে।

"সে এসব শুনবে না। সে মিস্টার একগুয়ে, বলে রাঘবের নাক মোচড়ে দিল সে। আমার মেরুদন্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

রাঘব তার হাত বাড়িয়ে দিলে আরতি তা ধরল। সে হাত ধরে দাঁড়েয়ে রাঘবের কোলে গিয়ে বসল।

মানুষজন আমাদের দিকে তাকাতেই রাঘব আত্মসচেতন হয়ে উঠল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রেমের এরকম বহিঃপ্রকাশ তেমন একটা দেখা যায় না। প্রেমেপড়া মানুষরা অনেক সময় বুঝতেই পারে না দুনিয়া তাদেরকে কিরকম বোকা ভাবছে।

"থামো, আরতি?" রাঘব তাকে তার কোল থেকে উঠিয়ে দিতে দিতে বলল। "কি করছ তুমি?"

আরতি ঠোঁট ফুলিয়ে তার চেয়ারে এসে বসল। "মিঃ সম্পাদক, আমাকে আপনার জীবনের বাইরে সম্পাদনা করবেন না, ঠিক আছে?" সে বলল।

আমার মনে হচ্ছে আমি বসে বসে আরেকজনের প্রেমলীলা দেখছি। আমি এভাবে আরতির সাথে দেখা করতে চাই নি। আমার এখান থেকে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে। "আমরা কি উঠব?" আমি আরতিকে বললাম।

"হ্যা, আমাকে দশটার আগে বাসায় যেতে হবে।"

আমরা ডিনার শেষ করলাম, বিল দিল রাঘব।

"বাবা কেমন আছে?" রাঘব জিজ্ঞেস করল।

"অসুস্থ," আমি বললাম। "আমি যাওয়ার আগে যেমন ছিলেন তার চেয়ে খারাপ। আমার ধারণা সে কিছু লুকাচ্ছে।"

"কি?" আরতি বলল।

"তার একটা অপারেশন দরকার, কিন্তু সেটা স্বীকার করবে না। সে খরচ কমাতে চেষ্টা করছে।"

"সেটা হাস্যকর," রাঘব বলল।

"হ্যা, কয়েক বছর আগে বিবাদী জমিটা বিক্রির একটা সুযোগ এসেছিল। পানির দামে বিক্রি করতে হলেও ওতে আমাদের প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারতাম।"

"এটা তোদের জমি। সস্তায় কেন বিক্রি করবি?" রাঘব বলল।

"তোর কথা শুনলে বাবা খুশি হত," বললাম আমি।

আমাদের আসতে দেখে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল। হেডলাইটের আলো পার্কিং লটকে উজ্জ্বল করে তুলল।

"গাড়িতে ওঠো গোপাল। আমি আসছি," আরতি বলল।

আমি গাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বাইরে না তাকানোর শত প্রতিজ্ঞা করলেও আমি এক পলক না তাকিয়ে পারলাম না। রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখলাম তারা দুজন একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। রাঘব মাথা নিচু করে তার মুখ আরতির মুখের কাছাকাছি আনল। আমার মনে হল আমি বমি করে দিব।

সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। "আমি কি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি?" সে উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাস করল।

আমি চুপ থাকলাম। তার চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। সে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার ইশারা করল।

"সন্ধ্যাটা সুন্দর, তাই না?" বলল সে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"ক্যাম্পাসটা সুন্দর না?" আমরা যখন গেট পার হচ্ছি তখন সে বলল।

আমরা নিঃশব্দ বসে থাকলাম। গাড়িতে মিউজিক বাজছে। কৈলাশ খেরের একটা গান যেখানে একটা পাখির ডানা ভেঙে গিয়েছে, সেটা আর কখনো উড়তে পারবে না। গানে বলা হচ্ছে স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, আবার শ্রোতাদের বলছে প্রভুর নামে হাসিমুখে থাকতে।

আমি আড়চোখে তার চেহারার দিকে তাকালাম। তার লিপগস মুছে গিয়েছে। আমার শত প্রচেষ্টার পরেও আমি তাদের আরও ঘনিষ্ট সময়ের কথা না ভেবে পারলাম না।

"তুমি ঠিক আছো তো?" আরতি বলল।

"হাহ? ও হ্যা, কেন?" বললাম তাকে।

"এত চুপচাপ কেন?"

"বাবার কথা ভাবছি।"

সে এমনভাবে মাথা নাড়াল যেন সে সবকিছু বুঝতে পারছে। কিন্তু সে কখনোই বুঝতে পারবে না ঐসব পরাজিতদেরকে, যাদের ব্রেইন না থাকতে পারে, কিন্তু একটা হৃদয় আছে।

অধ্যায় ১৩

কয়েক সপ্তাহ পরে আমার রেজাল্টের দিন কাছাকাছি চলে এল। আমার থেকে বাবাকেই বেশি উদ্বিগ্ন মনে হল। একরাতে যখন আমি তার ঔষধ দিতে গেলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "রেজাল্ট কবে দিবে?"

"আগামি সপ্তাহে।"

"আইআইটি?"

"তার এক সপ্তাহ পরে," আমি বললাম।

"আইআইটিতে চান্স পেলে অনেক দারুন হবে, তাই না?" বাবা বললেন। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল।

আমি তার গায়ে কম্বল দিতে দিতে বললাম, "বাবা, ডাক্তার কিছু বলেছে তোমার অপারেশন লাগবে কিনা?"

"ডাক্তাররা তো এখন শুধু ব্যবসার চিন্তা করে, আর কি?" বললেন তিনি।

"আমাদের কি ঘনশ্যাম টায়াজিকে বলা উচিৎ, সে জমির জন্য যা দিতে চায় তা-ই যেন আমাদের দেয়?" আমি বললাম।

"লাভ নেই। সে শুনবে না। যাহোক, এ বয়সে অপারেশন করে কি লাভ?"

"তুমি কোন কথাই শোন না, বাবা।" আমি মাথা নেড়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

"এতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না গোপাল। এটাই শেষ না," সে আমার হাত ধরে বলল, "কিছু বল।"

এআইইইই রেজাল্টের দিন আরতি আমাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ করেছে। তার ইন্টারনেট সংযোগ আছে আর আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও আমার রেজাল্ট আমাকে একা দেখতে দিতে চায় নি।

মুহূর্তটা যেন স্থির হয়ে গেল। কম্পিউটার টেবিলের ওপরে লাল আর কাল এমব্রয়ডারি করা টেবিলক্লথ, উপরের ফ্যানের শব্দ, তার বাবার নানা সরকারি ট্রফি, ল্যাপটপের কাল রং, আর যে স্ক্রিন আমার রেজাল্ট দেখাচ্ছিল সবকিছু।

"৪৪,৩৪২," আমার রোল নম্বরের পাশে অপরিবর্তনীয়ভাবে লিখা।

পুরো একবছর আমার অপছন্দের বিষয়গুলো মুখস্থ করে, একা একটা নোংরা শহরে থেকে, আর বাবাকে অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে ফেলে আমি শুধুমাত্র নতুন করে নিশ্চিত হলাম–আমি পরাজিত।

আমি কোন প্রতিক্রিয়া দেখালাম না। কাঁদলাম না। রাগ, ভয়, হতাশা, কিছুই

অনুভব করলাম না। আমি দেখছি আরতি আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে, আমার সাথে কথা বলছে। কিন্তু আমি আসলে তার কথা উপলব্ধি করতে পারলাম না।

আমি ভুতের মত উঠে দাঁড়ালাম।

"তুমি ঠিক আছ তো?" আরতি আমাকে ধরে ঝাকুনি দিল। তাকে, আমাকে, ল্যাপটপটাকে, পৃথিবীকে, সবকিছুকে মনে হচ্ছে ধীর গতিতে চলছে। "জেইই'র কি অবস্থা?" সে বলছে।

"আরো খারাপ হবে। আমার পরীক্ষা তত ভাল হয় নি।"

সে চুপ হয়ে গেল। অবশ্য তার বলার আর কি থাকতে পারে?

"আমাকে যেতে হবে," আমি বললাম।

"কোথায় যাবে তুমি?" সে আমাকে সবচেয়ে দরকারি প্রশ্নটা করল। তাই তো, আমি কোথায় যাব? বাসায়? আর বাবাকে বলব যে সে তার সমস্ত ধার করা টাকা জলে ফেলেছে?

"আমি তোমার সাথে তোমার বাসায় যাব। তোমার বাবার সাথে কথা বলব।"

আমি মাথা দোলালাম।

"কোন সমস্যা হবে না তো?" সে বলল।

আমি কিছু বললাম না। কিছু বলতে পারলাম না। তার বাসা থেকে ছুটে বেড়িয়ে গেলাম।

"কোথায় গিয়েছিলি?" বাবা দরজা খুলতে খুলতে বললেন।

আমি সোজা আমার রুমে চলে গেলাম। বাবা আমার সাথে সাথে এলেন।

"তুই কি তোর এআইইইই রেজাল্ট দেখবি না?" বললেন তিনি।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"তুই বলেছিলি এটা আজকে বের হবে।"

আমি উত্তর দিলাম না।

"কথা বলছিস না কেন?"

আমি বাবার উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকালাম।

"খবর ভাল না," আমি বললাম।

বাবা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, "কি?"

"খুব খারাপ কিছু ঘটেছে।"

"কি?"

আমি ঘাড় দোলালাম।

"এআইইইই রেজাল্ট কখন বের হবে?"

"বের হয়ে গিয়েছে," বলে আমি লিভিং রুমের দিকে গেলাম।

"আর?" বাবা আমার সাথে সাথে গিয়ে ঠিক আমার সামনে দাঁড়ালেন।

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাবা কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন।

ঠাস! আমার ডান গালে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করলাম। বাবার বয়স আর শক্তির তুলনায় সে যথেষ্ট জোরে চড় দিতে পারে। কমপক্ষে দশ বছর পরে আমাকে চড় দিলেন। আমি এ চড় খাওয়ার উপযুক্ত।

"কিভাবে?" বাবা বললেন। "তুই কোটায় কিছুই করিস নি, ঠিক? কিছুই করিস নি।"

আমার চোখ জলে ভিজে গেল আর কানে গুঞ্জন শুনতে লাগলাম। আমার তাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি রাতের পরে রাত সজাগ থেকে অ্যাসাইনমেন্ট করেছি, সারা দিন ক্লাসে বসে থেকেছি, আমার রেজাল্ট অনেকটুকু এগিয়ে এনেছি। আমার চান্স পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অল্প কিছু মার্কের জন্য র‍্যাঙ্ক দশ হাজার পিছিয়ে যায়।

আমি কিছুই বললাম না। বাচ্চাদের মত কাঁদলাম, যেন আমার অনুতাপ বাবার মন হালকা করে দিবে।

"আমরা এই টাকা ফেরত পাব কিভাবে?" বাবা আমার চিন্তার থেকেও দ্রুত বাস্তবিক বিষয়ে ফিরে এলেন।

আমার র‍্যাঙ্ক অনেক এগিয়েছে, আমার তাকে বলতে মন চাইছে। ক্যারিয়ার পাথের টিচাররা বলেছে আমার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। মেনে নিচ্ছি, আমি কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আর সম্ভবত সেটাই আমার চান্স না পাওয়ার কারণ। ক্যারিয়ার পাথের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই চান্স পায় নি। এমনকি ভিনেট, যে কিনা আমার আগে বারানশি থেকে কোটা গিয়েছে, সে-ও পায় নি। কিন্তু বাবাকে আমি যা দেখালাম তা হল শুধুমাত্র আমার গোমড়া মুখ।

"কি ভাবছিস তুই? তোর কি লজ্জা বলতে কিছু আছে?" বলেই বাবা কাশতে শুরু করলেন। তার শরীর দুলে উঠল, শরীরের ব্যালেন্স রাখা কঠিন হয়ে পড়ল।

"বসো বাবা," বলে আমি তাকে ধরার জন্য তার কাছে গেলাম। তার শরীর গরম।

"আমার কাছে আসবি না," আমাকে ঠেলে দিলেন তিনি।

"তোমার তো জ্বর," আমি বললাম।

"তুই জানিস না কেন এটা হয়েছে?" তিনি বললেন।

আমি জানি না কি বলব বা কি করব। আমার নিজেকে তার ঘর থেকে তার ঔষধ এনে দেয়ার যোগ্য বলেও মনে হল না। আমি তাকেই তা করতে দিলাম। যখন আপনি কারো সমস্যার কারন, আপনি কমপক্ষে যেটা করতে পারেন তা হল সেই মানুষটাকে একা থাকতে দেয়া।

"আমি এসব শেষ করতে বাকি রাখি নি। তোমার অবস্থা শোচনীয় বোঝাই যাচ্ছে," ভিনেট আমাকে বলল।

আমরা আশী ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসে আছি। আমি ভিনেটের সাথে একটা গোপন বৈঠকের আয়োজন করেছি। আমি তাকে ভাল করে চিনিও না। কোটায় যাওয়ার আগে তার সাথে কিছু ইমেইল বিনিময় হয়েছে মাত্র। কিন্তু এখন তাকে আমার আদর্শসঙ্গী মনে হচ্ছে। হ্যা, আরতি আমার খোঁজ-খবর নিয়েছে, আমি কেমন আছি জানতে চেয়েছে, এমনকি আমার সাথে নৌকায় চড়ার প্রস্তাবও করেছে। কিন্তু তাকে বলার মত কিছুই আমার নেই। আমি গঙ্গায় লাফ দিয়ে জীবন শেষ করে দেয়ার চিন্তাও করেছি। রাঘবকে এখন আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এড়িয়ে চলছি। আমি আইআইটি বিএইচইউ'র কারো কাছ থেকে পুনরায় সান্ত্বনা পেতে চাই না, বিশেষ করে এমন কারো কাছ থেকে তো নয়ই যে কিনা তার ডিগ্রির ব্যাপারে উদাসীন।

বিনিত, যে কিনা আমার মতই সাধারণ, তাকেই আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে হল। সে একটা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। "যাতে আমি বলতে পারি আমি বিটেক করছি," বিনিত হাসতে হাসতে বলল কলেজের নাম না বলে। "যাহোক, বেশিরভাগ মানুষই এটা জানে না।"

আমি ঘাট থেকে কিছু পাথর নিয়ে তাদেরকে পবিত্র নদীতে পাঠিয়ে দিলাম।

"তোমার অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে বন্ধু," বিনিত বলল। "সম্পূর্ণ ঠিক হয়তো হবে না, তবে এখনকার অবস্থা থেকে ভাল নিশ্চয়ই হবে।"

"তুমি প্রাইভেট কলেজ বাছাই করলে কিভাবে?" আমি বললাম। "এগুলোর তো কোন অভাব নেই। আর প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন চালু হচ্ছে।"

"আমি একটা ক্যারিয়ার ফেয়ারে গিয়েছিলাম। গিয়ে খুঁজছিলাম। আরএসটিসি সবচেয়ে ভাল বলে মনে হল। তবে আমার মনে হয় না এদের মধ্যে তেমন পার্থক্য আছে।"

"আরএসটিসি কি?" আমি বললাম।

"রিদ্ধি সিদ্ধি টেকনিক্যাল কলেজ। এটার মালিকের একই নামের শাড়ির ব্যবসা আছে।"

"ওহ্," আমি পড়াশোনার সাথে শাড়ির সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে ভাবতে বললাম।

"একেবারে আদিকালের নাম তাই না? একারনে আমরা আরএসটিসি বলি, ভাল শোনায়," বিনিত হাসতে হাসতে বলল।

"এটা শেষে কি চাকরি পাবে?"

"ভাগ্য ভাল থাকলে পাব। ষাট পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট। খারাপ না।"

"চল্লিশ পার্সেন্স স্টুডেন্ট চাকরি পায় না?" আমি মর্মাহত কণ্ঠে বললাম। এটা তো কোটার চেয়েও খারাপ, ডিগ্রি শেষ করেও শেষে কিছুই পাওয়া যাবে না!

"অবশ্য প্রতিবছরই এ হার বাড়ছে। তাছাড়া তুমি নিজেও কিছু চাকরি ঠিক করে নিতে পার। কল সেন্টার আছে, ক্রেডিটকার্ড বিক্রি করতে পার। মুক্তমনা হলে কাজের অভাব হবে না।"

"ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কল সেন্টারে চাকরি করব?"

"বন্ধু, মন খারাপ করার কিছুই নেই। আমরা, আরো লাখ লাখ স্টুডেন্টের মত, ইন্ডিয়ার মহান শিক্ষা ব্যবস্থার দৌড়ে হেরে গিয়েছি। যা পাও তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। অবশ্য তোমার যদি বড়লোক বাবা থাকে, বিটেকের পরে এমবিএ করবে। চাকরির আরেকটা উপায়।"

"আর যদি না থাকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বিনিত কিছুই বলল না। ধৈর্যচ্যুত হয়ে আমি হাতের সবগুলো পাথর গঙ্গায় ফেলে দিলাম। কম নাম্বার পাওয়া ছাত্রদের মত সেগুলোও কোন চিহ্ন না রেখেই ডুবে গেল।

"হেই, আমার উপর রাগ করে কোন লাভ নেই। আমি এসব সিস্টেম বানাই নি," বিনিত আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল। "যত অলস বসে থাকবে তত খারাপ লাগবে তোমার কাছে। আমাদের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা কলেজে ভর্তি হও, কমপক্ষে অন্যান্য স্টুডেন্টদের সাথে থাকতে পারবে।"

"অন্যান্য লুজারদের সাথে," আমি বললাম।

"তোমার নিজের মত স্টুডেন্টদের অবজ্ঞা করা কি ঠিক হচ্ছে?" বিনিত বলল।

তার কথায় যুক্তি আছে। "আমি দুঃখিত," বললাম তাকে। "তোমার বিটেক করতে খরচ কত হবে?"

"হোস্টেলের খরচসহ প্রতি বছরে একলাখ করে চার বছর।"

"ধুর," আমি বললাম। "এই টাকা কোন চাকরি করলে কয়েক বছর লাগবে উঠাতে। তা-ও যদি পড়াশোনা শেষে কোন চাকরি আদৌ পাওয়া যায়।"

"আমি জানি। কিন্তু টাকা তোমার বাবা-মা দিবে। আর তারা তাদের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে বলে গর্ব করার সুযোগ পাবে। তুমি আগামি চার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। ভেবে দেখ, ততটা খারাপ না।"

"আমাদের টাকা নেই," আমি সরাসরি বললাম।

বিনিত উঠে দাঁড়াল। "সেটাই বন্ধু, প্রধান বিষয়।"

"চলে যাচ্ছ?" আমি বললাম।

"হ্যা, ক্যাম্পাস বারানশি থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে। ভাল থাক। তুমি জীবনের সবচেয়ে বাজে অবস্থায় আছ। এ অবস্থা থেকে খারাপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন থেকে ভালই হবে।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার ট্রাউজার থেকে ধুলা ঝাড়তে লাগলাম। বাসায় যেতে ভয় লাগছে। বাবা তিন দিন ধরে আমার সাথে কথা বলছে না।

আমরা সংকীর্ণ বিশ্বনাথ গলি দিয়ে হেঁটে গাধোলিয়া মেইন রোডে উঠলাম।

"দু-সপ্তাহের মধ্যেই ড. স্যামপুরানন্দ স্পোর্টস স্টেডিয়ামে একটা ক্যারিয়ার ফেয়ার হবে," বিনিত বলল। "যেয়ো, হয়তো কম খরচের কোন কলেজ পেয়েও যেতে পার।"

"আমাদের হাতে কোন টাকাই নেই। বরং চরমভাবে ঋণ জর্জরিত অবস্থায় আছি," আমি বললাম।

"আচ্ছা, কিন্তু যেতে তো আর কোন সমস্যা নেই। তুমি কোন ডিসকাউন্টও পেতে পার, বিশেষ করে নতুনগুলোর কাছ থেকে, যদি তোমার এআইইইই র‍্যাঙ্ক মোটামুটি ভাল থাকে।"

আমি হেঁটে বাসায় চলে এলাম। একঘণ্টা তাজা বাতাসে হেঁটে আমার কাছে কিছুটা অস্থায়ীভাবে ভাল লাগল। বাবাকে ঐ দামি প্রাইভেট কলেজের কথা বলা ঠিক হবে না, ভাবলাম আমি। আসলে আমার হয়তো আরও টাকা খরচ করার কথা না বলে কিভাবে টাকা উপার্জন করা যায় সে বিষয়ে কথা বলা দরকার। প্রথমত, তার গোমড়া চিন্তাভাবনা শেষ করাতে হবে।

আমি তার রুমে গেলাম। বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি।

"আমি একটা চাকরি করতে চাই, বাবা। কোন কলেজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কিছু টাকা উপার্জন করা দরকার।"

সে কোন কথাই বললেন না। আমি বলতেই থাকলাম। "আমি বুঝতে পারছি তোমার মন খারাপ। এটাই স্বাভাবিক। সিগড়াতে *কফি ডে* নামের একটা ক্যাফে খুলছে। এটা একটা হাই ক্লাস কফির চেইন শপ। তারা স্টাফ চেয়েছে। স্কুল পাশ যে কেউ আবেদন করতে পারবে।"

উত্তরে আমি শুধু ফ্যানের আস্তে আস্তে ঘোরার শব্দই শুনলাম।

"আমি আবেদন করেছি। সারা জীবন তো আর কফিশপে চাকরি করব না। কিন্তু তারা মাসে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিবে। খারাপ না, তাই না?"

বাবা চুপ করে থাকলেন।

"তুমি চুপ করে থাকলে আমি মনে করব তুমি রাজি।"

আমার এরকম কথায়ও বাবা বিষন্ন হয়ে চুপ করে রইলেন। আমি চাই তিনি বকা দিন, রাগ করুন, ধমক দিন, যা ইচ্ছা করে এই চুপ থাকাটা বাদ দিন।

আমি তার দিকে ঝুঁকলাম। "বাবা, দয়া করে আমাকে এভাবে শাস্তি দিও না," আমি বললাম। তাকে ঝাঁকুনি দেয়ার জন্য আমি তার হাত ধরলাম। এটা নিস্তেজ আর ঠান্ডা ঠেকল। "বাবা?" আমি আবার বললাম। তার শরীর কেমন শক্ত লাগছে।

"বাবা?" আবারো বললাম আমি। শেষমেষ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠল: আমি এতিম।

অধ্যায় ১৪

দাহ-কর্মের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া বারানশিতে থাকার অন্যতম একটি সুবিধা। মড়া পোড়ানো শিল্পই শহরটাকে চালায়। হরিশচন্দ্র ঘাটের ইলেকট্রিক চিতা, আর মনিকারনিকা ঘাটের আদি-চিতা, যেটাকে এখনো শ্রদ্ধার্ঘ মনে করা হয় দুটো মিলিয়ে একবছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ, অর্থাৎ দিনে হাজারের বেশি শব-দাহ করা হয়। শুধুমাত্র শিশু আর সাপে কাঁটা লাশকে পোড়ানো হয় না, সোজা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সংস্কৃতিতে বলা হয়, 'কাশিয়াম মরনাম মুক্তি' যার অর্থ, কাশিতে মৃত্যু মুক্তি নিয়ে আসে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, এখানে মারা গেলে তারা সোজা স্বর্গে চলে যাবে, দুনিয়াতে যতই পাপ করুক না কেন। এটা বিস্ময়কর লাগে, কিভাবে প্রভু মৃত্যুর এরকম অদ্ভুত এক নিয়ম করে দিয়েছেন, যার ফলে আমার শহরটা খেয়ে-পরে বেঁচে আছে।

অভিজ্ঞ ওয়ান-স্টপ শপে কাঠ, পুরোহিত থেকে শুরু করে ভস্মাধার পর্যন্ত সবকিছু পাওয়া যায়, যাতে মৃতব্যক্তির দাহ-কর্ম মর্যাদাপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়। মনিকারনিকা ঘাটের দালালরা বিদেশীদের প্রলোভোন দেখিয়ে নিয়ে আসে আর ছবি তুলে দেয়, যেটা টাকা উপার্জনের আরো একটি পথ। বারানশি সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র শহর যেখানে মৃত্যু একটি দর্শনীয় বিষয়।

কিন্তু মৃত্যুবিষয়ক এত জ্ঞান আর দক্ষতা আমার শহরের থাকলেও আমি নিজে কখনো কোন লাশ নিয়ে দৌড়-ঝাপ করি নি, বাবার লাশের কথাতো অকল্পনীয়। আমি জানি না বাবার এ নিশ্চল দেহ নিয়ে আমি কি করব। আমি কাঁদি নি, বরং কাঁদতে পারি নি। আমি জানি না কেন। হয়তো খুবই বিমূঢ় আর মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছি। হয়তো আমার দ্বিতীয়বারের ভর্তি পরীক্ষা বিভীষিকার পরে খুব কম অনুভূতি আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। হয়তো শেষকৃত্যের জন্য অনেক কাজ বাকি। অথবা হয়তো আমি ভাবছি আমিই তাকে হত্যা করেছি।

আমাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করতে হবে, তারপরে কয়েকটি পূজা। আমি জানি না কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। বাবার খুব কমই বন্ধু ছিল। আমি তার কিছু পুরনো ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করলাম যাদের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে। আমাদের পারিবারিক উকিল দুবে-কাকাকে নিমন্ত্রণ করলাম, অন্য যেকোন কারনের থেকে বাস্তবিক কারনটাই তাকে নিমন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য। সে বলে দিল ঘনশ্যাম টায়াজিকে। আমার চাচা সারাটা জীবন বাবার রক্ত চুষে খেয়েছে। কিন্তু তার পরিবার এখন অফুরন্ত সহমর্মিতা দেখাচ্ছে। তার স্ত্রী, নিতা টায়াজি আমার দরজায় আসল। সে আমার দিকে তাকাল, তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"ঠিক আছে, টায়াজি," আমি তার আন্তরিক আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বললাম। "আপনি না এলেও পারতেন।"

"কি বলছ তুমি? স্বামীর ছোট ভাই তো সন্তানের মত," সে বলল।

সে অবশ্যই ভুলে গিয়েছে সে তার 'সন্তানের' জমি চুরি করেছে।

"পূজা কখন?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি ঠিক জানি না, আগে দাহ-কর্ম শেষ করতে হবে।"

"কে করছে সেটা?" সে বলল।

আমি কাঁধ তুললাম।

"মনিকারনিকায় দাহ করার টাকা কি তোমার কাছে আছে?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম। "হরিশচন্দ্র ঘাটের ইলেক্ট্রিক চিতা বেশি সস্তা," বললাম তাকে।

"কিসের ইলেক্ট্রিক? এটা বেশিরভাগ সময়ই নষ্ট থাকে। যত্ন করে আমাদের কাজগুলো করা উচিৎ। নয়তো আমরা আছি কি জন্যে?"

কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘনশ্যাম টায়াজি তার গোষ্ঠীর অন্যান্যদের নিয়ে হাজির হল। তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে, সবাই দামি পোশাক পরে আছে। আমাকে তাদের আত্মীয় বলেই মনে হল না। চাচা আসার পরে তারা দাহ-কর্মের কাজ শুরু করল। তারা আরো আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রণ করল। একজন পুরোহিত ঠিক করল, যে সবকিছু করে দিবে দশ হাজার রুপি প্যাকেজে। চাচা দরদাম করে তাকে সাত হাজারে নিয়ে আসল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য দরদাম করা–বিষয়টা ভাবতেই আমার ভয় লাগছে, কিন্তু কাউকে তো এটা করতে হবে। চাচা পুরোহিতকে নতুন কচকচে পাঁচশ রুপির নোটগুলো দিলেন।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি মনিকারনিকা ঘাটে কাঠ দিয়ে ঢাকা বাবার দেহতে আগুন জ্বেলে দিলাম। যদিও তিনি মৃত, আমার মনে হচ্ছে আগুনে বাবার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে পরে গেল ছোটবেলায় কিভাবে বাবা আমাকে জামা-কাপড় পরিয়ে দিত, চুল আচড়ে দিত...চিতা থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগলে অবশেষে আমার চোখ ভিজে উঠল। আমি কাঁদতে লাগলাম। আরতি আর রাঘব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছে। তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিরবে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে বেশিরভাগ আত্মীয়-স্বজনই চলে গেল। আমি দেখতে লাগলাম কিভাবে আগুন কাঠগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

আমার কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। পেছনে ঘুরে তাকালাম। দুজন পেশিবহুল লোক ঠোঁটে পানের দাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজনের পুরু গোঁফে তা দেয়া।

"জি?" আমি বললাম।

গোঁফওয়ালা লোকটা চিতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "তুমি কি তার ছেলে?"

"জি।"

"এদিকে আসো," সে বলল।

"কেন?" আমি বললাম।

"সে আমাদের কাছ থেকে দু লাখ রুপি ধার করেছে।"

"ঘনশ্যাম টায়াজি তিন লাখ দিতে চাচ্ছে?" আমি মর্মাহত হয়ে দুবে-কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে আমার জন্য তৈরি করা দলিল উল্টাতে লাগল। "তুমি এখানে সাইন কর, তিন লাখ পাবে। পাওনাদারেরা তোমার পেছনে আছে। তারা বিপজ্জনক। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

আমি দলিলগুলো দেখলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। "তিন লাখ তো অনেক কম। কিছুদিন আগেই তো দশ লাখ দিতে চেয়েছিল," আমি বললাম।

"তা ঠিক, কিন্তু তা আগের কথা। তখন তোমার বাবা সেটা নেয় নি। এখন তারা জানে তুমি কিছুই করতে পারবে না। আর তোমার টাকাটা দরকার।"

আমি চুপ করে থাকলাম। দুবে-কাকা উঠে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম আসলে তিনি কাদের পক্ষ নিচ্ছেন।

"আমি বুঝতে পারছি সময়টা আসলে তোমার জন্য খুবই কঠিন। তুমি বরং ভাব," সে বলল।

আমি ড. স্যামপুরানন্দ স্পোর্টস স্টেডিয়ামে বিশাল প্যান্ডেলের নিচে অনুষ্ঠিত ক্যারিয়ার ফেয়ারে গেলাম।

বিনিত এখানে আসার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে। "আমার বন্ধু সুনীলের সাথে দেখা করবে। সে ওই ফেয়ারের ইভেন্ট ম্যানেজার। আর সে অংশগ্রহন করা সবগুলো কলেজ সম্পর্কে জানে।"

আমি প্রধান প্যান্ডেলের মধ্যে ঢুকলাম। শত শত স্টল দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন বাণিজ্য মেলা। সারা দেশের প্রাইভেট কলেজগুলো বারানশির স্টুডেন্টদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কলেজগুলোর ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। স্টলের ভেতরে রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের মত ক্যাম্পাসের ছবির ব্যানার ঝুলিয়ে রেখেছে। যেসব বিল্ডিংগুলো নির্মানাধীন, ছবিগুলো গ্রাফিক্স ডিজাইনারের ইচ্ছেমত আঁকা।

"একবার কাজ শেষ হলেই এটা হবে উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে ভাল ক্যাম্পাস," আমি একজন স্টলের লোককে কিছু উদ্বিগ্ন পিতাদের বলতে শুনলাম। সে এটা বলল না, নির্মান শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টুডেন্টরা চারপাশে কংক্রিট মিশ্রণের মধ্যে ক্লাসরুমে কিভাবে ক্লাস করবে।

বিশাল বিশাল পোস্টারে কলেজের প্রতীকসহ নাম ঝুলছে। বিভিন্ন নাম, কিন্তু বেশিরভাগই ঈশ্বর বা খুব ধনী পদের দাদাদের নাম অনুসারে রাখা হয়েছে।

প্রতিটা কলেজের কিছু ফ্যাকাল্টি আর স্টুডেন্টরা চটকদার ব্রোশিয়ার দিয়ে তাদের

স্টলে আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সবাই স্যুট পরে আছে আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্লাইট ক্রুদের মত মুখে হাসি ধরে রেখেছে। আমার মত শত শত বাজে ছাত্র এক স্টল থেকে আরেক স্টলে ছোটাছুটি করছে। স্টলগুলোর সত্তর পার্সেন্টই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বাকি ত্রিশ পার্সেন্ট দখল করেছে মেডিকেল, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এভিয়েশন একাডেমি আর কিছু অন্যান্য কোর্স যেমন বিবিএ ইত্যাদি।

আমি শ্রী গনেশ ভিনায়াক কলেজ অথবা এসজিভিসি, যেখানে সুনীলের সাথে আমার দেখা করার কথা, সেখানে পৌছলাম।

আমি এসজিভিসির ব্রোশিয়ার তুলে নিলাম, এটার কভারে স্টুডেন্টদের হাসিমুখের ছবি। কোটার ব্রোশিয়ারগুলোতে জেইই-তে চান্স পাওয়া ছেলেদের চাইতে এখানের ছেলেরা বেশি খুশি, আর মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর। ব্যাককভারে তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, আর ফ্যাকাল্টিগুলোর যোগ্যতার যে প্রশংসা করা হয়েছে, তাতে একজন আইআইটি ডিরেক্টরের লজ্জা পাওয়ার কথা। ব্রোশিয়ারের ভেতরে আমি তাদের প্রোগামগুলো দেখতে পেলাম। কম্পিউটার সায়েন্স থেকে শুরু করে ধাতুবিদ্যা পর্যন্ত, এসজিভিসি সকল প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স অফার করে।

আমি পুরো ব্রোশিয়ারটা পড়লাম। প্রতিষ্ঠাতাদের ভিশন আর মিশনও বাদ দিলাম না। আমি পড়ালেখা বিষয়ে কলেজের দর্শন পড়লাম, তারা কিভাবে অন্যদের চেয়ে *ব্যতিক্রম* তা পড়লাম। অন্যান্য ক্যারিয়ার ফেয়ার সৈনিকরা আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁত বের করে হাসছে। দেখা যাচ্ছে আমিই একমাত্র লোক যে কিনা ব্রোশিয়ার এত মনযোগ দিয়ে পড়ছে।

সুনীল আমাকে শ্রী গনেশ ভিনায়াক কলেজের স্টলে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে পেল।

"গোপাল?" সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলল।

"হাহ্?" আমি ঘুরে তাকালাম। "সুনীল?"

সুনীল আমার সাথে দৃঢ় হ্যান্ডশেক করল। খোঁচাখোঁচা দাড়ি, আর সানগ্লাসে তার মুখের বেশিরভাগ ঢেকে গিয়েছে। সে বেগুনী শার্ট, টাইট কালো জিন্স, আর সিলভারের বেল্ট পরে আছে। "কি করছ তুমি এসব?" সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

"ব্রোশিয়ার পড়ছি," বললাম আমি।

"বোকা নাকি তুমি? সরাসরি ফি আর প্লেসমেন্ট পাতা দেখ। গড় বেতন দেখ, ফি দেখ। যদি দুই বছরের বেতনে টাকা উঠে, সর্ট লিস্টে রাখ, নয়তো বাদ।"

"পাঠদান পদ্ধতি দেখব না? পড়াশোনা..."

"বালের পড়াশোনা," বলে সুনীল আমার হাত থেকে ব্রোশিয়ার কেড়ে নিয়ে নিল। তার আচরন আর কথাবার্তা আমার কাছে যথেষ্ট অমার্জিত মনে হল। সে স্টলের একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে একটা ক্যালকুলেটর ধার নিল। "দেখ, টিউশন পঞ্চাশ হাজার, হোস্টেল ত্রিশ হাজার, আর কিছু ফালতু জিনিসপত্র কিনতে তোমার ধর আরও

বিশ হাজার লাগবে। তার মানে চার বছরের প্রতি বছর তোমাকে একলাখ করে গুণতে হবে। গড় প্লেসমেন্ট দেড় লাখ। আর দরকার নেই, বাদ দাও। চল।"

"কিন্তু..." আমি তখনো হিসেব করছি।

"চল তো। আরো শত শত স্টল আছে।"

আমরা পরের স্টলে গেলাম। লাল আর সাদা ব্যানারে লেখা, "শ্রী চিন্তমল গ্রুপ অব ইন্সটিটিউটস, এনএইচটু, এলাহাবাদ।" একটা ছোট ম্যাপ কলেজের অবস্থান দেখাচ্ছে, এলাহাবাদ শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

"আমি চিন্তমল নামের কোন কলেজে যেতে পারব না," বললাম তাকে।

"চুপ কর। তোমাকে কখনোই তোমার কলেজের নাম উচ্চারণ করতেই হবে না।" সুনীল একটা ব্রোশিয়ার তুলে নিল। মুহূর্তের মধ্যে সে দরকারি পাতাটা বের করল। "আচ্ছা, এটাতে এক বছরে সত্তর হাজার। ফাইনাল প্লেসমেন্ট একলাখ চলিশ হাজার। দেখ, এটা আগের চেয়ে ভাল।"

একজন মোটা লোক আমাদের দিকে এল যার বয়স চল্লিশের কোঠায় হবে।

"এবছর থেকে আমাদের প্লেসমেন্ট আরও ভাল হবে," সে বলল। "আমি জ্যোতি ভার্মা, এখানকার ডিন।"

আমি ভাবতেও পারি নি একজন ডিন আমাদের কাছে তার কলেজ বিক্রি করতে আসবে। সে তার হাত বাড়িয়ে দিলে সুনীল উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে হ্যান্ডশেক করল।

"হ্যা, আপনাদের ফি তাদের চেয়ে কম," বলে আমি শ্রী গনেশ স্টলের দিকে দেখালাম।

"তাদের প্লেসমেন্ট সংখ্যাও নকল। আমাদেরটা আসল, আমাদের যে কোন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস কর," জ্যোতি বলল।

সে তার স্টুডেন্টদের দিকে ইঙ্গিত করল, তিনটা ছেলে আর দুটো মেয়ে, যারা তাদের জীবনে প্রথমবারের মত স্যুট পরেছে। লাজুক ভঙ্গিতে হাসলো। আমি চিন্তমল স্টলের ক্যাম্পাসের ছবি দেখতে লাগলাম।

শ্রী গনেশ স্টল থেকে একজন লোক আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল।

"জি," আমি বললাম।

"আমি শ্রী গনেশ থেকে মহেশ ভার্মা। চিন্তমল আমাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু কি বলেছে?"

আমি মহেশের দিকে তাকালাম, মোটা এবং বয়স চল্লিশের কোঠায়। তাকে দেখতে অনেকটাই জ্যোতি ভার্মার মত লাগছে।

"বলেছে?" মহেশ আবারো জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম।

"তুমি কি চিন্তমলকে পছন্দ করছো?" সে বলল।

আমি আবারো ঝাঁকালাম।

"শ্রী গনেশকে পছন্দ করছ না কেন?"

"এটাতে খরচ বেশি," আমি বললাম।

"তোমার বাজেট কত? আমরা তোমাকে কিছু ছাড় দিতে পারি," সে বলল।

"কি?" আমি বিশ্বাস করতে পারছি না কলেজের ফি নিয়েও দরদাম হতে পারে। সুনীলের দিকে তাকালাম, বুঝতে পারছি না কি বলব। সুনীল পরিস্থিতি নিজের হাতে তুলে নিল।

"আমরা ত্রিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চাচ্ছি। চিন্তমল এরকমই ছাড় দিচ্ছে," সুনীল বলল।

"তাদের কোন বিল্ডিংই নেই," মহেশ বলল।

"আপনি কিভাবে জানেন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"সে আমার ভাই। সে আমার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তার নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটার অসংখ্য বাজে রিপোর্ট আছে," মহেশ বলল।

জ্যোতি দূর থেকে আড়চোখে আমাদের দেখে যাচ্ছে। হ্যা, তাদের মধ্যে আসলেই অনেক মিল।

"এসব জানার কোন দরকার নেই। আপনি আপনার সর্বোচ্চ ছাড় কত দিতে পারবেন তা বলেন," সুনীল বলল।

"আমার স্টলে আসো," মহেশ তাকে অনুসরন করার ইঙ্গিত করল।

"থাম," জ্যোতি আমাদের মাঝখানে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে?" আমি বললাম।

"তোমরা শ্রী গনেশে কেন যাচ্ছ?"

"সে আমাদের ডিসকাউন্ট দিচ্ছে," আমি বললাম।

"তোমরা কি আমার কাছে ডিসকাউন্ট চেয়েছ? আমি কি দেব না বলেছি?" জ্যোতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল। আজকের আগে আমি কখনো এরকম ব্যবসায়ী-কাম-ডিন দেখি নি। "মহেশ ভাই, প্লিজ আমার স্টল থেকে চলে যাও," জ্যোতি হুমকির স্বরে বলল।

"সে আমার ছাত্র, আমরা কথা বলে ফেলেছি," বলে মহেশ ভাই আমার কব্জি ধরল। "আসো, বাবা, তোমার নাম কি?"

"গোপাল," আমি নাম বলতে বলতেই জ্যোতি আমার আরেক কব্জি ধরে ফেলল। "কিন্তু প্লিজ, আমাকে টানাটানি বন্ধ করুন।"

দুই ভাই আমার অনুরোধের দিকে কর্ণপাতই করল না।

"আমি তোমাকে সর্বোচ্চ ছাড় দিব। তুমি শ্রী গনেশে গিয়ে তোমার জীবন ধ্বংশ কোরো না। তাদের কোন ল্যাব-ও নেই। ব্রোশিয়ারের ছবিগুলো অন্য কলেজের," জ্যোতি বলল।

"স্যার, আমি এসব কিছুই..." বলতে বলতে আমি সুনীলের দিকে তাকালাম। তাকেও আমার মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হল।

"চুপ কর জ্যোতি!" এতক্ষণ পর্যন্ত শান্তস্বরে কথা বলা মহেশ এবার চেঁচিয়ে উঠল।

"আমার স্টলে আমার সাথে চেঁচামেচি করবে না। বেরিয়ে যাও," বলল জ্যোতি।

মহেশ আমাদের সবার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। একটা দ্রুত পদক্ষেপে চিন্তমলের ব্যানার একটানে ছিঁড়ে ফেলল সে।

জ্যোতির চেহারা তার কলেজের প্রতীকের মতই লাল হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ শ্রী গনেশ স্টলে গিয়ে তাদের ব্রোশিয়ারের বাক্স নিচে ফেলে দিল।

আমি দৌড়ে স্টল থেকে বেড়িয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। জ্যোতি আমার কলার ধরে ফেলল।

"দাঁড়াও, আমি তোমার বেতন বছরে পঞ্চাশ হাজার করে দেব।"

"আমাকে...যেতে...দিন," আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

মহেশ বলিউডের গুন্ডাদের মত দেখতে তিনজন লোককে নিয়ে এল। স্পষ্টতই তারা ফ্যাকাল্টি। তারা চিন্তমল স্টলের সবগুলো ব্যানার ছিড়ে ফেলতে শুরু করল। জ্যোতি তার নিজের সিকিউরিটি লোকদের বলল তাদেরকে ধরে মার দিতে।

আমি পালাতে চেষ্টা করতেই শ্রী গনেশের একজন ষন্ডা আমাকে ধাক্কা দিল। আমি শাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা কাঠের টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। এটাতে একটা তারকাটা বেড়িয়ে ছিল যাতে আমার গাল কেঁটে গেল। আমার চেহারার একপাশ রক্তে ভিজে উঠল। কপালে জমে উঠল ঘাম। অবশেষে পড়াশোনার জন্য আমি আমি রক্ত দিলাম, ঘাম ঝড়ালাম।

সুনীল আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। সাদা কাপড়ে রক্ত চোখে পড়তেই আমার বমি বমি লাগল। আমাদেরকে ঘিড়ে একটা জটলা হয়ে গিয়েছে। আমি কিছু না বলে দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। একপ্রকার দৌড়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে মেইন রোড ধরে প্রায় দু'শ মিটার গিয়ে থামলাম।

আমি দম নেয়ার জন্য থামতেই সুনীলের পায়ের শব্দ শুনলাম, আমার দিকে দৌড়ে আসছে।

"বাল," সুনীল বলল। "ভাগ্যিস পালাতে পেরেছি।"

আমরা একজন কেমিস্টের কাছে গিয়ে আমার গালে ব্যান্ডেজ করে নিলাম।

"এসো, তোমাকে সিসিডি'তে নিয়ে যাই। এটা গত সপ্তাহেই চালু হয়েছে," সুনীল বলল।

আমরা সিগরার আইপি মলের ক্যাফে কফি ডে-তে গেলাম। সুনীল একটা কড়কড়ে একশ' রুপি নোট দিয়ে দুটা কোল্ড কফি নিল। আমি ঐ টাকা দিয়ে দু-সপ্তাহ পার করে দিতে পারতাম।

"এটা কি হল? তারা কলেজ চালাচ্ছে?" আমি বললাম।

"এরা এলাহাবাদের ভার্মা পরিবার। এদের বিশাল মদের ব্যবসা আছে। এখন তারা কলেজ দিয়ে বসেছে।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"টাকা। প্রাইভেট কলেজে আয় অনেক টাকা। তাছাড়া, এতে সমাজে তাদের অবস্থান ভাল হচ্ছে। এখন তারা শিক্ষাক্ষেত্রের সম্মানিত লোক, মদ ব্যবসায়ী না।"

"তারাতো গুন্ডাদের মত আচরন করল।"

"তারা আসলে গুন্ডাই। ভাইদের মধ্যে ঝগড়া, কলেজ গেল ভেঙে। আর এখন একে অপরকে শসায়েস্তা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।"

"আমি এসবের মধ্যে যেতে পারব না," বললাম তাকে।

"সমস্যা নেই, অন্য আরেকটা কলেজ খুঁজে পাওয়া যাবে। ভালভাবে দরদাম করতে হবে। তাদের সিট তো পূরন করতে হবে, তাই না?"

"এসব জায়গায় পড়তে হবে এটা ভাবতেই আমার বিতৃষ্ণা লার্গছে। মদের ব্যবসায়ী চালাচ্ছে কলেজ?"

"হ্যা, রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার, বিড়ি ব্যবসায়ী। কুখ্যাত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যে কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে ভাল করছে," বলল সুনীল। সে তার স্ট্র তুলে নিয়ে ক্রিম সাফ করল।

"তাই নাকি?" আমি বললাম। "পড়াশোনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত না? যেমন ধর একজন প্রাক্তন প্রফেসর?"

"পাগল হয়েছ? পড়াশোনা শুধুমাত্র তাদের জন্য না। ফুডচেইন সর্বস্তরের মানুষের জন্যই," সুনীল বলল। সে আমার সাথে কথা বলতে বলতে তার পা নাচাচ্ছে। সে তার মোবাইল ফোন বের করল। সেলফোন ধীরে ধীরে প্রচলিত হওয়া শুরু করেছে, কিন্তু এখনো এটা স্ট্যাটাস প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

সুনীল একজনকে ফোন করল যিনি সম্ভবত কোন ঝামেলায় আছেন। "ঠান্ডা হোন, সুবেইজি। এমএলএ শুকলাজি এই ফেয়ার পরিচালনা করছেন। হ্যা, এটা বন্ধ করার সময়। আমাদের আরো দু-ঘণ্টা সময় দিন...একটু দাঁড়ান।" সুনীল আমার দিকে তাকাল। "ইভেন্ট ব্যবসা, সবসময় আমার সাথে লেগেই থাকে," সে ফিসফিসিয়ে বলল। "আমি বাইরে গেলে কিছু মনে করবে? আমি একটু আসছি।"

"ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই," বললাম তাকে।

আমি আমার কফি নিয়ে একা বসে রইলাম। আমি ভীড়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। বড়লোকের ছেলেমেয়েরা দামি কেক আর বিস্কিট নিচ্ছে তাদের ক্রিম কফির সাথে।

চামড়ার জ্যাকেট পরা দুজন লোক সিসিডিতে ঢুকল। আমি তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন দেখেছিলাম। তাদের চোখে না পড়ার জন্য অন্য দিকে ঘুরে

বসলাম আমি। কিন্তু ইতোমধ্যেই তারা আমাকে দেখে ফেলেছে। আমার টেবিলের দিকে চলে এল তারা।

"বাবার মৃত্যু উৎসব পালন করছ?" একজন বলল। সে তার পেশিবহুল হাত দিয়ে টেবিলে এককাপ চা রাখল।

"আমার কাছে এখন কোন টাকা নেই," শান্ত কণ্ঠে বললাম।

"তাহলে আমরা তোমার বীচি খুলে নিয়ে যাব," গোফওয়ালা লোকটি বলল। সে কোকের একটা ক্যান তার হাতে ধরে আছে।

"যদিও ওগুলোর প্রতিটার দাম একলাখ করে নয়," চা-খাওয়া গুন্ডা বললে তারা দু'জনেই হেসে উঠল।

সুনীল তার কল শেষ হতেই ফিরে এসে নতুন মেহমানদের দেখে বিস্মিত হল।

"তোমার বন্ধু?" জানতে চাইল সে।

আমি মাথা দোলালাম।

"তার বাবার," চাওয়ালা লোকটি বলল।

"আমি আপনাকে দেখেছি..." সুনীল বলল।

"এটা আমাদের শহর। আমাদের সবজায়গায়ই দেখা যায়," কোকওয়ালা বলল।

"আপনারা এমএলএ শুকলাজি'র হয়ে কাজ করেন, তাই না?" সুনীল বলল।

"তা দিয়ে তোমার কাজ কি?" চাওয়ালা লোকটি বলল, তার কণ্ঠ একটু নার্ভাস।

"আমি আপনাদের তার বাসায় দেখেছি। হাই, আমি সুনীল। আমি সানশাইন ইভেন্টসের ম্যানেজার। আমরা এমএলএ শুকলার সাথে অনেক কাজ করি," সুনীল তার হাত বাড়িয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করার পরে তারা তার সাথে হ্যান্ডশেক করল।

"তোমার বন্ধুর কাছে আমরা টাকা পাই। সে যেন তাড়াতাড়ি সেটা দিয়ে দেয়। নয়তো..." চাওয়ালা লোকটি 'নয়তো' বলার পরে থেমে গেল। সত্যি বলতে কথার এফেক্ট দেয়ার জন্য না, বরং এরপরে কি বলবে তা সে জানে না।

সুনীল আর আমি চুপ করে থাকলাম। গোফওয়ালা ষন্ডা তার বাইকের চাবি দিয়ে টেবিলে তিনবার ঠক ঠক করল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল তারা।

আমি বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস তুললাম। ভয়ে আমার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছে। "আমার কলেজের কোন দরকার নেই। আমি এমনিতেই কিছুদিনের মধ্যে মারা যাব," বললাম তাকে।

"তুমি ঠিক আছ তো?" সুনীল বলল। "আমি আরো কফি নিচ্ছি।"

কফি না নিয়ে এ টাকা আমাকে দিলে আমার কাছে বেশি ভাল লাগত, কিন্তু আমি কিছু বললাম না। আমার দ্বিতীয় কাপ হাতে নিয়ে সুনীলকে এতদিনের সব গল্প বললাম–আমার ছেলেবেলা, কোটা, আমার ব্যর্থতা, বাবার মৃত্যু।

সুনীল ঠাস করে তার খালি কাপ টেবিলে রাখল। "তার মানে, তুমি এখন

ঋণগ্রস্ত। আর সেটা দেয়ার কোন উৎস তোমার নেই?" সুনীল সারমর্ম বলল।

"বাড়িটা আছে, কিন্তু ওটা বিক্রি করলেও অত টাকা হবে না। আর তারপরে আমার থাকার কোন জায়গা থাকবে না।"

"আর বিবাদী জমি?"

আমি সুনীলকে ঐ জমির কথাও সংক্ষেপে বলেছি। তবে বিস্তারিত বলি নি। "ওটা একটা পুরনো বিবাদ।" সুনীল এ বিষয়টা ধরেছে ভেবে অবাক হলাম।

"এটা কি ধরনের জমি?"

"কৃষিজমি," নিরানন্দভাবে বললাম।

"কোথায়?" সে বলল।

"শহর থেকে দশ কিলোমিটার বাইরে।"

সুনীলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। "তাহলে তো অনেক কাছে। জমি কতটুকু?"

"ত্রিশ একর। আমাদের ভাগে পনের একর।"

"আর তোমার চাচা কি বলছে?"

"কিছু না। সে পুরোটা চাচ্ছে। এটা একটা দ্বন্দ্ব। কত দলিল যে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। বার বছর ধরে এ কেস চলে আসছে।" আমি আমার পানীয় শেষ করলাম। "তার মানে, আমি বাঁশ খেয়েছি। হয়তো তারা আমার বাড়ি বিক্রি করে টাকা উসুল করে নিবে। কফির জন্য ধন্যবাদ।"

আমি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

"তুমি কি করতে চাচ্ছ?" সুনীল তার চেয়ারে বসেই চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

"আমি একটা মোটামুটি পার্টটাইম কলেজে ভর্তি হব আর যে চাকরি পাই করব।

"দাড়াও, এখানে বস," সুনীল বলল।

"কি?" আমি বসে বললাম।

"আমি তোমাকে কিছু সাজেশন দিব। আর আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য-ও করব। কিন্তু আমাকে ভাগ দিতে হবে। বড় ভাগ।"

"ভাগ?" আমি বললাম। *কিসের ভাগ? আমার ব্যর্থতার ভাগ?*

"তো, দশ পার্সেন্ট। ঠিক আছে?" সুনীল বলল।

"কিসের দশ পার্সেন্ট?"

"তুমি যা আয় করতে পার। তোমার উদ্যোগের দশ পার্সেন্ট শেয়ার।"

"কিসের উদ্যোগ?" আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

"তুমি একটা কলেজ চালু করবে।"

"কি?!"

"ঠান্ডা হও," সুনীল বলল।

"তুমি কি ঘাটের সাধুদের মত ভাং খাও নাকি?" আমি বললাম। এরকম আজগুবি

কথা শুনে আর কি মনে হতে পারে?

"দেখ, তোমার জমি আছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শহরের কাছাকাছি জমি," সে বলল।

"এটা এখন আমার না। কেসটার কোন নিষ্পত্তি হয় নি।"

"আমরা এটা নিষ্পত্তি করতে পারি।"

"আমরা? কারা? আর এটা কৃষিজমি। এখানে শুধু চাল-ডাল ফলানো যায়। এটাই আইন," আমি বললাম।

"দেশে কিছু মানুষ আছে যারা আইনের উর্ধ্বে," সুনীল বলল।

"কে?"

"এমএলএ শুকলাজি," সে বলল।

"শুকলা কে?"

"আমাদের এমএলএ। রামনলাল শুকলা। তুমি তার কথা কখনো শোনো নি?"

"তুমি তার কথা আগে ফোনে বলেছ," আমি বললাম।

"হ্যা, তার আশির্বাদে আমি বিশটা ইভেন্ট করেছি। তাকে ছাড়া আমি শহর কর্তৃপক্ষের অনুমতি কিভাবে পেতাম? আমি ব্যক্তিগতভাবে তার অংশ তার কাছে নিয়ে যাই। আমি তোমাকে নিয়ে যাব তার কাছে। আমার নিজের ভাগের জন্য," বলে সে চোখ টিপল।

"ভাগ?"

"হ্যা, ভাগ। দশ পার্সেন্ট। ভুলে গেলে এরইমধ্যে?"

"তুমি আসলে কি বলতে চাচ্ছ?"

"চল শুকলাজি'র সাথে দেখা করি। তোমার জমির দলিল যা কিছু আছে সাথে নিয়ে নাও।"

"তুমি সিরিয়াস?"

"আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি সিরিয়াস না?" সুনীল বলল।

আমি তার জেল দেয়া চুল আর মাথায় বসানো দামি সানগ্লাসের দিকে তাকালাম। আমার অবশ্যই নিজের মতামত আছে।

"তুমি আমাকে কলেজ খুলতে বলছো? আমি কখনো কলেজেই যাই নি," আমি বললাম।

"ইন্ডিয়াতে যাদের কলেজ আছে তাদের বেশিরভাগই কখনো কলেজে পড়ে নি। বোকা মানুষেরাই কলেজে যায়। স্মার্ট মানুষ নিজেরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে," সুনীল বলল। "আগামি সপ্তাহে আমরা যাচ্ছি। আর মনে রেখো..."

"কি?"

সে তার আঙুল ফোটাল। "আমার দশ পার্সেন্ট।"

অধ্যায় ১৫

আরতি আর আমি একটা দীর্ঘ নৌকা ভ্রমণে গেলাম। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে তার সবুজ ওড়না উড়তে লাগল। "কি করবে ভেবেছো?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আমি প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টায় আছি।"

"আর?"

"এগুলো খুবই ব্যয়বহুল আর দুর্নীতিতে ভরা," আমি বললাম।

বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামালাম আমি। নৌকা নদীর মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। আরতি যদি আমার কাছে এসে বসে আমার হাত ম্যাসাজ করে দিত! কিন্তু সে আসল না।

"তো? সামনে কি করবে?" আরতি বলল।

"যেকোন একটা ডিগ্রি আর সেইসাথে একটা চাকরি।"

"ধার করা টাকার কি হবে?"

"ওটা ম্যানেজ করা যাবে। বাবা বেশিরভাগই শোধ করে গিয়েছেন," আমি মিথ্যা বললাম। আমি চাই না তার উপর আমার ঋণের দুশ্চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে এ চমৎকার সময়টা নষ্ট করি।

"ভাল। চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে।" সে উঠে এসে আমার পাশে বসল। আমার হাত তার হাতে নিয়ে কেমন অন্যমনস্কভাবে আমার আঙুলের গিট ফোটাতে লাগল।

"তুমি রাঘবের সাথেই খুশি, তাই না?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

আমি চেয়েছিলাম সে যেন তা না হয়, কিন্তু অভিনয় করলাম যেন তা-ই চাচ্ছি।

"ওহ্ হ্যা।" সে আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল। "রাঘব আসলেই খুব ভাল।"

আমি আমার হাত সরিয়ে নিলাম। সে আমার হতাশা বুঝতে পারল।

"আমি কখনো বলি নি সে ভাল না," অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম।

"তুমি ঠিক আছ?"

"হ্যা," বলে আমি একটা নকল হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলাম। "কেমন আছে সে?"

"তার বাবা-মাকে সে বলেছে পেশা হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং নিবে না। এতে তারা মোটেই খুশি না।"

"সে আসলেই একটা গাধা। কি করবে সে?"

"সাংবাদিকতা," আরতি বলল। "সে এটাকে ভালবাসে। এটাই করতে চায়। সে

পরিবর্তন আনতে চায়। সে ইউনিভার্সিটি পলিটিক্সেও যুক্ত হয়েছে।"

"রামগাধা," আমি বললাম। আমি আবারো বৈঠা হাতে তুলে নিলাম। আরতি তার নিজের জায়গায় চলে গেল।

ফিরে আসার সময় আমরা কোন কথাই বললাম না। পানিতে বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ এ নিরবতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে। আরতির চুল বড় হয়েছে, এখন তা কোমড় পর্যন্ত নেমেছে। আমি তার চোখের পাতা দেখলাম, প্রতিবার পলক পড়ার সময় কেঁপে উঠছে। ভোরের সূর্য যেন তার ত্বককে ভেতর থেকে আলোকিত করে দিচ্ছে। আমি তার ঠোঁটের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলাম। তাকালেই তাকে চুমু দিতে ইচ্ছে হবে।

সে এখন আরেকজনের, আমার পঁচা মস্তিষ্কও তা বুঝতে পারছে। আমার মাথা সেটা বুঝলেও মন পারছে না।

"কেন আমরা বড় হলাম, গোপাল? আরতি বলল। "আগে সবকিছু কত্ত সহজ ছিল।"

আমি কখনোই কোন এমএলএ'র বাড়িতে যাই নি। বিকাল তিনটায় আমরা শুকলাজি'র বিস্তীর্ণ বাংলোতে পৌছলাম। পুলিশের গাড়ি বাইরে পার্ক করা, আর সিকিউরিটি গার্ডরা সমগ্র বাংলো ঘিরে আছে। সুনীল গেটে তার পরিচয় দিলে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারলাম।

সামনের বারান্দায় কিছু গ্রামবাসী বসে আছে এমএলএ'র সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায়। সুনীল আগেই বলেছে এমএলএ শুকলা একা থাকে। তার দুই ছেলে বিদেশে পড়াশোনা করাতে তার পরিবারের বেশিরভাগই বিদেশে থাকে। পার্টির কর্মীদের ভীড়ে তার বাড়িটাকে পার্টি অফিসই মনে হয়, বাসা মনে হয় না।

সুনীল গিরিশ বেদিকে নিয়ে এসেছে, 'একজন প্রাজ্ঞ এডুকেশন কাউন্সেলর।' আমার পিঠের ব্যাগ জমির দলিলপত্র আর কোর্টসম্পর্কিত কাগজপত্রে ঠাসা। এমএলএ'র অফিসে পৌছার আগেই গার্ডেরা আমার ব্যাগ তিনবার চেক করল।

কড়া ইস্ত্রি করা সাদা কোর্তা-পাজামা পরা মধ্যবয়স্ক একজন লোক সুসজ্জিত, পালিশ করা কাঠের ডেস্কের পেছনে বসে আছে। তার ভুড়িটাকে বাদ দিলে, শুকলাজি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে যথেষ্ট সুদর্শন। সে তার সেলফোনে কথা বলতে বলতেই আমাদেরকে বসার জন্য ইশারা করল।

"বিজ্ঞানীকে বল যে শুকলা আগে রিপোর্টটা দেখতে চায়। হ্যা, আমাকে দেখতেই হবে। এটা আমারো গঙ্গা। হ্যা, ঠিক আছে, আমার এখন একটা মিটিং আছে, রাখলাম।"

এমএলএ আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে তার ডেস্কের ফাইলগুলো উল্টাতে

লাগল।

"সুনীল, স্যার। সানশাইন ইভেন্টস। আ-আমরা ক্যারিয়ার ফেয়ারগুলো করি," সুনীল বলল, বাইরে তার কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা থাকলেও এখানে তোতলাচ্ছে।

"কাজটা কি বল," বলল শুকলাজি।

"জমি, স্যার," সুনীল বলল।

"কোথায়? কতটুকু?" শুকলাজির চোখ ফাইলে থাকলেও কান আমাদের দিকে। রাজনীতিবিদেরা সাধারন মানুষের তুলনায় একসাথে অনেকগুলো কাজ বেশি করতে পারে।

"ত্রিশ একর, শহরের থেকে দশ কিলোমিটার বাইরে লক্ষ্ণৌ হাইওয়েতে," সুনীল বলল।

এমএলএ মাঝপথে তার কলম থামিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল।

"কার?" বলে সে পুরোপুরি মনযোগ দেয়ার জন্য ফাইলগুলো বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকাল।

"আমার, স্যার," আমি বললাম। আমি জানি না কেন তাকে স্যার ডাকলাম। "আমি গোপাল মিশ্রা।" ব্যাগ খুলে জমির কাগজগুলো টেবিলে রাখলাম।

"আর আপনি?" বেদির দিকে তাকিয়ে শুকলাজি বলল।

"এডুকেশন কাউন্সেলর। সে নতুন কলেজ চালু করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। আমাদের নিজেদের লোক," সুনীল বলল।

"নতুন কলেজ?" বলল শুকলাজি।

"এটা একটা কৃষিজমি স্যার," সুনীল বলল।

"কৃষিজমি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন নেয়া যায়," বেদি প্রথমবারের মত কথা বলল।

"তোমাকে তো অনেক ছোট মনে হচ্ছে," শুকলাজি আমাকে বলল। "তোমার বাবা-মা কোথায়?"

"তারা বেঁচে নেই, স্যার," আমি বললাম।

"হুম, তো, সমস্যাটা কি?" শুকলাজি আঙুল দিয়ে শহরের মানচিত্রের উপরে জায়গাটার চিহ্ন আঁকল।

"আমার চাচা," বললাম তাকে।

"ওখানে তো সামনে একটা এয়ারপোর্ট হতে যাচ্ছে," সে ম্যাপটা আন্দাজ করতে পেরে বলল।

"তাই নাকি?" আমি বললাম।

শুকলাজি ইন্টারকম চাপল। সে তার স্টাফকে বলল তার মিটিং শেষ না হতে তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়।

"গোপাল, জমিটা সম্পর্কে সবকিছু আমাকে বল। সবকিছু," শুকলাজি বলল।

পরবর্তি এক ঘণ্টায় আমি তাকে আমার সারাজীবনের গল্প শোনালাম। "আর এখন আপনার লোকই আমার কাছে দু-লাখ টাকা পায়," বলে আমি আমার স্বগতোক্তি শেষ করলাম।

"তুমি কি চা খাবে? সফট্ ড্রিংকস?" শুকলাজি বলল।

আমি মাথা দোলালাম।

"আমার লোক তোমার কাছে টাকা পায়?"

"না স্যার, আপনার লোক না," সুনীল আমার পায়ে খোঁচা দিয়ে বলল। "বেদি স্যার, আপনার মতামত এবার বলুন।"

আমি বুঝতে পারি নি পাওনাদারেরা এমএলএ'র অধীনস্ত হলেও তারা বাইরে তা প্রকাশ করে না।

"ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য আদর্শ জায়গা, স্যার," বেদি বলল। "তার অংশের পনের একরই যথেষ্ট।"

"পনের কেন? যেখানে ত্রিশ আছে, আমরা কেন পনের নিব?" শুকলাজি বলল।

আমি আবেগে অভিভূত হয়ে গেলাম। জীবনে প্রথমবারের মত একজন শক্তিশালী লোক আমার সাপোর্ট করছে। তার 'আমরা' বলাটা আমার খুবই পছন্দ হল।

সুনীল আমার দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল। সে আমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে।

"পনেরই যথেষ্ট স্যার," আমি বললাম, এটাই কিভাব পাব বুঝতে পারছি না।

"ত্রিশ। বাকিটা পরের জন্য রেখে দাও। এটা শহরের খুবই কাছাকাছি...কলেজ একবার চালু হয়ে গেলে আর এয়ারপোর্ট চালু হয়ে গেলে আমরা আবাসিক বা বানিজ্যিক জোনের অনুমোদন পেয়ে যাব," শুকলাজি বলল।

আমি বুঝলাম না সে কি বলল কিন্তু আমি বুঝলাম সে আমার থেকে বেশি জানে। তাছাড়া, সে আমার পক্ষ নিয়েছে।

"কিন্তু আমরা এটা পাব কিভাবে?" আমি বললাম। চাচা বছরের পর বছর ধরে ওটা ভোগ করে যাচ্ছে।

"এটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও," শুকলাজি বলল। "তুমি আগে বল, কলেজ চালাতে পারবে তো?"

"আমি?"

"হ্যা, কারন সামনা-সামনি তুমিই কলেজের সবকিছু। আমি নিরব পার্টনার," সে বলল।

"কিন্তু কিভাবে?" আমি বললাম। "আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কোন টাকা নেই।"

"মিঃ বেদি তোমাকে অভিজ্ঞ করে দিবে। আমি তোমাকে নির্মান আর বাকি সবকিছুর জন্য টাকা দিব।"

আমি বুঝতে পারছি না, সারা দুনিয়া হঠাৎ কেন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসল? ঘটনা কি?

সুনীল আমার সংকট বুঝতে পারল।

"শুকলাজি স্যার, আপনি যদি আপনার অংশ সম্পর্কে তাকে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ভাল হয়। আর অবশ্যই আমার জন্য আপনার যেরকম পছন্দ," বলে সুনীল একটা আজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসলো।

"আমি কিছুই চাই না। একটা কলেজ খোলো, এটা আমার শহরের জন্য ভাল," শুকলাজি বলল।

আমরা কেউই তাকে বিশ্বাস করলাম না। তবুও আমরা তাকে সমর্থন করলাম। "প্লিজ স্যার," সুনীল বলল। "সেটা তো স্যার মোটেও সন্তোষজনক না।"

"আমি আমার ব্যাপারে ভাবব। কিন্তু এই ছেলে, তুমি বল, তুমি এটা পারবে তো?" শুকলাজি আমার দিকে তাকাল। তার এই দৃষ্টির সম্মুখে মনে হল আমার বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

আমি আমার উৎকণ্ঠা যতটা সম্ভব লুকাতে চেষ্টা করলাম। "আমরা যদি জমিটা পেয়ে তা বিক্রি করে দিই তাহলে কেমন হয়?"

"এতসব মামলার পরে জমিটা বিক্রি করা কঠিন হয়ে যাবে," শুকলাজি বলল। "জমির মালিক হওয়া এক জিনিস আর তা বিক্রির জন্য ক্রেতা খুঁজে বের করা অন্য জিনিস।"

"তা ঠিক। এতগুলো মামলা, এগুলো মিটবে কি করে?" আমি বললাম।

শুকলাজি হাসলো। "আমরা মামলা মিটাই না, মামলার লোকদের মিটিয়ে দেই।"

এমএলএ হাসলেও, তার চোখে দৃঢ় সিদ্ধান্ত দেখতে পেলাম। তাকে দেখেও মনে হয় সে মানুষজনকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর জমি পাওয়ার থেকেও আমি আমার আত্মীয়দের শিক্ষা দিয়ে দিতে বেশি আগ্রহী।

"তাদেরকে মিটাতে পারলে আপনি যতটুকু চান নিয়ে যেতে পারেন," আমি বললাম।

"আমার পনের একর," শুকলাজি বলল। "এটা আবাসিক বা বানিজ্যিক জোনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি এটা রেখে দিব। অন্য পনের একরে কলেজটা করব।"

"কলেজের কতটুকু মালিকানা চান আপনি?" আমি বললাম।

"তুমি যা দিতে চাও। কলেজ একটা ট্রাস্ট, কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান না," শুকলাজি কোন অভিব্যাক্তি না ফুটিয়েই বলল।

"তাই নাকি?" আমি অবাক হলাম।

"এটাই সত্যি," বেদি অনেক সময় পরে কথা বলল। "প্রতিটা কলেজই নন প্রফিট ট্রাস্ট হিসেবে নিবন্ধন করতে হয়। এখানে কোন শেয়ার হোল্ডার থাকে না, শুধুমাত্র ট্রাস্টিজ।"

"একটা প্রাইভেট কলেজ নন প্রফিট কলেজ হিসেবে কেন প্রতিষ্ঠা করব?" আমি বললাম।

বেদি ব্যাখ্যা করার আগে লম্বা একটা দম নিল। "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি লাভ করতে পারবে। ট্রাস্টিরা ট্রাস্ট থেকে টাকা তুলতে পারে যেকোন খরচ দেখিয়ে। অথবা কোন ফি ট্রাস্টে নিলে৭ কিন্তু হিসেবে রাখলে না। অথবা কোন কন্ট্রাক্টরকে তুমি যে টাকা দিবে তার একটা অংশ তোমাকে ফেরত দিতে চুক্তি করলে। আরো অনেক উপায় আছে..."

আমি তাকে না থামানো পর্যন্ত বেদি কথা বলতেই লাগল। "দাঁড়ান, এসব অবৈধ উপায় না?"

সবাই চুপ মেরে গেল।

একটু পরে শুকলাজি বলল, "আমার মনে হয় না এই ছেলে এটা করতে পারবে। তোমরা আমার সময় নষ্ট করছ।"

বেদি আর সুনীল লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল। আমি আমার জমি সম্পর্কিত কৌতুহল দেখিয়ে তাদেরকে ছোট করেছি।

"আমি দুঃখিত, আমি শুধুমাত্র জানতে চাচ্ছি," বললাম তাকে।

"কি?" বেদি ইতস্তত কণ্ঠে বলল।

"আপনারা বলছেন যে একটা কলেজ থেকে টাকা উপার্জনের সবগুলো পথই অবৈধ? দুঃখিত, আমি সততা দেখাচ্ছি না, বুঝতে চাইছি মাত্র।"

"আচ্ছা," বেদি বলল। "আপনার টাকা উপার্জনের কোন অধিকার নেই।"

"তাহলে কেন একজন সেটা করবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সমাজের উপকারের জন্য, যেমন আমরা রাজনীতিবিদেরা করি," শুকলাজি বলল।

আমি ছাড়া সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। আমি বুঝতে পারলাম কৌতুকটা সরল, বোকা গোপালের সাথেই করা হয়েছে।

"শোন গোপাল," সুনীল বলল, "এগুলোই নিয়ম। আর নিয়মগুলো এরকমই। এখন তুমি হয়তো এগুলো ফাকফোকর খুঁজে বের করবে, অথবা চুপচাপ বসে থাকবে। একটা ট্রাস্ট থাকতে হবে, তুমি আর শুকলাজি হবে ট্রাস্টিজ। বেদি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবে।"

বেদি আমাকে একটা অভয়পূর্ণ হাসি দিল। হ্যা, লোকটি নিয়ম জানে, আর সেটা কিভাবে ভাঙতে হয় তা-ও জানে।

"মিঃ বেদি, ছেলেটাকে এত বৈধতার প্রশ্ন না করতে বলে দিবেন। তাহলে আর কলেজ তার জন্য কোন ব্যবসা হবে না।"

"অবশ্যই," বেদি হাসলো। "শুকলা স্যার, ট্রাস্ট থেকে টাকা নেয়াটা সবচেয়ে ছোট সমস্যা। কিন্তু যেসব পারমিশন আর অনুমোদন লাগবে সেগুলোর কি হবে?

প্রতিটা ধাপেই বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।"

"তো, এটাই এই ছেলেকে করতে হবে। আমি এখানে অদৃশ্য থাকব। আমি সমাজের উপকারের জন্য শুধুমাত্র একজন ট্রাস্টি," শুকলাজি বলল।

"কি করতে হবে?" আমি বললাম।

"চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব," বেদি বলল। "আপনার বারানশি নগর নিগামের অনুমোদন লাগবে বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য, এআইসিটিই অনুমোদন লাগবে কলেজের জন্য। তাছাড়া পরিদর্শন হবে। সবাইকেই খুশি করতে হবে। এটাই নিয়ম।"

"ঘুষ?" আমি বললাম।

"চুপ! শুকলাজি তিরস্কারের কণ্ঠে বলল। "এখানে এসব বলবে না। তোমাদের আলোচনা বাইরে কর। এখন যাও।"

আমরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

"এক মিনিট দাঁড়াও, গোপাল," এমএলএ বলল।

"জি?" সুনীল আর বেদি বেড়িয়ে যাওয়ার পরে বললাম।

"এখানে যা করা লাগবে তুমি কি পারবে?" শুকলাজি বলল, "নয়তো আমি আমার সময় নষ্ট করব না। এখনই বল তুমি যদি করতে না চাও।"

আমি চিন্তা করার জন্য একটু চুপ থাকলাম। "এটা আসলে তত সহজ না," আমি স্বীকার করলাম।

"জীবনে বড় হওয়াটা কখনেই সহজ না," শুকলাজি বলল।

আমি চুপ করে রইলাম।

"তুমি কি জীবনে বড় হতে চাও, গোপাল?"

আমি নিচের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম। ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝের সাদাকালো নকশা দেখতে লাগলাম।

"নাকি তুমি সাধারন একটা ছেলেই থাকতে চাও যেখানে তোমার বন্ধুরা তোমার থেকে এগিয়ে যাবে?"

আমি কষ্টে ঢোক গিললাম। আমি তার চোখের দিকে তাকাতে মাথা উপরে তুললাম।

"তোমার কি গার্লফ্রেন্ড আছে, গোপাল?"

আমি মাথা দোলালাম।

"তুমি কি এর কারন জান? কারন তুমি একজন নো-বডি।"

আমি মাথা নাড়লাম। বিএইচইউ কারপার্কে আরতি আর রাঘবের আবেগপ্রবন চুমুর দৃশ্য আমার মনে উঁকি মেরে গেল। আমি যদি বিএইচইউ'তে চান্স পেতাম আর রাঘবকে যদি কোটায় যেতে হত, তাহলে কি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হত? আমি শুকলাজি'র দিকে তাকালাম। তার প্রতিটা ইঞ্চি অবৈধ মনে হল। কিন্তু সে আমাকে

একটা সুযোগ দিয়েছে। একটা চাকরি, একটা ভর্তি, একটা চান্স, কখনো কখনো এগুলোই একজন মানুষের জন্য দরকারি হয়ে পড়ে।

"আমি করব। ইন্ডিয়ায় ঘুষ তো আমি একা দিচ্ছি না," বললাম তাকে। "কিন্তু আমি বড় হতে চাই।"

শুকলাজি উঠে দাঁড়াল। সে তার ডেস্কের এপাশে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। "তুমি এখনই একজন বড় মাপের লোক," সে বলল। "কারন, তুমি আমাকে তোমার পাশে পেয়েছ। এখন যাও, বাইরে গিয়ে তোমার হারামি চাচার ঠিকানা আমার সেক্রেটারিকে বল।

"আপনার লোক যে আমার কাছে টাকা পায় তার কি হবে?" আমি বললাম।

"দুই লাখ, এটা আমার হাতের ময়লা, তুমি এটা ভুলে যাও," শুকলাজি বলেই ডেস্কে গিয়ে ড্রয়ার খুলল। দশ হাজার রুপির দুটো বান্ডিল নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিল সে। "একটা সুনীলের, আরেকটা তোমার।"

"আমার জন্য কেন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আমার কলেজ চালানোর জন্য, ডিরেক্টর স্যার," সে হাসলো।

অধ্যায় ১৬

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুকলাজি'র দশ হাজার টাকা নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে শুধুমাত্র একটা প্রশ্রয় না দিয়ে পারলাম না–আরতিকে ডিনারে নিয়ে জন্য গেলাম তাজ গঙ্গায়, শহরের সবচেয়ে দামি রেস্টুরেন্টে।

"তুমি শিওর?" আরতি তাজের কফিশপে ঢুকতেই আবারো জিজ্ঞেস করল। "আমরা ঘাটে বসেই খেতে পারতাম।"

সে একটা নতুন, লম্বা, গাঢ়নীল ড্রেস পরেছে যেটা তার আত্মীয় পাঠিয়েছে ইউএস থেকে। এর সাথে ম্যাচ করে সে বিশ্বনাথ গলি থেকে কেনা নকল স্বর্ণের জুয়েলারি পরেছে।

"আমার ট্রিট," আমি বললাম।

ওয়েটার আরতির চেয়ারটা টেনে দিল। আরতি বসতে বসতেই তাকে ধন্যবাদ জানাল। আরতি তার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও চকলেট কেক খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। আমরা ডিনারের জন্য স্যুপ আর সালাদ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে ডেজার্টে কিছু ক্যালরি নেয়া যায়।

আরতি চামচ দিয়ে তার গরম স্যুপ নাড়তে লাগল। "সরি, কিন্তু তুমি এর জন্য টাকা কোথায় পেলে? বাবা কি তোমার জন্য অনেক উইল রেখে গিয়েছেন নাকি?"

আমি হাসলাম। "না, তিনি আমার জন্য লোন রেখে গিয়েছেন।"

"তাহলে?"

"আমি নতুন ব্যবসা শুরু করছি।"

"স্মাগলিং?" আরতি তার মাথা একপাশে সরাল।

"চুপ কর। আমি নতুন কলেজ খুলছি।"

"কি?" অর্তি এত জোরে বলল যে পুরো কফিশপের লোকজন সম্ভবত শুনতে পেল।

"সরি," সে আস্তে আস্তে বলল। "তুমি কি বললে যে তুমি কলেজ খুলছো?"

"হ্যা, আমার বিবাদী জমিতে।"

"কিভাবে? জমিটার মামলা এখনো ঝুলছে না? তাছাড়া তুমি কলেজ কিভাবে খুলবে?"

"আমার পার্টনার আছে। শক্তিশালী পার্টনার।"

"কে?" আরতি জানতে চাইল।

"আমি তোমাকে বলব। আমরা মাত্র আমাদের প্ল্যান রেডি করছি।"

"তাই নাকি?" আরতি বলল। "তাহলে তুমি সিরিয়াস?"

"হ্যা, এটা শহরের একটু বাইরেই পনের একর জায়গা। আমরা যদি বিবাদটা মেটাতে পারি আর রি-জোন করতে পারি, তাহলে এটা কলেজের জন্য আদর্শ একটা জায়গা," আমি বেদির কথাগুলোর পুণরাবৃত্তি করলাম।

"ওয়াও," আরতি হেসে বলল। "তোমারই তো এখন সময়, গোপাল।"

সে এটা মজা করে বললেও আমাকে এটা আঘাত করল। "কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি কখনো কিছু করতে পারবে না?"

"না, আমি সেটা বলতে চাই নি," আরতি বলল। "আমি আসলে...বিস্মিত।"

"জীবনে তো আমাকে কিছু করতে হবে।"

"অবশ্যই। তুমি 'কিছু' থেকে বেশি কিছুই করবে। তোমার চাচার কি করবে?"

"আমরা তার সাথে একটা শান্তিপূর্ণ মিমাংসায় যেতে চাচ্ছি।"

শুকলাজি'র যেসব লোক দেনা-পাওনার বিষয়টা দেখাশোনা করে, তারা ঘনশ্যাম টায়াজি'র সাথে মিমাংসার কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তাদের মিমাংসার সেই পদ্ধতিকে আর যা কিছু বলা যাক শান্তিপূর্ণ মোটেও বলা যায় না।

তারা চাচার বাড়িতে তিনবার গিয়েছে। প্রথমবার এক বোতল ছাগলের রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে সামনের বারান্দায়। দ্বিতীয়বার তারা বাড়ির সোফা আর খাটগুলোকে ছুড়ির মাথা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তৃতীয়বার, যখন কিনা তারা প্রথম কথা বলল, পিস্তল হাতে নিয়ে চাচাকে তার জমির অংশ আট লাখ রুপিতে বিক্রি করে দিতে বলল।

আরতিকে এসব বিস্তারিত তথ্য অবশ্যই বললাম না।

"কি ধরনের কলেজ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ইঞ্জিনিয়ারিং।"

"দারুণ," আরতি বলল।

"বড় মাপের মানুষ হতে চাইলে আমাকে বড় মাপের কাজই করতে হবে," বললাম তাকে।

"আমার কাছে তুমি সবসময়ই একজন বড় মাপের মানুষ, গোপাল। কেন জান?"

"কেন?"

"কারন তোমার মনটা অনেক বড়।" আরতি আস্তে করে আমার টেবিলের ওপর রাখা হাতটা স্পর্শ করল।

আমার মনটা বড় হোক আর ছোটই হোক, আরতির স্পর্শে ওলট-পালট হয়ে গেল। সাথে সাথেই আমি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললাম। "তোমার কেমন চলছে? কলেজ কেমন লাগছে?"

"বিরক্তিকর। তবে আমি এভিয়েশন একাডেমিতে ভর্তি হচ্ছি।"

"এটা আবার কি?"

"এখানে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য ট্রেনিং হয়। এখানে ক্লাস রুমগুলো প্লেনের মত করে সাজানো।"

"তাই নাকি?" শিক্ষাক্ষেত্রে এতকিছু হয়ে যাচ্ছে ভেবে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

"হ্যা, আমাদের বেশিরভাগকেই স্টুডেন্ট হতে হয়। সবাই তো আর কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না," সে খোঁচা দিল।

আমি হাসলাম। "এখনো অনেক দূর যেতে হবে। অনেক কঠিন," আমি বললাম।

"তোমার জীবনে আরো অনেক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এসেছ। এটাও করতে পারবে," আরতি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

"তোমার তাই মনে হয়?" আমি বললাম।

সে মাথা ঝাঁকাল। তার মাথা নাড়া আমার কাছে সারা পৃথিবীর চেয়ে দামি। তাকে আবার প্রেমের প্রস্তাব দিতে ইচ্ছে করছে। কেন যেন আমার কাছে মনে হয়েছে আমার কলেজের ব্যাপারটার কারণে সে হয়তো হ্যা বলবে। শুধুমাত্র আমার মস্তিষ্কেই এ ধরনের ফালতু থিওরি কিলবিল করে।

"রাঘব কেমন আছে," নিজেকে বাস্তবে নিয়ে আসার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

"আসলে, তেমন ভাল না," সে বলল।

আমি বেশ খুশি খুশি বোধ করলাম। "তাই নাকি? কেন?" উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করলাম।

"সে বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচনে হেরে গিয়েছে।"

"ওহ্," আমি বললাম। "এটা কোন সমস্যা?"

"তার জন্য সমস্যা। সে হেরে গিয়েছে কারন সে অন্যান্য হোস্টেলগুলোর সাথে হাত করে নি। সে সৎভাবে প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছিল।"

"তাহলে তো তার হেরে যাওয়াটা স্বাভাবিক," একটা গাজরে কামড় বসাতে বসাতে বললাম।

"সে বিশ্বাস করে জয়ী হতে হলে অবশ্যই সৎভাবে হওয়া উচিৎ। তা না হলে জয়ী হয়ে লাভ কি?" আরতি বলল।

"কিন্তু দুনিয়া তো এভাবে চলে না, চলে? তুমি বল?" চিবুতে চিবুতে বললাম।

"আমি জানি না। তবে এভাবেই চলা উচিত," আরতি বলল। "সে আগামি বছর আবার মাঠে নামবে।"

"সে কি বাড়াবাড়ি করছে না?"

"ওহ, হ্যা, তার পড়াশোনা, ম্যাগাজিন আর ভোটের ভীড়ে সে আমাকে একদমই সময় দিতে পারছে না।"

"আর তোমার কাছে সেটা ভাল লাগছে?"

"না, কিন্তু কিছু তো করার নেই। এটা যদি তার কাছে ভাল লাগে, তাহলে এটাই

ভাল।"

আমাদের খাওয়া শেষে চকলেট কেক এলে তার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। সে প্লেটটা তার দিকে টেনে নিল। "আমার কেক আবার চুরি করবে না," বলে সে হাসলো।

"রাঘব আসলেই একজন সৌভাগ্যবান ছেলে, আরতি," আমি বললাম।

"থ্যাংকস," বলে সে একটা লজ্জিত হাসি দিল।

"আরতি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"হ্যা বল?" সে আমার দিকে তাকাল। কেকের ওপরে তার চামচ প্রস্তুত হয়ে আছে।

"কিছু না, পারলে আমার জন্য একটু কেক রেখো," বলে আমি বিলের জন্য ইশারা করলাম।

মাঝরাতে কলিং বেলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ ডলতে ডলতে আমি দরজার দিকে গেলাম, আধো সজাগ। আমার চাচা, চাচি আর তাদের ছেলে, আমার ত্রিশ বছরের চাচাত ভাই অজয় দরজায় দাঁড়িয়ে।

"ঘনশ্যাম টায়াজি?" আমি বললাম। "কি হয়েছে? ভেতরে আসুন।"

তারা সামনের রুমের ছেঁড়া সোফায় বসল। পাঁচ মিনিট কেউ কোন কথাই বলল না।

"আমার কথা মনে পড়াতে আপনারা এত রাতে এখানে আসেন নি নিশ্চয়ই?" আমি বললাম।

"তুমি আমাদের সাথে এসব কেন করছ?" অজয় হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে উঠল।

"কি করছি?" আমি বললাম। "আপনাদের পানি দেব? চা?"

"না," চাচা বলল। "গোপাল, তোমার কর্মের দিকে মনযোগ দাও। ঈশ্বর সবকিছু দেখছেন। সবকিছুর জন্যই তোমাকে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের সাথে এসব করা বন্ধ কর।"

"কি করা?" আমি বললাম। আর এসব কথা বলতে কেন তারা এত রাতে এখানে এসেছে?

"বিট্টু নার্সারি স্কুল থেকে বাসায় আসে নি," বলতে বলতে চাচি কেঁদে ফেললেন। এখন তার কান্না বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত মায়াকান্না না।

তারা তাহলে বিট্টুর জন্য এখানে এসেছে, অজয়ের চার বছরের এ বাচ্চাটাকে আমি জীবনে একবার দেখেছি (তার মায়ের কোলে, বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়), বাচ্চাটা হারিয়ে গিয়েছে।

"ওহ্, এটা তো খুবই দুঃখজনক," আমি বললাম। "আর এর সাথে আমার কর্মের সম্পর্ক কি?"

"যেসব লোকেরা জমি কিনতে চেয়েছে তারাই এটা করেছে," চাচা বলল।

"আমরা জানি তারা তোমার সাথেই আছে।"

"আপনারা কি বলছেন এসব?" বললাম আমি।

চাচা হাতজোড় করে বললেন, "আমাদের সাথে এসব কোর না।"

"আমি কিছুই করছি না। কিছু মানুষ আমার কাছেও এসেছিল জমি কিনতে। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি বিক্রি করতে পারব না।"

"তাই নাকি?" অজয় বলল।

"আমি কিভাবে করব? এটা নিয়ে তো মামলা ঝুলছে, তাই না?" আমি বললাম।

"কিন্তু যারা এসেছিল তারা কিনতে চায় নি। তারা চায় আমরা যেন ব্যাংকের মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে ফেলি, বিবাদ মিটিয়ে সব তোমাকে দিয়ে দিই," চাচা বলল।

"অদ্ভুত। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে–আপনারা জমিকে বেশি ভালবাসেন নাকি বিট্টুকে? তাই তো?"

"চুপ কর," অজয় বলল। "আমরা জানি তুমিই এটা কিনতে চাও।"

"আমার তো খাবার কেনার টাকাই নেই। জমি কিভাবে কিনব?" আমি মাথা চুলকালাম।

"ঐসব লোক কারা?" চাচা জিজ্ঞেস করল।

"আমি তো জানি না। আপনারা পুলিশের কাছে যান," আমি বললাম। "তবে আপনাদের কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তারা বড় গুন্ডা।"

"পুলিশকে জানানোর দরকার নেই," চাচি বলল।

"তারা যেকোন কিছুই করতে পারে। বিট্টু একটা ছোট্ট বাচ্চা, ওর লাশ লুকিয়ে ফেলাটা তেমন কঠিন কোন কাজ না। তাছাড়া এটা বারানশি, মৃতদেহ নিশ্চিহ্ন করা খুবই সহজ," আমি বললাম।

অজয় সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কলার চেপে ধরল। "আমি জানি তুই এরসাথে ভালভাবেই যুক্ত। তোর বাবা সহজ-সরল ছিল, তুই না," সে বন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"আমার কলার ছেড়ে দিন ভাই, এক্ষুনি," আমি শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললাম।

অজয়ের মা তার ছেলের হাত ধরে টান দিলে অজয় আমাকে ছেড়ে দিল।

"তারা কি অফার করছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আট লাখ," চাচা বলল।

"আট লাখ তো খারাপ না," আমি বললাম।

"এটা মার্কেট প্রাইসের ধারে কাছেও না।"

"কিন্তু আমাকে যা দিতে চেয়েছিলেন তার দ্বিগুনেরও বেশি," বললাম আমি।

"তুই জড়িত," অজয় আমার দিকে চোখ গরম করে তাকাল।

"বাড়িতে যান, টায়াজি, আর এটা নিয়ে ভাবুন। আমরা সবাই বিট্টুকে জমির চেয়ে অনেক অনেক ভালবাসি।"

"আমাদের সাথে এসব কেন হচ্ছে?" চাচি দরজার কাছে গিয়ে বলল।

"এ সবই কর্মের ফল। টায়াজি আপনাকে বুঝিয়ে বলবে," দরজা বন্ধ করতে করতে আমি হেসে বললাম।

বিট্টুকে ছাড়া তিন রাত কাটিয়ে আমার আত্মীয়রা আট লাখ অফারের গুরুত্ব বুঝতে পারল। মিঃ ঘনশ্যাম মিশ্রা আর মিঃ অজয় মিশ্রা দলিলে দস্তখত করার সাথে সাথে আমি এমএলএ'র অফিস থেকে ফোন পেলাম।

"শর্মা বলছি, শুকলাজি'র পিএ," কলার বলল। "এমএলএ সাহেব আপনাকে আজ ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"চিয়ার্স," আমরা আমাদের হুইস্কির গ্লাসে টুং করে ধাক্কা লাগাতেই শুকলাজি বলল।

বেদি, সুনীল আর আমি তার সাথে তার লিভিংরুমে বসে আছি। এখানে আলাদা আলাদা তিনটা বসার জায়গার সবগুলোতে ভেলভেটের সোফা, কফি টেবিল ছাড়াও বিভিন্ন প্রদীপ আর ঝাড়বাতি আছে। তিনজন ওয়েটার কাবাব, বাদাম আর ছোট সমুচা ন্যাপকিন-লাইনড চায়না পেটে সার্ভ করছে। আমি দেয়ালে শুকলাজি'র পরিবারের ছবির দিকে তাকালাম।

"নিখিল আর অখিল, আমার দুই ছেলে," শুকলাজি বলল। "দুজনই ইউএস-এ পড়ছে। কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।"

কেউ কেউ বলে শুকলাজি ডিভোর্সড। আবার অনেকে বলে লক্ষ্ণৌতে তার আরেক পরিবার আছে। তবে আমার এসব জানতে কোনই ইচ্ছে নেই।

"জমি একটা বড় ধাপ," বেদি গম্ভীরভাবে বলল। "কিন্তু এখনো অনেক দূর যেতে হবে। সামনের সপ্তাহে আমরা ভিএনএন-এর লোকজনের সাথে দেখা করব। এর মধ্যেই আমাদের ট্রাস্টের কাজ কিছু এগিয়ে রাখা উচিত।"

বেদি বর্ণনা করল কিভাবে ভিএনএন, অথবা পৌরসভা, আমাদের জমির কৃষিক্ষেত্র থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে রি-জোনের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং প্ল্যানের বৈধতা দিবে। আর তখনই আমরা কন্সট্রাকশনের কাজ শুরু করতে পারব।

"তাড়াতাড়ি রি-জোনিং শেষ করুন। আমি ধান চাষের জন্য আট লাখ টাকা দেই নি," শুকলাজি বলল।

"অবশ্যই," বেদি বলল। "তারা জানে এর পেছনে কে আছেন। আপনি তো কোন ছোটখাট মানুষ নন, স্যার।"

"তা ঠিক," শুকলাজি ভাবলেশহীন কণ্ঠে বেদিকে বলল এই স্পষ্ট বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য। "কিন্তু আমাদের ভিএনএনকে-ও খুশি করতে হবে, তাই না?"

"হ্যা অবশ্যই," বেদি বলল। "এটা একটা রি-জোনিং। জমির মর্যাদা পাঁচগুণ বেড়ে যাচ্ছে। এটা তো এমনি হবে না।"

"কত?" শুকলাজি বললেন।

"অবশ্যই, আপনার জন্য রেট ভিন্ন। আমি দশ লাখে ম্যানেজ করে দিব।"

"কি?" শুকলাজি স্তম্ভিত হয়ে বলল।

বেদি তার হুইস্কি একটা বড় চুমুকে শেষ করে দিল। "এটা ত্রিশ একর স্যার। একজন সাধারণ মানুষের জন্য চল্লিশ লাখ।"

"দেখ, এজন্যই আমার মত মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে আসা উচিত। দেশের কি হচ্ছে এসব?" শুকলাজি বলল।

"ডিএম-এর সাহায্যও দরকার। কিন্তু প্রধান অনেক সৎ। তবে এটা যেহেতু কলেজের জন্য আর ভিএনএন অনুমোদিত সে-ও নিশ্চয়ই অনুমোদন দিবে," বেদি বলল।

"কেমন সৎ?" শুকলাজি বলল।

"টাকা না নেয়ার মত সৎ। তবে এত সৎ না যে অন্যদের নিতে বাধা দিবে।"

"তাহলে ঠিক আছে। সৎ হলে সততা নিজের মধ্যেই রাখা উচিত," সুনীল এ সন্ধ্যায় এই প্রথম কথা বলল।

"সুনীল," বলল শুকলাজি।

"জি স্যার?"

"তুমি এখন চলে যাও। আমি তোমার জন্য কিছু পাঠিয়ে দিব। আর আমরাই এখন থেকে এই প্রজেক্ট দেখব," শুকলাজি বলল।

"স্যার, কিন্তু..." সুনীল বলল।

"তুমি তোমার কাজ করেছ," বলে শুকলাজি তাকে জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেলের একটা বোতল দিল।

ইঙ্গিতটা সুনীল বুঝতে পারল। তাকে বোতলের জন্য ধন্যবাদ দিল সে, মানুষের মেরুদন্ড যতটা বাঁকতে পারে ততটা কুঁজো হয়ে কুর্নিশ করে চলে গেল।

"আমি ডিএম প্রধানকে চিনি। তার মেয়ে আমার বন্ধু," শুকলাজিকে বললাম।

"এতে তেমন লাভ হবে না। তবুও তার দোয়া সাথে থাকলে ভাল," শুকলাজি বলল।

"তা ঠিক," আমি বললাম।

শুকলাজি তার বেডরুমের ভেতরে গেল। একটা ভারি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে সেটা দিল।

"এটা কি?" আমি বললাম।

"দশ লাখ," সে বলল। "ভিএনএন-এর জন্য।"

"দশ লাখ?" বললাম আমি। ব্যাগটা ধরে রাখা অবস্থায়ই আমার হাত কেঁপে উঠল। আমি কখনোই এত টাকা চোখে দেখি নি, হাতে তোলা তো পরের ব্যাপার।

"এটা তো মাত্র একটা," এমএলএ বলল। "বেদিজি, ছেলেটাকে সাহায্য করুন।

আর নিজেকেও। আমি খালি গ্লাস পছন্দ করি না।"

"অবশ্যই শুকলাজি," বলে বেদি ওয়েটারকে ডাকল।

"শিক্ষাক্ষেত্রের মানুষজন কি শুধুমাত্র টাকা নিয়েই খুশি থাকে নাকি অন্য কিছুও চায়?" শুকলাজি বেদিকে জিজ্ঞেস করল।

"অন্য কি?" বেদি জিজ্ঞেস করল।

"মেয়ে, তারা যদি আনন্দঘন সময় কাটাতে চায়। আমার লোক আছে, বিনোদ, সে এসবের ব্যবস্থা করে," এমএলএ শুকলা বলল।

"ওহ, আমরা আপনাকে জানাব। যদিও টাকাই আসল কাজগুলো করে ফেলে," বেদি বলল।

"ভাল," সে প্রসঙ্গ বদলাল। "গোপাল আপনার অফিসে থেকে কি কাজগুলো করতে পারবে? তার নিজের অফিস না হওয়া পর্যন্ত?"

"অবশ্যই, শুকলাজি।"

ওয়েটার গ্লাস ভরে দিতে ছুটে এল।

'ট্রাস্ট পেপারগুলো তৈরি। আমরা এ সপ্তাহেই সাইন করে ফেলতে পারি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, গোপাল," বেদি বলল।

"কি?" আমি বললাম।

"কলেজের নাম কি হবে?" বেদি বলল।

আমি এটা নিয়ে মোটেও ভাবি নি।

"আমার তো কোন ধারণা নেই। সম্ভবত এমন কিছু যেটা টেকনোলজির সাথে সম্পর্কিত।"

"এবং আমাদের শহরের সাথে," শুকলাজি বলল। "সময়মত যেন আমি বলতে পারি আমি এটা তাদের জন্য করেছি।"

"গঙ্গাটেক?" আমি বললাম।

শুকলাজি আমার কাঁধ চাপড়ে দিল। "দারুণ। আমি তোমাকে পছন্দ করি গোপাল। তুমি অনেক দূর যাবে।" শুকলাজি নিজের হাতে আমার গ্লাস হুইস্কি দিয়ে কানায় কানায় ভরে দিল।

অধ্যায় ১৭

আমার ডেস্কের ফাইলগুলোর ওপর চোখ বোলালাম, বেদি যেগুলো এইমাত্র এখানে রেখেছে। তার এডুকেশন কন্সাল্টেন্সি অফিসের একটা অতিরিক্ত রুমে আমি বসে আছি।

"একজন ট্রাস্টকে নিবন্ধিত করতেও টাকা দিতে হবে?" আমি বললাম।

"হ্যা, কম্পানিগুলোর রেজিস্টারকে। প্রত্যেক ট্রাস্টকেই সেখানে রেজিস্টার্ড হতে হবে," বেদি বলল।

"কিন্তু ঘুষ দিতে হবে কেন? আমরা তো একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান খুলছি," আমি বললাম।

"আমাদের ঘুষ দিতে হচ্ছে কারন, আমরা তা না দিলে রেজিস্টার ফাইল আটকে বসে থাকবে," সে ইতস্তত করে বলল।

আমি অবিশ্বাসের সাথে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

"যাহোক, সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার। এখন, আপনি কি এখানে সাইন করবেন?" বেদি বলল।

পরবর্তি দুই ঘণ্টায় আমি চল্লিশ পৃষ্ঠার গঙ্গাটেক এডুকেশন ট্রাস্ট ইনকর্পোরেশন ডকুমেন্টের ছয়টা কপির প্রতিটা পৃষ্ঠায় সাইন করলাম। এগুলো করা শেষে আমি আমার আঙুলের গিঁট ফোটানোর আগেই বেদি খুঁজে খুঁজে আরো কিছু কাগজ নিয়ে এল।

"এগুলো কি?" বেদি আমার হাতে একরাশ চিঠি দিলে আমি বললাম। প্রতিটা চিঠির সাথে মোটা মোটা অনেকগুলো ফাইল লাগানো।

"ইউনিভার্সিটি গ্রান্ডস কমিশন, বা ইউজিসির কাছে কলেজ চালু করার আবেদন পত্র। ফাইলের মধ্যে কলেজের বিস্তারিত বর্ণনা।"

আমি ফাইলগুলোর পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখলাম। এগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে, যেমন কোর্সের বর্ণনা, প্রদেয় সুযোগ সুবিধা এবং ফ্যাকাল্টি নিয়োগের প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

"এটা পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে। আগের চিঠিগুলোর থেকে বানিয়েছি," বেদি বলল।

আমি চিঠিগুলোতে সাইন করলাম। "তার মানে তারা আমাদের কাছে মঞ্জুরিপত্র পাঠাবে, না কি করবে?" আমি বললাম।

"তারা সাইট পরিদর্শনের একটা তারিখ আমাদের জানাবে। পরিদর্শন শেষে তারা আপনাকে কন্সট্রাকশন শুরু করার জন্য সাধারনভাবে অনুমোদন দিবে।"

"আমার ধারনা পরিদর্শন সু-সম্পন্ন করার জন্য কাউকে নিশ্চয়ই ঘুষ দিতে হবে, তাই না?" আমি বললাম।

বেদি হাসলো। "তুমি দ্রুতই শিখছ। অবশ্যই দিতে হবে। প্রত্যেক পরিদর্শককে একটা করে মোটা খাম। যাহোক, এখন আপাতত পরিদর্শনের একটা দিন ধার্য করার জন্য আগে টাকা দিতে হবে। আগের কাজ আগে।"

আমার ভ্রু নেচে উঠল। "মজা করছেন, তাই না?" আমি বললাম।

"না, যেকোন সরকারি কাজ করতে, আর বিশেষ করে সেটা যদি শিক্ষার জন্য হয়, তার জন্য ফি দিতে হবে। এর সাথে মানিয়ে চলতে শেখ।" তারপর সে এদেশের একটা জায়গায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যে হাতগুলোয় তেল মারতে হবে, তাদের একটা তালিকা তৈরি করল। ইউজিসি ছাড়াও আমাদেরকে এআইসিটিই অর্থাৎ, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন-এ আবেদন করতে হবে। তারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমোদন দেয়। এছাড়াও, প্রতিটা প্রাইভেট কলেজেরই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হয়। এজন্য, স্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন লাগবে। শুকলাজি'র যোগাযোগ আর একটা মহানুভব খাম এ কাজটা করবে।

"তা না হলে ভাইস চ্যান্সেলর অনেক ঝামেলা করতে পারে," বেদি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলল।

"তো, এই ইউজিসি আর এআইসিটিই পরিদর্শক কারা আসলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সরকারি কলেজ থেকে লেকচারারদের পরিদর্শকদের নিয়োগ দেয়া হয়। আর এটা যেহেতু একটা লোভনীয় পদ, তাদেরকেও ঘুষ দিতে হয়," বেদি বলল।

"কাকে?"

"ইউজিসির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের, অথবা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের কাউকে। যাহোক, এটা তাদের ব্যাপার। আমাদেরকে আমাদের কাজে মনযোগ দিতে হবে। শুকলাজিকে তুমি জানাবে যে এসব কাজের জন্যও টাকা লাগবে।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"ভিএনএন-এর মিটিংয়ের কথা ভুলে যেও না আবার," বেদি বলল। "আর অবশ্যই ব্যাগটার কথাও ভুলে যেও না।"

"আমি ওটার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি পাওয়ার জন্য বসে আছি," বললাম তাকে। "বাসায় এত টাকা রাখা অনেক বিপজ্জনক।"

"চিন্তা কোর না," বেদি বলল। "একবার ভিএনএন মিটিং হলেই সব চলে যাবে।"

সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা শহীদ উদ্যানের উল্টো দিকের বারানশি নগর নিগাম অফিসে পৌছলাম। আমাদের বলা হয়েছিল অফিস সময়ের পরে আসার জন্য। ঘুষ খাওয়ার

জন্য সরকারি কর্মচারিরা ওভারটাইম করতেও রাজি।

"ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। আমি সিনহা," খালি রিসিপশনে একজন লোক আমাদের স্বাগত জানাল। সে আমাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিতে লাগল। আমরা মেরামতহীন বিল্ডিংয়ের দুইতলা সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। সিনহা, ডেপুটি-কর্পোরেটর, শুকলাজি'র এক দশকের বেশি সময় ধরে পরিচিত আর তাকে তার ভাই বলে দাবি করে।

"আমার বড় ভাই যদি বলে, ধরে রাখুন এটা হয়ে গেছে," সিনহা বলল। সে এটা বলল না যে বড় ভাই ছোট ভাইকে ঘুষ দিচ্ছে।

আমি ম্যাপ, জমির দলিল আর আমাদের ফর্মাল আবেদনপত্র বের করলাম। সিনহা সেগুলোর দিকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে লাগল শুধুমাত্র একটা মনরোম "হুম" উচ্চারণ করে।

"জমি রি-জোন করার পরেই আমরা কাজ শুরু করতে পারি," আমি বললাম।

"রি-জোন করা তো বেশ কঠিন," সিনহা বলল। "উপরের অনুমোদন লাগবে।"

"এতে কি রকম সময় লাগবে?" আমি বললাম।

"আপনাকে অনেক কমবয়সী মনে হচ্ছে," সিনহা বলল।

"এক্সকিউজ মি?" আমি বললাম।

"অধৈর্য, তরুণদের প্রথম বোকামি। আপনি একটা কলেজ খুলবেন, তাড়াহুড়ার কি আছে?"

"এমনিতেই কয়েক বছর লেগে যাবে। কিন্তু আমি অনুমোদনগুলো করে ফেলতে চাই," আমি বললাম।

বেদি আমাকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলে সিনহা হেসে উঠল।

"আপনাদের কি বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনও পেতে হবে না?" ডেপুটি-কর্পোরেটর বলল।

"হ্যা," বেদি বলল। "আপনার জুনিয়র অফিসাররা কি সেটা দেখতে পারবে?"

"ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন, সব কিছুই বাড়িতে পাঠাবেন। *সবকিছু*," সিনহা বলল, শেষ কথাটার উপর জোর দিয়ে।

তার কথার মানে আমি বুঝতে পারলাম। মেঝেতে রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগটার উপর হাত চলে গেল।

"এখানে কিছু নিয়ে এসেছি," আমি বললাম।

"অফিসে?" সিনহা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে উঠল। "পাগল হয়েছেন?"

কাজটা শেষ করার জন্য আমরা কতটা উদগ্রিব তা দেখানোর জন্য টাকাটা এখানে নিয়ে এসেছিলাম। অবশ্য আমিও ভাবি নি সে এভাবে ওভার দা কাউন্টার টাকাটা নিতে চাইবে।

"বেদি স্যার, তাকে বলুন কিভাবে কাজ করতে হয়। সে তো সমস্যা পাকিয়ে

ফেলবে," বলে সিনহা আমাদের তার অফিসের বাইরে নিয়ে এল।

ভারি, লাল প্লাস্টিকের ব্যাগটা আমি শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম।

"আচ্ছা, কত এনেছেন এখানে?" আমরা বাইরে আসলে সিনহা জানতে চাইল।

"দশ," আমি বললাম।

"রি-জোন আর বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য নয় নিশ্চয়ই," সিনহা বলল।

"এটা একটা কলেজ, কিছু ছাড় তো দিবেন," আমি বললাম।

"আমি ছাড়ই দিচ্ছি। কিন্তু দশ অনেক কম হয়ে যায়। পনের," সিনহা বলল।

"শুকলাজি'র জন্য কোন ছাড় নেই?" আমি বললাম।

"এটা এমনিতেই আমি যা নিই তার অর্ধেক," সিনহা বলল।

"এগারো?" আমি বললাম। আমি এমনভাবে তার সাথে দর কষাকাষি করছি যেন একটা টি-শার্ট কিনতে এসেছি। অবশ্য টাকার পরিমানটা আমাকে প্রায় অবশ করে দিচ্ছে।

"সাড়ে বারো। হয়ে গেছে! বড় ভাইয়ের সামনে আমাকে লজ্জা দিবেন না," সিনহা বলল।

আমি আর দরদাম করলাম না। বাকি টাকার জোগারপাতি করতে হবে।

"তুমি তো ভালই দরদাম করতে পার," শুকলাজি'র বাড়িতে নামিয়ে দিতে দিতে বেদি বলল।

"তুমি এটা ভাঙবে," কলেজ সাইটের প্রবেশপথে শুকলাজি আমার হাতে একটা নারকেল দিয়ে বলল। তোষামদকারীদের ভীড় আমাদের ঘিড়ে রেখেছে।

ভূমি পূজা উৎসব শেষে কন্সট্রাকশন কাজ শুরু হবে। বিগত তিন মাসে প্রায় দু ডজন অনুমোদনের জন্য অক্লান্ত দৌড়ঝাপ এ দিনটাকে সম্ভব করেছে। ইউজিসি আর এআইসিটিই সাধারণ অনুমোদন অবশেষে পাওয়া গেল। কলেজ চালু হওয়ার আগ মুহূর্তে সর্বশেষ পরিদর্শন হবে। এখন আপাতত কন্সট্রাকশন কাজের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

আর একমাত্র যে জিনিসটা দরকার তা হল প্রভুর দয়া। ভাগ্য ভাল যে তার জন্য কোন ঘুষ দিতে হয় না।

নারকেলটা হাতে ধরে আমি চারপাশে তাকালাম। আরতি এখনো এসে পৌছায় নি।

"করে ফেল, বাছা," শুকলাজি বলল।

তার জন্য আর অপেক্ষা করা যায় না। আমার মনে হল এ দিনটা আমার জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য ততটা নয়।

ফলটা ভেঙে ফেললাম, কল্পনা করলাম রাঘবের মাথার উপরে। এটা ফেটে গেলে

খোসার একটা ধারাল অংশে আমার আঙুল কেটে গেল। চারপাশের লোকজন হাততালি দিয়ে উঠল। কেটে যাওয়া আঙুলটা মুখে নিয়ে কাটা অংশটা চুষতে লাগলাম।

"গঙ্গাটেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ"- দুজন শ্রমিক একটা ধাতব হোর্ডিং কর্দমাক্ত মাটিতে লাগিয়ে দিল। আমার আরো আবেগাপ্লুত হওয়ার কথা ছিল। শত হোক, কয়েক মাস ধরে আমি গাধার খাটুনি খেটে গিয়েছি। কিন্তু আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। সম্ভবত এর কারণ, আমি জানি আজকের দিনটায় পৌছানোর জন্য সর্বমোট কত ঘুষ দিতে হয়েছে। বাহাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার চারশ' রুপি দিতে হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে কন্সট্রাকশন সাইটের শ্রমিক নিয়োগ অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত সবকিছু করতে।

শুকলাজি একশ'র বেশি লোক আমন্ত্রণ করেছেন, যাদের মধ্যে প্রেসের লোকও আছে। একজন ক্যাটেরার ছোট সাদা বাক্সে করে গরম সমুচা আর জিলাপি দিয়ে যাচ্ছে।

শুকলাজি একটা অস্থায়ী মঞ্চ থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করল।

"তিনটা মাত্র বছর, আর এ স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে। এটা আমার শহরেব জন্য একটা উপহার, যা সর্বোত্তম হওয়ার দাবি রাখে," সে বলল।

আমি প্রথম সারিতে বসে আছি। বার বার পেছনে ঘুরে দেখতে লাগলাম আরতি এসেছে কিনা। শুকলাজি'র বক্তৃতা শেষ হলে প্রেস থেকে প্রশ্ন করতে লাগল। বেশিরভাগই সাধারন, বেশিরভাগই কি সব কোর্স চালু করা হবে আর কলেজের সুযোগ সুবিধা কি থাকবে তা সম্পর্কিত। কিন্তু অল্প কিছু সাংবাদিক তাকে ছেড়ে দিল না।

"শুকলা স্যার, আপনি কি এ কলেজের মালিক? আপনার অংশ কতটুকু এখানে?" একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল।

"আমি একজন ট্রাস্টি। আমার কোন অংশ নেই এখানে। এটা একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান," শুকলাজি বলল।

"জমি আর কন্সট্রাকশনের জন্য ফান্ড দিচ্ছে কে?"

"মিঃ গোপাল মিশ্রার জমি এটা। আমি তরুণদের উৎসাহ দিতে চাই তাই তাকে ফান্ড গঠন করতে কিছু সাহায্য করেছি," বলে শুকলাজি রুমাল দিয়ে তার কপাল মুছল।

"কোথা থেকে?" সাংবাদিক বলে যেতে থাকল।

"বিভিন্ন দাতাসংস্থা থেকে। চিন্তা করবেন না, কেউ টাকা দিয়েছে, নেয় নি। মিডিয়া বর্তমানে অনেক সন্দেহপ্রবণ দেখছি," শুকলাজি বলল।

"স্যার, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান স্কিমের কি হচ্ছে? আপনার নাম সেখানে আছে," শেষ সারি থেকে একজন সাংবাদিক বলল।

"এটা একটা পুরনো আর মৃত ঘটনা। কোন কেলেংকারি নেই এখানে। নদী

পরিষ্কারের জন্য আমরা টাকাটা খরচ করেছি," শুকলাজি বলল।

নতুন বিষয়টা সাংবাদিকদের নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করল। সবাই প্রশ্ন করার জন্য হুড়োহুড়ি করে হাত তুলল।

"আর কোন প্রশ্ন না, সবাইকে ধন্যবাদ," শুকলাজি বলল।

সে চলে যেতে লাগলে সাংবাদিকরা তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল। আমি পেছনে থাকলাম, গেস্টরা ঠিকভাবে আপ্যায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।

ইট, রড আর অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে একটা ট্রাক এসে পৌছাল। ওটার পেছনে একটা লাল লাইটের সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

আমাকে খুঁজে পেয়ে আরতি গাড়ি থেকে নামল। "আমি খুবই খুবই সরি," সে বলল। "পূজা কি শেষ?"

"আরতি ছাড়া কি পূজা কখনো শেষ হতে পারে?"

অধ্যায় ১৮

বারানশি
তিন বছর পরে

মিউজিকের শব্দ আর মানুষের কোলাহলে আমার আগমন কারো চোখেই পড়ল না। হাই-ক্লাস পার্টি আমাকে নার্ভাস করে ফেলে। আর আমি ইচ্ছে করলেই রাঘবের গ্র্যাজুয়েশন শেষের পার্টিতে না এসে পারতাম। কিন্তু আমি নিজেকে ঈর্ষান্বিত প্রমাণ করতে চাই না বলেই এলাম।

আমি মোটেও ঈর্ষান্বিত নই। আমার কলেজ, গঙ্গাটেক তিনমাসের মধ্যেই চালু হতে যাচ্ছে। তিন বছরের রাত-দিন পরিশ্রম শেষে আমার কলেজ বিল্ডিং এখন প্রস্তুত। আর এখন আমাকে ফ্যাকাল্টি ইন্টারভিউ আর এআইসিটিই পরিদর্শনের দিন নিয়ে ভাবতে হবে। যখন আমি নিজেই ডিগ্রি ইস্যু করতে যাচ্ছি তখন একটা বিএইচইউ ডিগ্রি তেমন বড় কিছু না।

"হেই!" রাঘব হালকা মাতাল কণ্ঠে বলল। "দোস্ত, তুই কোথায় ছিলি?"

"কম্পিউটার সাপ্লাইয়ারের সাথে চুক্তি করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল," আমি বললাম।

রাঘব মনে হল শুনতেই পেল না।

"আমার কলেজের জন্য। আমরা একটা কম্পিউটার সেন্টার চালু করছি," আমি বললাম।

রাঘব তার হাত উপরে তুলল। "দারুন শো হচ্ছে। হাই-ফাইভ কর!"

সে আমার হাতে এত জোরে আঘাত করল যে আমি ব্যথা পেলাম।

"তোর ড্রিংকস দরকার," রাঘব বলল। "বার ওদিকে।"

সে ডায়নিং টেবিলের দিকে দেখাল, ওখানে বিয়ার, রাম আর কোক রাখা। সবাই প্লাস্টিকের গ্লাসে তাদের ড্রিংকস নিচ্ছে। রাঘবের বাবা-মা আজ রাতে তাদের আত্মীয়ের বাসায় থাকতে রাজি হয়েছেন যাতে রাঘব আর তার কলেজের বন্ধুরা ভোগবিলাসে রাতটা কাটাতে পারে।

আমি রাঘবের বন্ধুদের দিকে তাকালাম। গোটা ত্রিশেক ছেলে, যাদের বেশিরভাগই চশমা আর পুরনো টি-শার্ট পরা, চাকরির অফারের ব্যাপারে হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে। আর তিনটা মেয়ে, যাদের ফ্যাশনের ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই–ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেয়ে বোঝাই যাচ্ছে।

আমি আমার জন্য রাম আর কোক নিলাম। ডায়নিং টেবিলে বরফ নেই, তাই

রান্নাঘরের দিকে গেলাম। লম্বা চুলের একটা মেয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিরাট একটা চকলেট কেকের ওপর মোমবাতি সাজাচ্ছে। কেকের উপরে গিয়ারের মত ডিজাইন করা আর সাদা রঙের বাদামি দিয়ে লেখা "হ্যাপি গ্র্যাজুয়েশন।"

"গোপাল!" আমাকে ফ্রিজ থেকে বের করা আইস-ট্রে নিয়ে একপ্রকার যুদ্ধ করতে দেখে আরতি বলে উঠল।

তার কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠলাম।

"প্রায়," আরতি বলল, "এক বছর তো হবেই?"

আমি তার সাথে যোগাযোগ রাখি নি। "হাই," আমি বললাম।

আসলে বিষয়টা এমন না যে আমি তাকে কৌশলে এড়াতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ রাখার কোন ভাল দিক আমার চোখে পড়ে নি। তার কাছ থেকে তার বয়ফ্রেন্ডের কাহিনী শোনার চেয়ে শ্রমিকদের সাথে চেচামেচি করাতেও লাভ বেশি। আমি তার কল তেমন ধরতাম না আর এভাবেই সে-ও আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়।

"হ্যা, সরি, আসলে আমারই দোষ," বললাম তাকে। "কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম।"

সে আমার কাছ থেকে আইস-ট্রে নিল, একটু মোচড় দিতেই বরফের টুকরা আলগা হয়ে গেল আর দুটো টুকরা আমার গ্লাসে দিল।

"আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা চাচ্ছি না। বুঝতে পারছি আমি আর তোমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না এখন।"

"মোটেও না। আমাকে আমার সাইট দেখতে হয়, আর তোমার তো রাঘব আছেই," বললাম তাকে। "আমাদের নিজেদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় আর..."

"আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। তাই বলে এটাই আমার পুরো জীবন না, ঠিক আছে?" আরতি বলল।

"আচ্ছা, কিন্তু সে তো সেরকমই, তাই না?"

আমি তাকে আমার ড্রিংক অফার করলাম, সে নিল না। সে আবার কেক সাজাতে লাগল।

"আসলে সে-রকম না। কোন মানুষই অতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।"

"কেন?" আমি বললাম। "কোন সমস্যা?"

"না, না," সে বলল, আমার মনে হল খুব তাড়াতাড়িই বলল। "এটা তো দারুণ। রাঘবের গ্র্যাজুয়েশন শেষ হল। সে ইনফোসিস থেকে চাকরির অফার পেয়েছে। আমার এভিয়েশন কোর্সও শেষের দিকে। এটা সবসময়ের মতই চমৎকার চলছে।"

"কোনটা?" আমি বললাম।

"আমরা।"

"আমরা মানে?"

"আমি আর রাঘব," সে বলল।

"ওহ্ হ্যা, অবশ্যই," আমি বললাম।

সে রাঘবের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেকটা তুলল।

"আমি এখন থেকে যোগাযোগ রাখব।"

"তাহলে তো ভালই হয়। কয়েক বছর ধরে আমি নৌকায় চড়ি নি," বলে সে হাসলো।

এটাই, গোলমেলে, বিভ্রান্তিকর আরতি আবার ফিরে এসেছে। সে কি বোঝাতে চেয়েছে? সে কি নৌকা ভ্রমণগুলো মিস করে? আমার সাথে কাটানো সময়কে মিস করে? সে কি ইচ্ছে করেই আমাকে বিভ্রান্ত করছে, নাকি সে রসিকতা করছে? আমি এসব ভাবনায় ডুবে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।

সবাই রাঘবকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে তার হাতে একটা ছুরি ধরে রেখেছে। আরতি ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে। রাঘব কেকটা কাটল। সবাই একসাথে তালি দিয়ে উঠল আর পেঁচার মত ডেকে উঠল। কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাওয়া নিশ্চয়ই একটা বড় ব্যাপার হবে। রাঘব প্রথম টুকরোটা আরতিকে খাইয়ে দিল। আরতিও রাঘবকে খাইয়ে দিতে চাইল।

রাঘব মুখ খুলতেই আরতি কেকটা তার সারা মুখে মাখিয়ে দিল। সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল আর আরো জোরে তালি দিতে লাগল। আমি এখানে থাকার কোন মানেই খুঁজে পেলাম না। *কি বালটা করছি আমি এখানে? এরা আমাকে আসতেই বা বলল কেন?*

"ভাষণ! ভাষণ!" সবাই রাঘবের কাছে ভাষণ দাবি করল। আরতি একটা টিস্যু নিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল।

"তো, বন্ধুরা, আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে সবাইকে অভিনন্দন," রাঘব বলল। "আমরা আমাদের জীবনের চমৎকার সময়গুলো একসাথে কাটিয়েছি। আর আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের হৃদয়ে আমাদের ক্যাম্পাসের জন্য একটা বিশেষ জায়গা থাকবে সবসময়।"

"আমরা এখনো একসাথেই থাকব, দোস্ত," চশমা পরা একটা ছেলে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "ইনফোসিস-এ।"

সাতজন ছেলে তাদের গ্লাস ওপরে তুলে ধরল। তারা সবাই এ সফটওয়্যার কম্পানি থেকে অফার পেয়েছে।

"চিয়ার্স!" তারা বলল।

রাঘব চুপ করে থাকল। "আসলে আমার একটা ঘোষণা আছে," সে বলল। "আমি আসলে এ চাকারিটা করব না।"

"কি?!" সবাই একসাথে বিস্মিত হল।

"হ্যা, আমি এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি," বলে রাঘব এক হাত দিয়ে

আরতিকে জড়িয়ে ধরল। "আমার ভালবাসার কাছাকাছি।"

"হ্যা, ঠিক," রাঘবের মুখে লেগে থাকা মাখন মুছিয়ে দিতে দিতে অর্তি বলল। "আসল কারণটা বল।"

"এটাই আসল কারন," রাঘব মুচকি হেসে বলল।

"না," আরতি সবার দিকে তাকিয়ে বলল। "মিঃ রাঘব কাশ্যপ দৈনিকে সাংবাদিক হিসেবে যোগদানের জন্য এখানে থেকে যাচ্ছে।"

সবার মাঝেই বিস্ময়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। রাঘব কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছে, সংবাদপত্রে ইন্টার্নশিপও করেছে। তাই বলে সে সাংবাদিক হওয়ার জন্য ইনফোসিসকে বাদ দেয়ার সাহস রাখে এটা খুব কম মানুষের জানা ছিল।

রাঘব তার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে লাগলে আরতি কেকটা সবার জন্য কাটতে লাগল। মিউজিকের শব্দ আবারো বেড়ে গেল। আমি আরো ড্রিংকস নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকলাম, ভাবছি চলে যাব কিনা।

আরতি কাগজের প্লেটে আমাকে কেক সাধল। আমি নিলাম না।

"তো, তোমার কলেজ চালু হচ্ছে কবে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"তিন মাসের মধ্যেই গঙ্গাটেকে ভর্তি করা শুরু হবে," আমি বললাম।

"তাই নাকি? আমি ভর্তি হতে পারব?" সে হেসে বলল।

"তুমি চাইলে আমি তোমাকে এমনিতেই একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিব, ক্লাস করতে হবে না," আমি বললাম।

"তাই নাকি?" সে আঙুল নেড়ে বলল। "তাহলে আমাকে রাঘবের মত ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা সার্টিফিকেট দাও। তবে নাম্বার রাঘবের থেকে বেশি দিবে।"

"অবশ্যই দিব," আমি বললাম।

সে আরো বেশি করে হাসতে লাগল। গত চার বছরে আমি তার থেকে দূরে সরে যাবার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার একটা হাসি চার বছরের এ চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিল। হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে আমরা কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিলাম না।

আমাকে যেতে হবে। "আমি বরং যাই," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

"কেন?" সে বলল। "তুমি তো এইমাত্র এলে।"

"আমি আসলে এখানে খাপ খাই না।"

"ঠিক আছে। আমিও ওদের তেমন চিনি না। সবাই নিরস ইঞ্জিনিয়ার। চল বেলকনিতে যাই।"

আমরা রাঘবের বেলকনিতে বসলাম। আমি গ্লাসে একটা ছোট চুমুক দিলাম। বাতাসের একটা ঝাপটায় আরতির চুল আমার মুখে এসে পড়তেই নড়েচড়ে একটু দূরে গিয়ে বসলাম।

"এভিয়েশন একাডেমিতে কি তোমার কোর্স শেষ হয়েছে?" আমি বললাম।

"হ্যা, দু-মাস আগেই ফ্রাংকফিন শেষ হয়েছে। এখন আমি এয়ারলাইনগুলোতে অ্যাপ্লাই করছি। দেখা যাক কোথা থেকে ইন্টারভিউ ডাক পাই," সে বলল।

"বারানশিতে তো কোন এয়ারলাইন নেই।"

"হ্যা, আমাকে দিল্লী অথবা মুম্বাই যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোরে অবশ্য ছোটখাট একটা এয়ারলাইন আছে। দেখা যাক।"

"কি দেখা যাবে?" আমি বললাম।

"কোথায় চাকরি পাই। অবশ্য বিষয়টা একটু জটিল, রাঘব যেহেতু এখানেই থাকছে।"

"সে তো অন্য শহরেও সাংবাদিকতা করতে পারে," আমি বললাম।

"তা পারে," বলে সে তার চুল কানের পেছনে সরাল। "কিন্তু সে বারানশিতেই থাকতে চায়। সে এখানকার সবকিছু সম্পর্কে জানে। তোমার ড্রিংক কেমন হয়েছে? আমি কি একটু খেতে পারি?"

আমি তাকে আমার গ্লাস দিলাম। "দৈনিকে কাজ করলে সে কি রকম বেতন পাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। রাঘব কত টাকা উপার্জন করবে তা আমার জানা বিশেষভাবে দরকার।

সে কয়েক চুমুক খেয়ে গ্লাসটা তার পাশেই রাখল। "ইনফোসিস থেকে যা পেত তার তিনভাগের একভাগ," সে বলল।

"কি বল? আর তার বাবা-মা এতে রাজি হয়ে গেল?"

"মোটেও না!" এটা বলতেই তাদের সাথে রাঘবের প্রায় যুদ্ধ লেগে গেল। "এটা শুধুমাত্র টাকার ব্যাপার না, সে তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটা জলে ফেলে দিচ্ছে। তারা এখনো নারাজ।"

"তো?"

"তো আর কি? তার এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। সে মনে করে বিপ্লব ঘর থেকেই শুরু হয়। একটা পরিবারের আদর্শের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়।"

"বিপ্লব?" আমি বললাম।

"ওহ্, হ্যা, সে এখনো ওসব নিয়েই আছে। ইন্ডিয়ার মহাবিপ্লব। অপস, তোমার ড্রিংক শেষ করে ফেলেছি। আমি অনেক সরি," বলে সে দোষ স্বীকারস্বরূপ আমার হাত ধরল।

"এটা কোন ব্যাপার না। আমি প্রয়োজনে আবার নিব। কিন্তু তুমি কি তার পছন্দের ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট?"

"অবশ্যই, আমি বিশ্বাস করি সবারই উচিৎ তাদের প্যাশন অনুসরন করা। আমি কি আমার প্যাশন নিয়ে কাজ করছি না? যদিও এয়ার হোস্টেস আর বিপ্লব এক জিনিস না, তবুও করছি তো, তাই না?"

"আসলে বিপ্লব বিষয়টা কি একটু বলবে?" আমি একটু ঝাঁঝাল স্বরে বললাম।

"আচ্ছা, রাঘব বিশ্বাস করে ইন্ডিয়াতে একদিন সাধারন মানুষের বিপ্লব হবে, এটাই তার বিষয়।"

"কেন?"

"তাকে জিজ্ঞেস কর, সে তোমাকে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে। দাঁড়াও, আমি কিছু ড্রিংকস্ নিয়ে আসি।"

সে ভেতরে গেল, আমি বেলকনিতে বসে থাকলাম। ভেতরের সফটওয়্যারগুলোর কাছে যেতে একদমই মন চাইছে না। আমি ভাবতে লাগলাম একদিন আমার কলেজের ছাত্ররা চাকরি পাবে। বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কখনো গঙ্গাটেক ভিজিট করতে আসে কিনা কে জানে? যাহোক, আগে ভর্তি শুরু করতে হবে।

সে একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল। ট্রেতে দুটো ড্রিংকস, আর একটা প্লেটে স্যান্ডউইচ, কেক আর চিপস।

"আমার ধারণা তোমার ক্ষুধা লেগেছে," সে বলল। আরতি একদমই যত্নশীল মায়েদের মত আচরন করে।

"থ্যাঙ্কস," গ্লাস নিতে নিতে আমি বললাম।

"এখন বল, আমাকে একদম ভুলে যাওয়ার কারণ কি?" আরতি বলল।

"কে বলল তোমাকে ভুলে গিয়েছি?" আমি বললাম। আরতির সাথে চোখাচোখি হতেই আমি বিব্রত হয়ে গেলাম। প্রায় তিনটা বাজে সেকেন্ড কাটল। আমিই প্রথমে চোখের পলক ফেললাম।

"আমার একটা মোবাইল ফোন আছে এখন। তুমি কি নাম্বার নিবে?" সে বলল।

"অবশ্যই," আমি বললাম। শুকলাজি আমাকে একটা মোবাইল ফোন দিয়েছেন। আমরা নাম্বার আদান-প্রদান করলাম।

"আমি তোমার কলেজ মাঝেমধ্যে দেখে আসব," সে বলল।

"আগে চালু হোক। তখন একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব," আমি বললাম।

"আচ্ছা, কলেজটাই কি তোমার প্যাশন?" সে বলল।

"আমি জানি না। জীবন আমাকে যতগুলো সুযোগ দিয়েছে তারমধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল।"

"তুমি কি কখনো কিছুর জন্য প্যাশনেট মানে একান্ত আগ্রহ অনুভব করেছ, গোপাল? এটা একটা অসাধারন অনুভূতি," আরতি বলল।

আমি চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আমার প্যাশনের দিকে।

"করেছ কখনো?" সে বলল।

"টাকা, আমি অনেক টাকা উপার্জন করতে চাই।"

সে তার হাত বাতাসে ছুড়ল। "ওহ, কাম অন," আরতি বলল, "এটা আগ্রহ না, উচ্চাভিলাষ।"

"আমি জানি না, চল ভেতরে যাই।" আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি চাই না রাঘব আমাদের এখানে দেখুক।

"এখানেই থাক," সে মিষ্টি করে বলে আমাকে হাত ধরে টেনে বসাল। "কতদিন ধরে আমাদের দেখা নেই। তোমার কি অবস্থা? গার্লফ্রেন্ড আছে তোমার?"

আমি মাথা নেড়ে না জানালাম।

"তোমার থাকা উচিত। ভালবাসার একটা অসাধারণ অনুভূতি আছে। যেটা প্যাশন থেকেও কখনো কখনো দারুন অনুভূতি," সে বলল।

"ভালবাসার অসাধারণ অনুভূতি পাওয়ার জন্য অপরপক্ষেরও ভালবাসা পাওয়া লাগে," আমি বললাম। বলার সাথে সাথেই আমার অনুশোচনা হল এটা বলার জন্য।

"আউচ, মর্মমূলে আঘাত।"

"আমি সরি," বললাম তাকে।

"সেটা অনেক আগের কথা। আর রাঘব আর আমি যথেষ্ট সুখি। অনেক সুখি।"

"আমরা কি ভেতরে যাব?" আমি বললাম।

"তুমি যদি চাও," আরতি বলল। "তুমি অনেক সুন্দর কাউকে পাবে, গোপাল।"

"আমার কাউকে দরকার নেই," বলে আমি অন্যদিকে তাকালাম।

আমার চিবুক ধরে সে আমার মুখ তার দিকে ফেরাল। "তুমি একটা কলেজের মালিক হবে। আর আমি ভাগ্যবতী হলে একজন এয়ার হোস্টেস হয়ে চিপস্ বিলি করব। তুমি এরচেয়ে অনেক ভাল কাউকে পাবে।"

"তোমার চেয়ে ভাল কেউ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অবশ্যই," সে বলল।

"সেটা সম্ভব না, আরতি," আমি বললাম। তার উত্তর দেয়ার আগেই আমি উঠে পার্টিতে চলে এলাম।

রাঘবের কাছে গিয়ে বললাম আমাকে একজন কন্ট্রাক্টরের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। সে তাতে তেমন কিছু মনে করল বলে মনে হল না। আমি তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আরতি বেরিয়ে এল। "গোপাল!"

আমি সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালাম। "কি হয়েছে?"

"দয়া করে তুমি এটা বলবে না তো যে তুমি এখনো আমাকে পছন্দ কর?"

আমি অনেক কষ্টে ঢোক গিললাম। "একদমই না," কোনরকমে বলে আমি প্রায় দৌড়ে বাইরে চলে এলাম।

অধ্যায় ১৯

"আপনাদের বিরতি আর কতক্ষণ?" আমি চিৎকার করে বললাম। মূল ক্যাম্পাস বিল্ডিংয়ের পাশে বট গাছের নিচে একদল শ্রমিক বসে আছে। "এখন আড়াইটা বাজে, লাঞ্চের সময় একঘণ্টা আগে শেষ হয়েছে।"

চূড়ান্ত এআইসিটিই পরিদর্শনের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। ক্লাসরুমগুলোতে শেষবারের মত রঙের আঁচড় দিতে হবে। আর শ্রমিকদের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

"আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে সাহেব," বিছানো খবরের কাগজ ভাঁজ করতে করতে একজন শ্রমিক বলল। সে একটা জীর্ণশীর্ণ স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো ট্রাউজার পরে আছে যেগুলোর মধ্যে ক্রিম রঙের বন্যা বয়ে গিয়েছে।

"ইন্সপেক্টর আমাদের উপর খুশি না হলে কিন্তু কলেজ খোলা যাবে না," আমি বললাম।

"আপনার কলেজে না বলবে এমন কে আছে?" শ্রমিকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

অন্যান্য শ্রমিশ্রা তাদের পাগড়ী শক্ত করে বেধে নিল। তারা তাদের ব্রাশ হাতে নিয়ে ক্লাসরুমে চলে গেল। আমি বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলাম, প্রতিদিন এদেরকে প্রতি দু-ঘণ্টা পরপর ঝাড়ি মারতে মারতে বিরক্ত হয়ে। শ্রমিকদের ফেলে যাওয়া খবরের কাগজের দিকে চোখ গেল আমার। একটা হেডলাইনে আমার চোখ আঁটকে গেল: "বারানশিতে আরও কলেজ দরকার।"

আমি কাগজটা হাতে তুলে নিলাম। হেডলাইনের নিচে সাংবাদিকের নাম লেখা–রাঘব কাশ্যপ।

আর্টিকেলে বলা হয়েছে কিভাবে বারানশির তরুণদের সংখ্যা গত দশ বছরে বেড়ে উঠেছে কিন্তু চাহিদার সাথে সাথে কলেজের সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়ে নি। এখানে সরকার কিভাবে শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ সঙ্কটের সমাধান করতে পারে সে বিষয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি সে এ-ও বলেছে, সরকার প্রাইভেট কলেজে কিছু ন্যায়সঙ্গত লাভের সুযোগ করে দিতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীরা এ দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এ সেক্টরের মান বৃদ্ধি পায়। রাঘব লিখলেও, আমার কাছে আর্টিকেলটা দারুণ লাগল। এটা আমার ব্যবসার জন্য শুভ লক্ষণ।

আর্টিকেলে আলাদা একটা বাক্স আছে যেখানে বারানশিতে নির্মিতব্য কলেজগুলোর নাম দেয়া আছে। এখানে মোট পাঁচটা নাম আছে, গঙ্গাটেকের নাম আমার দৃষ্টিগোচর হল।

"ওয়াও," আনন্দে নিজে নিজেই বলে উঠলাম। আমি কখনো ছাপা অক্ষরে গঙ্গাটেকের নাম দেখি নি। শুকলাজি'র নাম্বারে ফোন করলাম।

"চমৎকার!" শুকলাজি বলল। "ধৈর্য ধর, কলেজ চালুর দিন কতগুলো প্রেস আসে দেখো।"

আমি রাঘবকে কল করে বলতে চাইলাম আমার কলেজ সম্পর্কে একটা বিস্তারিত অর্টিকেল ছাপানোর জন্য। একটা স্বনামধন্য পত্রিকায় গঙ্গাটেকের নাম ছাপা হলে তা আমাদের জন্য বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

রাঘবের ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই। তবে আরতির কাছ থেকে সহজেই তা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আরতিকে কল করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি খবরের কাগজটা ক্যাম্পাস বিল্ডিংয়ে নিয়ে গেলাম। আমার অফিসে এখনো তেমন ফার্নিচার নেই। একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসতে বসতে আমার মনে পড়ল কাঠমিস্ত্রিকে খবর দিতে হবে।

আমি আমার ফোন কন্টাক্টস্‌গুলোর দিকে তাকালাম। আরতির নাম সবসময়ই প্রথমে থাকে যেহেতু তার নামের শুরু 'A' দিয়ে।

"আমি শুধুমাত্র রাঘবের নাম্বারের জন্য কল করছি," তাকে কল করার সাহস যোগানোর আগে বহুবার এ কথাটা নিজেকে বললাম।

চার বার রিং হওয়ার পরে সে ফোন ধরল। "হেই, কি সৌভাগ্য আমার," সে বলল।

"হাই, কেমন আছ তুমি?" আমি বললাম। তার সাথে সৌজন্য বিনিময় করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। কিন্তু শুরুতেই প্রশ্ন করাটা অমার্জিত দেখায়।

"মন একটু খারাপ, তবে ভালই আছি," সে বলল। "তুমি কেমন আছ? পার্টিতে তোমার সাথে কথা বলে খুবই ভাল লেগেছে।"

আমার ধারণা আমার উচিৎ তাকে প্রশ্ন করা কেন তার মন খারাপ। কিন্তু আমি সেটা পাশ কাটিয়ে গেলাম। "হুম, শোন, তোমার কাছে কি রাঘবের নাম্বার আছে?" আমি বললাম।

"অবশ্যই আছে। কিন্তু তোমার সেটা হঠাৎ দরকার হল কেন?"

"তার লেখা একটা আর্টিকেল পড়লাম আজ পত্রিকায়, শিক্ষা বিষয়ক। আমার কাছে ওটা ভাল লেগেছে, তাকে বলতে ইচ্ছে হল।"

"হ্যা, অবশ্যই," সে বলল। "সে নিশ্চয়ই খুশি হবে।" আমাকে নাম্বারটা বলল আরতি।

"থ্যংকস আরতি," আমি বললাম। "পরে কথা বলব, ঠিক আছে?"

"তুমি জানতে চাও না কেন আমার মন খারাপ?" সে বলল।

যখন একটা মেয়ে এ কথা বলে, তখন হ্যা বলা ছাড়া আর কোন উপায় আছে? "হ্যা, চাই তো। কেন, কি হয়েছে?" আমি বললাম।

"আম্মু-আব্বু আমাকে বারানশি ছেড়ে যেতে দিবে না," সে বলল।

"তাই নাকি? তাহলে তুমি এয়ার লাইনে যাবে কিভাবে?" আমি বললাম।

"তাই তো। আমি এখানে থেকে কি করব? নৌকা হোস্টেস হব?"

"তাদেরকে বোঝাও," আমি বললাম, এরচেয়ে ভাল কিছু মাথায় এল না।

"তারা বুঝবে না। আমি বরং বাসা থেকে পালিয়ে যাব।"

"পাগল হয়েছ? তারা হয়ত শুনতে পাবে," আমি বললাম।

"তুমি কি তাদের সাথে একটু কথা বলবে?" সে বলল।

"আমি?"

"হ্যা, সমস্যা কি?"

"আমি কে? রাঘব নিশ্চয়ই আমার থেকে ভাল হবে, তাই না?" আমি বললাম।

"রাঘব? সেও তো আমাকে যেতে দিতে চায় না। তাছাড়া সে খবরের কাগজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমার সাথে দেখা করার সময়ই পায় না, আব্বু-আম্মুর কথা দূরে থাকুক।"

"তোমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব আছে না? এভিয়েশন একাডেমি থেকে কেউ কি পারে না?" আমি বললাম। "অথবা ফ্যাকাল্টিদের কেউ?"

"তুমি কথা বলতে চাও না, তাই না?" সে বলল।

"না, আমি আসলে... আমি মনে করি না যে আমি তাদের সাথে কথার বলার জন্য সবচেয়ে যোগ্য লোক।"

"ঠিক আছে," সে বলল। মেয়েদের ভাষায় "ঠিক আছে" মানে "যা ইচ্ছে কর" আর "জাহান্নামে যাও" এ দুটোর মধ্যবর্তী কিছু একটা।

"ঠিক আছে, সাইট ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ডাকছে," আমি মিথ্যা বললাম। "আমি তোমার সাথে পরে কথা বলব।"

ফোন কেটে দিয়ে কল ডিউরেশন দেখলাম আমি। তার সাথে সাত মিনিট বাইশ সেকেন্ড কথা বলেছি। তাকে আবারো কল করতে, আর তার বাবা-মাকে কিভাবে বোঝাবো তা বলতে মন চাইল। *হয়তো আমার উচিৎ ছিল তার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে রাজি হওয়া; শত হোক, এত মানুষ থাকতে সে আমাকেই বেছে নিয়েছে।* আমি রি-ডায়াল বাটনে চাপ দিতে দিতে নিজেকে সামলে নিলাম।

তার কাছাকাছি গেলে শুধু দুঃখই আসবে। সে এখন রাঘবের, তার জীবনে আমার জন্য কোন জায়গা নেই, আমি নিজেকে বললাম।

রাঘবকে কল করলাম। সে তাড়াতাড়িই ফোন ধরল।

"হাই, আমি গোপাল।"

"ওহ্, হাই," সে বলল। "কি খবর, দোস্ত? ঐদিন আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

"তোকেও ধন্যবাদ। তোর চাকরি কেমন চলছে?"

"তারা আমাকে লিখতে দিচ্ছে, যদিও মরা-ধরা বিষয় নিয়ে।"

"আমি তোর আজকের রিপোর্ট পড়েছি। দারুণ হয়েছে।"

"তুই পড়েছিস? ওয়াও, থ্যাংকস।"

"তুই গঙ্গাটেকের কথাও লিখেছিস। সেটার জন্যও ধন্যবাদ।"

"ওহ্, আমাদের রিসার্চ-টিম লিস্টটা করেছে। তোদের তো খোলার সময় হয়ে এসেছে, তাই না?"

"হ্যা, প্রায় সব কিছুই শেষ। তুই কি একটা ভিজিট করবি? হয়তো শুধু গঙ্গাটেক নিয়েই একটা আর্টিকেল লিখার রসদ পেয়ে যাবি।"

"হ্যা, তা অবশ্য পারি," রাঘব বলল, ইতস্তত কণ্ঠে। "যদিও কোন নির্দিষ্ট ইন্সটিটিউট নিয়ে লেখাটা নিয়ম বহির্ভূত।"

"ওহ্, তাহলে বাদ দে," আমি বললাম। আসলে আমি তার কাছ থেকে কোন সহায়তা পেতে চাই না।

"তবে তোকে নিয়ে একটা রিপোর্ট করা যায়।"

"আমাকে নিয়ে?"

"হ্যা, বারানশির এক তরুণ ছেলে কলেজ চালু করছে। এটা একটা বড় বিষয়। সেই ইন্টারভিউতে গঙ্গাটেক নিয়ে লেখা যায়।"

"আমি একজন কর্মচারীর থেকে বেশি কিছু," বললাম তাকে।

"এমএলএ শুকলা আসল মালিক, তাই না?" রাঘব বলল।

"সে একজন ট্রাস্টি, হ্যা।"

"আর সে কলেজ নির্মানের জন্য টাকা দিয়েছে?"

"আসলে সে ফান্ড জোগার করে দিয়েছে," আমি বললাম।

"কোথা থেকে?" রাঘব জিজ্ঞেস করল।

তার তদন্ত-তদন্ত কথাগুলো আমার ভাল লাগল না। "অনেক দানশীল লোকদের সাথে তার জানাশোনা আছে," আমি বললাম। "যাহোক, তুই তাহলে আমার ইন্টারভিউ নিতে চাচ্ছিস? এটাও ভালই হয়।"

"অবশ্যই, আমি নিব। তুই কবে করতে চাচ্ছিস?"

"আগামি শুক্রবারে আমাদের একটা পরিদর্শন আছে। সেটার পরে? উইকএন্ডে হতে পারে," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে। কিন্তু কোথায়? দৈনিক অফিসে?"

"না, চলে আয় আমার অফিসে," শেষের দুটো শব্দের ওপর জোর দিয়ে বললাম। *আমার একটা বিশাল অফিস আছে এখন চান্দু,* বলতে ইচ্ছে হল।

"আচ্ছা ঠিক আছে। তোর ক্যাম্পাস কোথায়?"

"শহরের বাইরে লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের দিকে দশ কিলোমিটার দূরে। ডানে কলেজের বোর্ড দেখতে পাবি।"

আমি ক্যাম্পাস বিল্ডিংয়ের বাইরে বেরিয়ে এলাম। তিন তলা কাঠামোর দিকে তাকালাম। এটাকে ধূসর রং করা হবে।

আমার ফোন বেজে উঠল। বেদি ফোন করেছে।

"জি, বেদি স্যার," আমি বললাম।

"আমি সাতজন স্থায়ী ফ্যাকাল্টি মেম্বার বাছাই করেছি কালকের ইন্টারভিউয়ের

জন্য। আপনি কি ফ্রি আছেন?"

"ফ্রি থাকা ছাড়া তো আমার আর কোন কাজ নেই। আমি সারা দিন সাইটেই পড়ে থাকি, আপনি তাদের এখানে নিয়ে আসবেন?"

"তা সম্ভব না। তাদের বাড়িতে যেতে হবে। আমাদের কাছাকাছি আরও তিনটা কলেজ চালু হতে যাচ্ছে। এরা সবাই তাদের অফার করেছে। আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেখাতে হবে," সে বলল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। প্রতিটা দিন এক একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে।

"ঠিক আছে, আমি শুকলাজি'র অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করব," আমি বললাম।

অশোক নগরে প্রফেসর এম সি শ্রীবাস্তব'র বাড়িতে পৌছতে ঠিক সকাল আটটা বেজে গেল যেরকমটা এনআইটি এলাহাবাদের রিটায়ার্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর ঠিকানা দিয়েছিলেন। ডিন হওয়ার জন্য আইআইটি না হলেও এনআইটি'র কাউকে নিতেই হবে। আমরা এনআইটি ভুপালের একজন রিটায়ার্ড প্রফেসরের সঙ্গে চুক্তি করেই ফেলেছিলাম কিন্তু সে তার বাড়ির কাছে ইন্দোরে আরও একটা ভাল অফার পেয়ে সেখানে চলে গিয়েছে। প্রফেসর শ্রীবাস্তব এআইসিটিই'র গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন, সেই সাথে ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা। স্বর্ণের সবকিছুর মত তার দামও তাই আকাশ ছোয়া।

"মাসে দু'লাখ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "কিন্তু আমরা তো সবেমাত্র শুরু করলাম।"

মিসেস শ্রীবাস্তব, প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী আমাদের চা আর চিড়া দিয়ে বানানো পোহা সকালের নাস্তা হিসেবে দিল। সেও আমাদের আলোচনায় অংশ নিল। "শ্রী আম্মা কলেজ থেকে একটা অফার এসেছে। দেড় লাখ আর ড্রাইভারসহ একটা গাড়ি," সে বলল।

"ম্যাডাম, আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত, তারা আমাদের ফি নির্ধারণ করে," আমি বললাম। "তাছাড়া আমরা নতুন। ভর্তি কেমন হবে সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই।"

"সেটা কি আমাদের বিষয়?" মিসেস শ্রীবাস্তব বলল, আসলে কথা সত্য।

বেদি এই কলহের মধ্যে এসে পড়ল। "আপনার যেসব দাবি আছে বলুন। আমরা ব্যবস্থা করব," সে বলল।

"কিন্তু আমাদের তো একটা বাজেট আছে," আমি বললাম।

শ্রীবাস্তব তার চামচ নামিয়ে রাখলেন। "আপনি কে?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "মালিকের ছেলে?"

"আমিই মালিক, গোপাল মিশ্রা। কলেজ আমার জমির ওপরে," আমি বললাম।

"আর শুকলাজি? তিনি কি প্রতিষ্ঠাতা না?"

"তিনি একজন নিরব ট্রাস্টি," আমি বললাম, "আমিই সিদ্ধান্ত নিই।"

প্রফেসর আমার ঔদ্ধত্য দেখে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"মিঃ মিশ্রা, ডিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক। এআইসিটিই'র লোকজনের সাথে আমার যথেষ্ট জানাশোনা আছে। আমি থাকলে ধরে নিন পরিদর্শন হয়ে গিয়েছে," শ্রীবাস্তব বলল।

"এআইসিটিই'র সাথে আমাদের আগ থেকেই যোগাযোগ আছে," আমি বললাম। "আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি যদি আপনাকে বেশি বেতন দিই, সব ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা তখন বেশি বেশি চাইবে।"

"আমার বেতন তো সবাইকে জানানোর দরকার নেই," সে বলল।

"এটা আমরা কিভাবে গোপন করব? অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে সব তথ্য থাকবেই," আমি বললাম।

"একটা অংশ ক্যাশ পে করুন," শ্রীবাস্তব বলল। টেবিলে নেমে এল নিরবতা। সে একটা সমাধান দেখিয়ে দিয়েছেন। এরচেয়ে বেশি বাস্তবিক জ্ঞানসম্পন্ন ডিন খুঁজে বের করা কঠিন।

"সেটা কত?" আমি বললাম।

"পঞ্চাশ পার্সেন্ট? হয়তো আরও বেশি," সে প্রস্তাব দিল। "এতে আমার ট্যাক্সের জন্যও সুবিধা হয়। আর কেউ আমার উপর ঈর্ষান্বিত হবে না। আসলে এতে করে কাগজপত্রে আমার বেতন অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়েও কম হবে।"

"আমরা জানি আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি," বেদি বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম।

আমরা প্রতি মাসে এক লাখ ক্যাশ আর সত্তর হাজার চেক প্যাকেজে সম্মত হলাম। নতুন ডিন সাথে সাথেই কাজে নেমে পড়ল। সে অন্যান্য ফ্যাকাল্টি নিয়োগ দেয়ার জন্য আমাদের সাহায্যের প্রস্তাব করল, যাদের বেতন হবে ত্রিশ হাজার থেকে আশি হাজার প্রতি মাসে যেটা নির্ভর করবে তাদের অভিজ্ঞতা আর ডিগ্রির ওপর।

"আমি আমার বেতন বাদেই প্রতিটা নিয়োগের জন্য দশ হাজার করে সার্চ ফি নিব।"

"ঠিক আছে। কবে থেকে শুরু করবেন?" আমি বললাম।

"যেকোন সময় থেকেই শুরু করা যায়," সে বলল। "আমি সপ্তাহে তিন দিন ক্যাম্পাসে আসব।"

"তিনদিন? আপনি ইন্সটিটিউটের ডিন। ডিন ছাড়া কলেজ চলবে কিভাবে?"

"আমি ডিন, এজন্যই তিনদিন। ডিন না হলে একদিনই যথেষ্ট ছিল," সে বলল।

"কি?" আমি বিস্মিত হলাম।

"প্রাইভেট কলেজে কোন ফ্যাকাল্টি প্রতিদিন পড়াতে যাবে? চিন্তা করবেন না, আমি এআইসিটিই পরিদর্শকদের বলে দিব আমি প্রতিদিন থাকি।"

"কিন্তু ফ্যাকাল্টিদের ম্যানেজ করবে কে? কে নিশ্চিত করবে যে ক্লাস সময়মত হচ্ছে আর স্টুডেন্টরা সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে?" আমার হৃদপিন্ডের গতি বেড়ে গেল। আমি ভাবতেও পারি না একটা কলেজের ডিন এরকম হতে পারে।

"এটা প্রাইভেট কলেজ। আমরা ম্যানেজ করে নিব। তাকে বলুন বেদিজি, এসব কিভাবে করতে হয়," শ্রীবাস্তব দাঁত বের করে হাসলো।

বেদি তার চায়ের কাপ শেষ করে মাথা নাড়ল। "আমরা অবশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা আর অন্যান্য সব বিষয় পরে দেখব। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিদর্শন, আর তারপরে ভর্তি। পরবর্তীতে সিনিয়র স্টুডেন্টরাও ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস নিতে পারবে। হচ্ছে তো অনেক কলেজে।"

মিসেস শ্রীবাস্তব টেবিল পরিষ্কারে লেগে গেল। আমরা ড্রয়িং রুমে চলে গেলাম।

"ভর্তির জন্য কি কি কৌশল নিচ্ছেন?" শ্রীবাস্তব বলল।

"সবগুলো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশ নিচ্ছি, তাছাড়া স্কুল আর কোচিংগুলোর সাথেও যোগাযোগ রাখছি," আমি বললাম।

"স্কুলের সাথে যোগাযোগ কিসের জন্য?" সে জিজ্ঞেস করল।

"আমরা স্কুলে গিয়ে গিয়ে আমাদের কলেজের ওপর প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করব," আমি বললাম।

"প্রেজেন্টেশন দিয়ে লাভ কি? প্রিন্সিপালদের সাথে চুক্তি করেছেন?" শ্রীবাস্তব বলল।

"আমরা করব, চিন্তা করবেন না," বেদি বলল।

"আমরা কি করব?" আমি বললাম। বেদি আগেভাগে আমাকে কিছু না বললে মেজাজটাই বিগড়ে যায়।

"আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলব। এখন চলুন, আমাদের অন্য মিটিং আছে," বলে বেদি দাঁড়িয়ে গেল। "ধন্যবাদ স্যার, আপনার সাথে শুক্রবার দেখা হচ্ছে।"

শ্রীবাস্তব আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। "আমার প্রথম বেতন কবে পাচ্ছি?"

"আমি ক্যাশ বাড়িতে পাঠিয়ে দিব," বললাম তাকে।

আরও পাঁচজন হবু-ফ্যাকাল্টিদের সাথে দেখা করতে হবে। শুকলাজি কলেজের বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য একটা ইনোভা গাড়ি দিয়েছে। আমরা মোঘল সারাইয়ের দিকে যেতে লাগলাম একজন প্রাক্তন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসরের সাথে দেখা করতে।

"ডিন ঠিক হয়ে যাওয়াতে নিজেকে ভারমুক্ত লাগছে," গাড়ি হাইওয়েতে উঠতে বেদি বলল।

"তাকে আমার কাছে মি: ডিন মনে হয় নি, মি:ডিল মনে হয়েছে," আমি রসিকতা করলাম।

"সে আগেও প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছে। তার যে চাহিদা আছে তা সে ভাল

করেই জানে। তার বদমেজাজিতে মন খারাপ করবেন না," বেদি বলল।

"সে স্কুল প্রিন্সিপালদের সাথে চুক্তি বলতে কি বোঝাল?" আমি বললাম।

"স্টুডেন্টরা স্কুলের পরে কোথায় যাবে তার ওপর স্কুলের একটা বড় প্রভাব আছে। অনেকেই আইআইটি আর এনআইটি'র জন্য চেষ্টা করে কিন্তু বেশিরভাগই চান্স পায় না। তারা কোথায় যায়?"

"কোথায় যায়?" আমি বললাম।

"এখানেই হচ্ছে বিষয়। প্রাইভেট কলেজ হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে আপনি ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন, যদি আপনি ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পান। কিন্তু সমস্যা হল, প্রাইভেট কলেজের তো অভাব নেই। তাহলে তারা কিভাবে বাছাই করবে?"

বাইরের চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে পরাস্ত করতে ড্রাইভারকে বললাম এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে। "কিভাবে?" বললাম আমি।

"তারা তাদের স্কুল টিচার আর প্রিন্সিপালদের উপদেশ মেনে নেয়। এছাড়া কাকে বিশ্বাস করবে তারা?"

"ঠিক," আমি বললাম। "আর তাই আমরা প্রিন্সিপালদের বলব আমাদের কলেজের কথা বলার জন্য?"

"ঠিক তাই! আপনি আসলেই বুদ্ধিমান," বেদি বলল, সম্ভবত ব্যঙ্গ করে।

"তাদেরও কি ঘুষ দিতে হবে?" আমি বললাম।

"হ্যা। কিন্তু এ শব্দটা আর উচ্চারণ করবেন না, বিশেষ করে স্কুল প্রিন্সিপালদের সামনে। যাহোক, এটা একটা সহজ হিসাব। প্রতিটা ভর্তি থেকে আমরা তাদের দশ পার্সেন্ট করে দিই।"

এরকম ব্যাখ্যা করা অঙ্ক শুনে ঘুষের মত লাগে না মোটেই।

"যেকোন কাউকেই দশ পার্সেন্ট দিই–কোচিং সেন্টার, ক্যারিয়ার ফেয়ার আয়োজক অথবা যে কেউ ভর্তিতে সাহায্য করবে।"

"দশ পার্সেন্টের মামলা," আমি বললাম।

"আপনি মিডিয়া প্ল্যান নিয়ে কাজ করছেন নিশ্চয়ই?" সে বলল।

আমার চিন্তার চাকা আমাদের মিডিয়া কৌশলের দিকে গেল, সেখান থেকে রাঘবের দিকে, আর সেখান থেকে আরতির দিকে। অদ্ভুত ব্যাপার, ব্রেইন কিভাবে একটা চিন্তার সাথে আরেকটা চিন্তার সংযোগ ঘটিয়ে চিন্তার চাকা যেখানে যেতে চায় সেখানে সুড়সুড় করে নিয়ে যায়।

বেদি বলে যেতে লাগল কিভাবে আমরা দু'শ সিট ফার্স্ট-ব্যাচে পূরণ করব। আমি বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে রাঘবের বেলকনিতে আমার গ্লাসে চুমুক দেয়ার সময় আরতির উড়ন্ত চুলের কথা ভাবতে লাগলাম। যখন একমাত্র যে মেয়েটির কথা কেউ ভাবে সে অন্য কারো হয়ে যায়, জীবন তখন একটা কুকুরের বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই না।

অধ্যায় ২০

আমার অফিসের জানালা দিয়ে রাঘবকে ক্যাম্পাসে আসাতে দেখলাম। যথাসময়ের মধ্যে অফিসের ডেস্ক আর চেয়ারগুলোকে সুসজ্জিত করার জন্য কাঠমিস্ত্রির সাথে অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করতে হয়েছে। ভিজিটরদের সোফা বাদ দিলে আমার অফিস মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এখন। এয়ার কন্ডিশনার কাজ করছে। আমি তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ঠান্ডা করে দিলাম যাতে রাঘব এটার অস্তিত্ব টের পায়। আমার চারপাশে ফাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলাম। সে এসে আধ-খোলা দরজায় নক করল।

"ইয়েস?" বলে আমি উপরে তাকালাম।

"দুটোয় আসার কথা ছিল, তাই না?" রাঘব বলল। সে একটা সাদা শার্ট আর নীল জিন্স পরেছে।

"হাই রাঘব। সরি, এতটা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে যে সময়ের খোঁজখবর থাকে না মাঝেমধ্যে," আমি বললাম।

সে আমার বিপরীতে বসল। আমি ডিরেক্টরের চেয়ারে বসে আছি। সে কি বুঝতে পারছে আমি তার চেয়ে অনেক মোলায়েম চেয়ারে বসে আছি?

সে তার নোটপ্যাড, কলম আর কিছু প্রিন্টআউট বের করল। "আমি এ কলেজ সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি তার উপর কিছু গবেষণা করেছি।"

"তুই তেমন কিছু পাবি না। আমরা একেবারেই নতুন," আমি বললাম।

"হ্যা, কিন্তু আমি একজন ট্রাস্টি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, শুকলা।"

"অবশ্যই, সে একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। তবে সে কলেজের কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।"

"যদিও সে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথেই সম্পর্কিত," রাঘব প্রশ্ন সম্বলিত প্রিন্টআউটের ভাঁজ সমান করতে করতে বলল।

"চা?" আমি বললাম।

সে মাথা নাড়ল। আমি বেল বাজালাম। পিয়নকে আগেই বলে দিয়েছি স্পেশাল মেহমানদের জন্য যে চায়না-কাপ আছে সেগুলোতে চা নিয়ে আসতে। যদিও রাঘব ততটা স্পেশাল নয়। কিন্তু আমি তাকে জানাতে চাই আমরা এরকম চমৎকার কাপেই চা খাই।

সে বিশ ফিট বাই আঠার ফিটের বিশাল অফিসের দিকে চোখ বোলাল। তাদের খবরের কাগজের কারও এরকম বড় অফিস আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম।

সে আমার পেছনে আর্কিটেক্টের বানানো ক্যাম্পাসের একটা মডেল দেখতে পেল। "আমি কি এটা একটু দেখতে পারি?" জিজ্ঞেস করল সে।

"অবশ্যই," বলে আমি লাফিয়ে উঠলাম। "আয় তোকে আমাদের সুযোগ

সুবিধাগুলো দেখাই।"

আমি তার কাছে ক্যাম্পাস লেআউট ব্যাখ্যা করলাম। "হোস্টেলগুলো এখানে। ব্যাচ বাড়ার সাথে সাথে আমরা রুমের সংখ্যা বাড়াতে থাকব। ক্লাসরুম আর ফ্যাকাল্টি অফিসগুলো এখানে, মেইন বিল্ডিংয়ে আমরা যেখানে আছি এখন। ল্যাবগুলো আলাদা বিল্ডিংয়ে। সব বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতি।"

"ফ্যাকাল্টি অনুপাত কেমন হবে?" রাঘব তড়িঘড়ি করে নোট নিতে নিতে বলল।

"আমাদের টার্গেট হচ্ছে একজন শিক্ষকের জন্য পনেরোজন স্টুডেন্টের বেশি না," আমি বললাম, "যেটা এআইসিটিই নিয়মের থেকেও ভাল। আমরা একদিন বিএইচইউ থেকে ভাল করব আশা করছি।"

সে আমার দিকে তাকাল।

"এটা একটা আশা। এছাড়া কার সাথে তুলনা করব?" আমি বললাম।

সে সমর্থনস্বরূপ কাঁধ ঝাঁকাল।

চা চলে আসল। আমি পিয়নকে বলে রেখেছিলাম কমপক্ষে পাঁচ ধরনের নাস্তা দিতে। সে বাদাম, বিস্কুট, সমুচা, চিপস্ আর ফল নিয়ে এল।

"এটা তো চা না। পুরো দুপুরের খাবার," রাঘব বলল।

"আহ্, নে তো। ইন্টারভিউ পরেও নেয়া যাবে," পিয়ন খাবার রাখতে থাকলে আমি বললাম।

আমরা নিরবে খেতে থাকলাম। কলেজ ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়ে তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি। সে খেতে খেতেই নোটপ্যাড তুলে নিল।

"কলেজে কিরকম খরচ হয়েছে সর্বমোট?" সে বলল।

"অনেক। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো সস্তা না," বলে আমি হাসলাম, টাকার অঙ্ক এড়িয়ে গিয়ে।

"মোট কত হয়েছে নির্দিষ্টভাবে?" সে বলল।

"বলা কঠিন। জমিটা আমার ছিল, কিন্তু এটা কিনতে হলে দামটা কল্পনা করা যেত," আমি বললাম।

"এটা কৃষিজমি না?" সে বলল।

"হ্যা, তোর কি বাবার মামলাটার কথা মনে আছে?"

"তুই তোর আত্মীয়দের কাছ থেকে এটা ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিস?" সে বলল।

"হ্যা, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই ইন্টারভিউতে যাচ্ছে না, তাই না?" আমি বললাম।

"না। কিন্তু এই কৃষিজমি কিভাবে রি-জোন করলি?"

"আমরা আবেদন করেছি, ভিএনএন অনুমোদন করেছে," আমি বললাম।

সে নোট নিতেই থাকল।

"সবকিছুরই অনুমোদন পেয়েছি," আমি আবারো বললাম, সম্ভবত আত্মরক্ষার সুরে।

"শুকলা'র কারনে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না," আমি কিছুটা ইতস্তত করে বললাম। "কারন আমরা নিয়ম মেনে কাজ

করেছি।"

"ঠিক আছে। জমি বাদ দিয়ে আর কত খরচ হয়েছে?" সে বলল।

"আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। এটা মোটের ওপর একটা বর্ধিষ্ণু তথ্য। তবে যে কেউ এ ক্যাম্পাসে আসবে সে বুঝতে পারবে এটা একটা চমৎকার শিল্প নিদর্শন।"

"পাঁচ কোটির বেশি?" সে জোরাজোরি করতে লাগল। তার এ অনুমান অনুমান খেলা বন্ধ করতে হবে।

"হ্যা," আমি বললাম।

"দশ কোটিরও বেশি?" সে বলল।

"আসল সংখ্যাটা কিসের সাথে সম্পর্কিত?" আমি বললাম।

"টাকাটা কোথা থেকে এল?"

"ট্রাস্টি এবং তাদের অ্যাসোসিয়েটদের কাছ থেকে।"

"কার অ্যাসোসিয়েট? তোর নাকি শুকলা'র?" সে বলল।

"আমি জমি দিয়েছি। শুকলাজি ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে, শহরের উন্নয়নের জন্য। আমরা অলাভজনক ট্রাস্ট," বললাম আমি।

"তুই কি জানিস এমএলএ কোথা থেকে ফান্ড জোগার করেছে?" রাঘব তার ডায়রি থেকে উপরে না তাকিয়ে বলল।

"না, আর আমি জানার কোন কারনও দেখি না। এটা তার এবং তার বন্ধুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

"শুকলা'র সঙ্গে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান কেলেংকারির সংযোগ সম্পর্কে কি জানিস?" সে বলল।

"না রাঘব। আমি গঙ্গাটেক ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়ে মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। সব তথ্য জানা হয়ে গেলে আমরা ইন্টারভিউ এখানেই শেষ করতে পারি।"

রাঘব তার কলম সরিয়ে রাখল। "আমি সরি। হ্যা, কাজ শেষ। চিন্তার কিছু নেই। আমি ব্যালেন্স করেই ছাপব।"

"থ্যাঙ্কস, তোকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিব, চল।"

আমরা ক্যাম্পাস গেট পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। সে তার বাবার পুরনো স্কুটার নিয়ে এসেছে।

"আমি আমার গাড়ি পাঠাতে পারতাম তোকে তুলে আনার জন্য," বললাম তাকে। "অনেক গরম।"

"না, ঠিক আছে। আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে," বলে সে হেলমেট মাথায় চাপাল।

"ইঞ্জিনিয়ারিং মিস করছিস?" প্রথম কোন সাধারণ প্রশ্ন করলাম।

"না। আমার ধারণা আমি কখনোই ইঞ্জিনিয়ার হই নি," সে বলল।

এটাই আমার চুড়ান্ত খোঁচা দেয়ার উত্তম সময়। "তুই বিএইচইউ থেকে পাস করেছিস। আমাদের ফ্যাকাল্টি লিস্টে থাকলে চমৎকার হয়। জয়েন করবি?" আমি

বললাম। হ্যা, তাকে নিয়োগ দেয়ার যোগ্যতা আমার আছে। বিএইচইউ আমাকে নেয় নি, কিন্তু আমি তাদের গ্র্যাজুয়েটদের নেয়ার ক্ষমতা রাখি।

"আমি? ফ্যাকাল্টি? অসম্ভব। তাছাড়া আমার চাকরি আছে," বলে সে তার স্কুটারে চেপে বসল।

"তোকে প্রতিদিন আসতে হবে না। পরিদর্শনের সময় থাকতে হবে আর সপ্তাহে একবার আসলেই হবে," আমি বললাম।

সে স্কুটার চালু করতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেল। আমার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে।

"আমরা বেতন ভালই দিব। তোর খবরের কাগজ থেকে হয়তো বেশি," আমি যোগ করলাম।

সে হেসে মাথা দোলাল।

"না, কেন?" তার সহজ প্রত্যাখ্যানে বিরক্ত হয়ে বললাম।

"আমি একটা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পারি না," সে বলল।

"কি?"

"এটা শুকলার কলেজ।"

"এটা আমার," প্রতিবাদ করলাম আমি।

"আমি জানি তুই এটা চালাবি, কিন্তু সবকিছুর পেছনে তো সে, তাই না?"

"তো? আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত কিভাবে বলছিস? এখনো তো শুরুই করতে পারলাম না।"

"এটা দুর্নীতির টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে।"

"আমি আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিন বছর কাজ করেছি রাঘব, তিন বছর, রোববারসহ। এরকম কথা তুই কিভাবে বলিস?"

"গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান থেকে বিশ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে, সরকারের টাকার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের নদী পরিষ্কার রাখা।"

"এটা একটা সন্দেহ, প্রমাণিত সত্য না," আমি বললাম।

"এটার পরপরই সে অনেকগুলো সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করেছে, এ কলেজসহ। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুই দেখেও দেখতে পারছিস না। একজন রাজনীতিবিদ এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে? তার অতীত একদমই সাধারণ।"

"তুই কি অনৈতিকতা প্রমাণ করতে পেরেছিস?" আমি বললাম।

"এখনো না। কিন্তু তুই কি নিশ্চিত সে কিছুই করে নি?" সে প্রশ্ন করল।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। "তুই ঈর্ষা করছিস," আমি বললাম।

"কি?"

"আমার ভাল দেখে তোর ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভাল করার কথা না, তাই না? আমার এআইইইই র‍্যাঙ্ক তোর থেকে পেছনে। তাই না, মিঃ জেইই?"

"শান্ত হ, দোস্ত। পার্সনালি নেয়ার মত বিষয় না এটা," বলে সে তার স্কুটার চালু

করল।

"তাহলে এটা কি, মিঃ রিপোর্টার?"

"সত্য বের করে আনাই আমার চাকরি, অন্য কিছু না।"

আমি উত্তর দেয়ার আগেই সে চলে গেল। আর পেছনে রেখে গেল ধুলার মেঘ যেগুলো আমার চোখে এতটাই বিদ্ধ হল যা এর আগে কখনো হয় নি।

এআইসিটিই পরিদর্শনের দিনটা আমার কাছে একটা পরীক্ষার মতই মনে হল। আমাদের বিশজনের ফ্যাকাল্টি সকাল আটটায় ক্যাম্পাসে পৌছে গেল। সুইপাররা শেষ মিনিট পর্যন্ত ফ্লোর ঘষামাজা করতে লাগল। আইটি স্পেশালিস্টরা নিশ্চিত করল কম্পিউটার রুমের সবগুলো ডেস্কটপ কাজ করছে। আমরা পরিদর্শন কমিটির জন্য একটা ডিনারের আয়োজন করেছি তাজ গঙ্গায়। শুকলাজি আসার প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু শেষ সময়ে তা বাদ দিয়েছে জরুরী গ্রাম ভ্রমণের জন্য। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। আমি পঞ্চমবার ক্যাম্পাস গেটে গেলাম পরিদর্শকরা এসেছে কিনা দেখার জন্য।

"সোজা হয়ে দাঁড়ান," সিকিউরিটি গার্ডকে চেঁচিয়ে বললাম, "আর সব গেস্টকে স্যালুট করবেন।"

"মাথা ঠান্ডা করুন, ডিরেক্টর গোপাল," ডিন শ্রীবাস্তব বলল, "আমি তাদের দেখব।"

"তারা এগারোটা বাজে এল। অশোক শর্মা, আমাদের সবচেয়ে জুনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে মেইন বিল্ডিংয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

পরিদর্শন কমিটির প্রধান আমার সাথে হ্যান্ডশেক করল। "আমি জুল ইয়াদেব, এনআইটি দিল্লীর এক্স-প্রসেসর।"

"আমি গোপাল মিশ্রা, কলেজের উদ্যোক্তা এবং ডিরেক্টর। ইনি ডিন শ্রীবাস্তব, এনআইটি এলাহাবাদের এক্স ডিরেক্টর," আমি বললাম।

ইয়াদেভ আর শ্রীবাস্তব পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল, বক্সারদের মত একজন আরেকজনকে মেপে নিল যেন। আমরা আমার অফিসে গিয়ে নতুন সোফায় বসলাম যেটাতে বার্নিশের গন্ধ লেগে আছে।

"এনআইটি এলাহাবাদ?" ইয়াদেব জিজ্ঞেস করল। "আপনাদের ইলেক্ট্রিক্যালে কি একজন বড়ুয়া ছিল? সে পরে স্ট্যানফোর্ডে গিয়েছে।"

"হ্যা," শ্রীবাস্তব বলল, "আমি তাকে নিয়োগ দিয়েছিলাম।"

"বড়ুয়া আমার ছাত্র ছিল," বলে ইয়াদেব তার ঊরুতে চাপড় দিল।

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমরা কাছের গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছি। প্রতিদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা ইলেক্ট্রিসিটি থাকে না।

"আমাদের জেনারেটর আছে," বলে আমি পিয়নকে সেটা চালু করতে বলতে ছুটে গেলাম।

অফিস রুমটা জঘন্য হয়ে উঠল।

"আমরা কি বাইরে চলে যাব?" পরিদর্শন টিমের একজন মধ্যবয়সী সদস্য বলল।

"একটু অপেক্ষা করুন, স্যার," আমি বললাম। পাওয়ার চলে এলে টিউব লাইট পিট পিট করতে লাগল।

"মেশিনিং ল্যাবে কয়টা লেদ মেশিন আছে?" একজন পরিদর্শক জিজ্ঞেস করল।

"আটটা," শ্রীবাস্তব বলল। "আমরা পরে ঘুরে দেখব।"

"শ্রীবাস্তব স্যার, গরমের মধ্যে হাটাহাটির কি দরকার?" ইয়াদব বলল।

"আপনার টিম মেম্বার একটা প্রশ্ন করেছেন স্যার," শ্রীবাস্তব বলল।

যিনি লেদ মেশিনের প্রশ্ন করেছেন সবাই তার দিকে তাকাল। "আপনি?" শ্রীবাস্তব বলল।

"মিঃ বনসালি," পরিদর্শক বলল।

"মিঃ বনসালি, চলুন আমরা আমার অফিসে গিয়ে কোর্সের বিষয়ে আলোচনা করি। যদি আপনার প্রমোটার দরকার না হয়।"

"আপনাকে অনেক তরুণ মনে হচ্ছে," বনসালি আমাকে বলল।

"আমি তরুণই," বললাম তাকে।

"আপনার যোগ্যতা কি?" সে বলল।

"আমি কলেজটা নির্মান করেছি, আর সর্বোত্তম ফ্যাকাল্টিদের নিয়োগ দিয়েছি।"

"কিন্তু..." বনসাল বলতেই শ্রীবাস্তব তার কথায় বাধা দিলেন।

"চলুন স্যার। আমি সবকিছুর উত্তর দিচ্ছি," বলে শ্রীবাস্তব তাদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন।

সবাই বাইরে গেলে শ্রীবাস্তব আমার অফিসে ফিরে এলেন। "বনসালি নতুন। অন্য ছয়জনের কেউই কোন কথা বলবে না। দুপুরের খাবার আসছে তো, ঠিক?"

"হ্যা, ক্যাটেরার এখন এখানেই আছে," আমি বললাম।

"ভাল। আর প্যাকেটগুলো?"

"প্যাকেট?"

"গোপাল, এটা কি আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে? এরা এআইসিটিই।"

"ওহ," আমি বললাম। "আপনি খামগুলোর কথা বলছেন। অবশ্যই, আমি রেডি রেখেছি।"

"ভাল। ডেজার্টের পরে তাদের ওগুলো দেবেন। কত?"

"ইয়াদবের জন্য দুই, আর বাকি সবার জন্য পঁচিশ করে?" আমি বললাম।

"বনসালের জন্য পঞ্চাশ করে দিন," শ্রীবাস্তব বলল। "ডেজার্টে কি আছে?"

"মুগ ডালের হালুয়া," আমি বললাম।

"আমার পছন্দের!" বলে প্রফেসর শ্রীবাস্তব চলে গেল।

এআইসিটিই পরিদর্শনের ডিনারের জন্য তাজ গঙ্গার একটা প্রাইভেট রুম বুক করে রেখেছিলাম। আমরা আমাদের সব ফ্যাকাল্টি আর উর্ধতন কর্মকতাদের আমন্ত্রণ করেছি যারা অতীতে আমাদের সাহায্য করেছে। তারা তাদের পরিবার নিয়ে এসেছে।

শ'খানেক লোকের একটা পার্টি গঙ্গাটেকের পকেটে একটা বড়সড় ছিদ্র করে দিল।

আমরা এখনো একটা পয়সা আয় করতে পারি নি। কিন্তু ইতোমধ্যেই ছয় কোটি খরচ হয়ে গিয়েছে কন্সট্রাকশন, সরঞ্জাম, ফ্যাকাল্টি, আর অবশ্যই সরকারি লোকজনকে ম্যানেজ করার পেছনে।

কিন্তু শুকলাজি'র কোন মাথাব্যাথা নেই।

"ব্যাপার না, টাকা উসুল হয়ে যাবে," শুকলাজি বলল। আমার হাতে সোডাসহ হুইস্কি দিল সে।

আমি রুমটা পরীক্ষা করলাম। "এ রুমের অন্তত ত্রিশজনকে ঘুষ দেয়া হয়েছে।"

শুকলাজি হাসলো।

"আমরা কি ভুল করেছি? শুধুমাত্র একটা কলেজ খুলতে চেয়েছি," আমি বললাম।

"সবকিছুই ঠিক আছে," শুকলাজি বলল। "সিস্টেম যদি সোজা-সাপ্টা আর পরিষ্কার হত, এই প্রফেসররা সবাই তাদের নিজেদের কলেজ খুলে বসত। ব্লু-চিপ আর সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের কলেজ খুলে ফেলত। সিস্টেমটা জটিল, তাই তারা কেউই এটা ছুঁতে আসে না। এখানেই হচ্ছে আমাদের সুবিধা।"

"কিন্তু টাকা আসবে কবে? শুধুমাত্র আজকের পরিদর্শনেই পাঁচ লাখ দিলাম।"

"তাদের আরও দাও," শুকলাজি বলল।

"কাদের?"

"পরিদর্শকদের।"

"কেন?" আমি বললাম। "শ্রীবাস্তব স্যার বলল এটাই যথেষ্ট। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা অনুমোদন পেয়ে যাব।"

"আমি চাই তারা শুধুমাত্র কলেজকে অনুমোদনই দিবে না, বরং গঙ্গাটেক সম্পর্কে অনেক ভাল কিছু বলুক," শুকলাজি বলল।

"লিখিতভাবে?" আমি বললাম।

"হ্যা, যেগুলো আমরা মার্কেটিংয়ে ব্যবহার করব। সহকারীদের জন্য দশ হাজার আর আসল লোকটার জন্য পঞ্চাশ হাজার বেশি দাও।"

সে তার ফোন বের করে একটা কল করল।

শুকলাজি আর আমি ডিনার বুফের দিকে গেলাম। আমরা প্লেটে খাবার নিয়ে রুমের এক কোণায় বসলাম। "একঘণ্টার মধ্যে টাকা চলে আসবে," সে আমাকে বলল।

"আমাকে কেন এত বিশ্বাস করেন শুকলাজি? আমি তো আপনার টাকা চুরিও করতে পারি।"

"তোমার কোন পরিবার নেই। তুমি কাদের জন্য চুরি করবে?" সে বলল।

অধ্যায় ২১

এআইসিটিই অনুমোদন সময়মতই এল, প্রফেসর শ্রীবাস্তব যেরকমটা বলেছিল। এখন ভর্তি শুরু করার আগে আর একটিমাত্র ধাপ পেরোতে হবে। স্টেট ইউনিভার্সিটির নিবন্ধন। মঙ্গেশ তেওয়ারি, ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের আবেদন নিয়ে গড়িমসি করছে কয়েক মাস ধরে।

আমরা শুকলাজি'র বাসায় বসে আছি। "নিবন্ধন একটা সহজ কাজ। আমরা তাকে মার্কেট রেটের ডাবল অফার করছি। মঙ্গেশের ভীমরতি ধরেছে," বেদি বলল।

"সে কত চায়?" শুকলাজি জিজ্ঞেস করল।

"এটা টাকার ব্যাপার না। সে আমাদের পছন্দ করছে না। আমাদের কলও ধরে না," বেদি বলল।

"এর সমাধান কি?" আমি বললাম।

"পরিচিত লোকজনকে কাজে লাগাতে হবে। অরাজনৈতিক হলে ভাল হয়, সে আমাদের ডিএম-এর কলেজ ব্যাচমেট," বেদি বলল।

"আমি ডিএম-এর মেয়েকে চিনি। স্কুলের পুরনো বন্ধু," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, যা করা লাগে কর। আমি সামনের সপ্তাহেই ভর্তি শুরু করতে চাই। প্রতিটা খবরের কাগজে ফুল পেজ বিজ্ঞাপন যাবে," শুকলাজি বলল।

"চিন্তা করবেন না, আগামি রোববার বারানশি শুধুমাত্র গঙ্গাটেক নিয়েই কথা বলবে," আমি বললাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আরতিকে কল না করার কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।

"দেখ কে কল করেছে!" আরতি পাখির মত কিচির মিচির করে বলল।

"তোমাকে খুশি মনে হচ্ছে," আমি বললাম।

"তাই নাকি? হয়তো তুমি কল করেছ সেজন্য। এছাড়া তো আর কোন কারন নেই।"

"কেন? কি হয়েছে?" আমি বললাম।

"কিছু না। আমাকে বারানশিতেই চাকরি খুঁজতে হবে।"

"এটা তত খারাপ না।"

"তোমাদের কলেজের কি নিজস্ব প্লেন থাকবে?" সে বলল।

"এখনো না," আমি বললাম। "যখন থাকবে তখন তোমাকে কেবিন সুপারভাইজার বানাব।"

সে হাসলো। "তুমি কেমন আছ? তোমার কলেজে সত্যি সত্যি স্টুডেন্ট থাকবে

কবে?"

"যখন পৃথিবীর সব ইন্ডিয়ান সরকারী অফিসারকে খুশি করতে পারব," আমি বললাম। "আসলে আমি একটা কাজে ফোন করেছি।"

"কি কাজ?" সে বলল।

"তোমার বাবার সাথে দেখা করতে হবে।"

"সত্যি? কেন?"

"স্টেট ইউনিভার্সিটির সাথে একটা কাজে তার সাহায্য দরকার।"

"তুমি কি তার সাথে এখন কথা বলবে?"

"না, তার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারলে ভাল হয়," আমি বললাম।

"তুমি কি আমার সাথে সামনাসামনি দেখা করতে চাও?" সে বলল। "নাকি আমি এখনো ব্ল্যাকলিস্টে আছি? যাকে শুধুমাত্র কাজের সময়ই দরকার হয়।"

"সেরকম কিছু না। তোমার বাবার সাথে দেখা করার পরেই তোমার সাথে কথা বলতে পারি।"

"অবশ্যই, আগে কাজ," সে শ্লেষাত্মক সুরে বলল।

"আমার ভর্তি আটকে আছে আরতি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ," বললাম তাকে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক সেকেন্ড ধর, আব্বুর সাথে কথা বলে আসি।"

সে তার বাবার সাথে কথা বলে এসে আবার ফোন ধরল। "কাল সকাল আটটায়?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "তখন তোমার সাথে দেখা হবে।"

"তুমি তো এখন একদমই বাসায় আস না। আরতির সাথে কি বন্ধুত্ব নেই এখন?" ডিএম প্রধান বলল।

আমরা তার স্টাডিতে বসে আছি। আরতির দাদা, এক্স-সিএম ব্রিজ প্রধানের একটা লাইফ-সাইজ ছবি দেয়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ডিএম প্রধান–তীক্ষ্ণ গড়ন, প্রশস্ত মুখমন্ডল, ফিট আর গৌরবোজ্জ্বল–আমার সাথে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

"সেরকম কিছু না আঙ্কেল। কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে," আমি বললাম।

"আমি তোমার কলেজ সম্পর্কে শুনেছি। শুকলাজি এতে যুক্ত আছেন, তাই না?" ডিএম প্রধান বলল।

"জি, আর এখন আমরা ভর্তি থেকে এক ধাপ দূরে আছি," বলে আমি ভিসি তেওয়ারিকে নিয়ে সমস্যার কথা ভেঙে বললাম।

সে আমার কথা শুনে বলল, "আচ্ছা আমি দেখছি।" সে তার সেলফোন বের করে ভিসিকে কল করল।

"তেওয়ারি স্যার? হ্যালো, প্রতাপ প্রধান বলছি...হ্যা, অনেক দিন পরে। কেমন আছিস?"

আরতির বাবা বিকেলে আমাদের সাথে তেওয়ারির একটা মিটিং ঠিক করে দিলো।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," আমি উঠে যেতে যেতে বললাম।

"ওয়েলকাম। শোন, তেওয়ারিকে কি টাকা দিয়েছ?"

আরতির বাবার সাথে এধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা বিশ্রী মনে হল। তাই চুপ করে থাকলাম।

"আমি জানি শিক্ষার ব্যবসা কিভাবে চলছে। তেওয়ারি বুদ্ধি খাঁটিয়ে কথা বলছে, কিন্তু সে তার ভাগ পেতে আগ্রহী। আর আমি আশা করছি তোমরা আমাকে এসবের মধ্যে টানবে না।"

"একদমই না, স্যার," আমি বললাম। "আসলে আমিও এসব বিষয় দেখি না। আমি শুধুমাত্র কলেজের দেখাশোনা করি।"

"তার মানে এগুলো সবকিছু শুকলাজি'র মানুষেরা দেখাশোনা করে?" আরতির বাবা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা," বলে আমি নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"ভাল, তুমি তাহলে দেখছি আমার মত," সে বলল। "যেসব মানুষ এসব হাস্যকর কাজকর্ম করে তাদের নিজেদেরকে তা করতে দেয়ার মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন।"

আমি মাথা নেড়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

"একটা চকলেট মিল্ক-শেক আর সাথে আইসক্রিম প্লিজ," আরতি বলল। আমরা সিগড়ার সেই সিসিডিতে এসেছি ক্যারিয়ার ফেয়ারের দূর্যোগের পরে সুনীল আমাকে যেখানে নিয়ে এসেছিল।

"রং চা," আমি বললাম।

সে উজ্জ্বল বেগুনী রঙের চিকেন সালোয়ার কামিজ পরেছে। তার বাবা এটি তার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে কিনে এনেছে। তার সাদা ওড়না একপাশে রাখল সে।

ওয়েটার তার মিল্ক শেক এনে টেবিলে রাখল। সে উপচে পড়া গ্লাসে হাত না দিয়েই তার ঠোঁট স্ট্র-তে রাখল। "মাঝেমধ্যে আমি ফেলে দেই। আমার সতর্ক থাকা উচিত," বলল সে।

আরতি ড্রিংকে চুমুক দিতে তার চুল টেবিল ঘেষে গেল। সারা ক্যাফে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমাদের মাঝেমধ্যেই এটা করা উচিত," সে বলল। "কফিমিটিং। যদিও

আমরা কেউই কফি খাচ্ছি না।"

"আমার তা মনে হয় না," আমি বললাম।

"কেন? তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাও না?" সে বলল। "দশ বছরের বেশি সময় থাকা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের কাছ থেকে এমনটা আশা করি নি!"

"রাঘব এটা ভাল চোখে দেখবে না।"

"কফিমিটিং করতে সমস্যা কোথায়? তাছাড়া রাঘব এত ব্যস্ত যে এসব করার সময়ই পায় না।"

"অবশ্যই, সে তো এখন বিরাট রিপোর্টার। আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম," বলে আমি আমার কাপ তুললাম।

"তুমি করেছিলে," সে বলল, মিল্ক শেক খেতে খেতেই তার ভ্রু উপরে উঠল।

"সে আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল, তার পত্রিকার জন্য।"

"কি ব্যাপারে?" সে বলল।

"তরুণ ছেলে কলেজ চালু করছে।"

"তাতো ঠিক। আসলেই একটা উল্লেখযোগ্য অর্জন।"

"হ্যা, আমার মত একটা লুজারের জন্য।"

"আমি তা বলি নি," সে বলল। "হেই, তুমি কি কিছু খাবে?"

আমি উত্তর দেয়ার আগেই সে দুটো চকলেট কেকের পিস অর্ডার করল। আরতিকে পছন্দ করতে দিলে দুনিয়াতে খাওয়ার জন্য চকলেট কেক ছাড়া আর কিছুই থাকত না।

"তোমার চাকরি খোঁজা কেমন চলছে?" আমি বললাম।

"একটা অফার পেয়েছি। কিন্তু নেব কিনা জানি না।"

"তাই নাকি? কি অফার?"

"গেস্ট রিলেশনস্ ট্রেইনি, রামাদা হোটেলে। ক্যান্টনমেন্টে এটা চালু হচ্ছে।"

"ফাইভ স্টার, তাই না?"

"হ্যা, তারা বাবার সাথে কিছু কাজের জন্য দেখা করতে এসেছিল। বাবা খালি পদটা দেখল, আমি আবেদন করলাম আর তারা আমাকে আগামি মাসে শুরু করতে বলছে।"

"তো যাও। আমি তো তোমাকে চিনি, তুমি বাসায় বসে থাকার মানুষ না।"

"তুমি আমাকে অন্য অনেক মানুষের চেয়ে ভাল চেন, গোপাল," সে বলল, "কিন্তু..."

"কি?" আমি বললাম।

কেক চলে এলেও সে স্পর্শ করল না। আমি তার চোখের অবস্থা দেখতে পেলাম। সেগুলো আর্দ্র হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল তার গাল বেয়ে নামতে লাগল।

"আরতি তুমি ঠিক আছ তো?" আমি তাকে একটা টিস্যু দিলাম।

সে তার চোখ মুছে তার আইলাইনার লেগে যাওয়া টিস্যু আমাকে ফেরত দিল। "আমি একবার জয়েন করলে আব্বু-আম্মু বলবে–এটা একটা ভাল চাকরি, বাসার কাছে, এখানেই থেকে যা। আর আমি বাসায় থাকলে হয়তো তারা কোন এয়ার লাইনে যেতে দিবে।"

আমি অবজ্ঞার সুরে বললাম, "এতে কান্নাকাটির কি আছে? তুমি একটা ভাল চাকরি পেয়েছ। তুমি হসপিটালিটির ওপর কোর্স করেছ..."

"এভিয়েশন, হসপিটালিটি না।"

"ঠিক আছে, কিন্তু একজন এয়ার হোস্টেসও গেস্টদের সেবা করে, হোটেলের মত। আর একজন গেস্ট রিলেশনস ট্রেইনির ওপরে ওঠার অনেক সুযোগ থাকে। আজ ট্রেইনি, কাল অফিসার, হয়তো একদিন হোটেলের জিএম হয়ে যাবে। তুমি স্মার্ট। অনেক ওপরে উঠে যাবে।"

সে কয়েকবার ফুপিয়ে নিজেকে সংযত করতে পারল।

"তোমার তাই ধারণা?" সে বলল। পানিতে চিকচিক করা অবস্থায় তার চোখ দেখতে আরও সুন্দর লাগছে।

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। তার চোখের গভীরে হারিয়ে গিয়েছি।

"কি হয়েছে? আইলাইনার কি ছড়িয়ে গিয়েছে?" সে হেসে উঠল। "আমি আসলেই একটা বোকা, বাচ্চাদের মত কাঁদছি।"

"না, তুমি তা নও। বোকা হলে চাকরিটা পেতে না," আমি বললাম।

"আমার কি এটা নেয়া উচিত?"

"কেন নেবে না? আর তোমার কাছে ভাল না লাগলে অন্য কথা। রাঘব কি বলে?"

"কিছুই না।"

"মানে?"

"এ অফারের পর তার সাথে আর দেখাই হয় নি। আমি তাকে কল করেছিলাম, কিন্তু সে বলেছে আমি যেটা চাই সেটাই যেন করি। সে একটা খবরের জন্য গ্রামে গিয়েছে এ সপ্তাহে।"

"তোমার এখানে থাকাটা তোমাদের দুজনের জন্যই ভাল হবে," আমি বললাম।

"আচ্ছা, কিন্তু সে এসব কিছুই বলে নি।"

"আমি নিশ্চিত সে এটা বুঝতে পেরেছে।"

"আমি মনে করি না সে আমার বিষয়গুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়, যদি না আমি কোন দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হই," সে বলল।

এ কথায় যেভাবে হাসতে দেখলে সে খুশি হবে সেভাবে হাসলাম। বিল জানতে চাইলাম আমি।

"তো, কফি বন্ধু?"

"আমরা বন্ধু," আমি বললাম।

"ঠিক। যদিও এটা পুরোপুরি চালু হয় নি, কিন্তু আমি তোমাকে মাঝেমধ্যে হোটেলটা দেখাব। এটা মোটামুটি বিশাল।"

"অবশ্যই," আমি বললাম।

"গঙ্গাটেক কবে দেখতে যাচ্ছি?"

"আর মাত্র দু-সপ্তাহ," আমি বললাম। "এটা প্রায় হয়ে গিয়েছে।"

আমরা গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।

"আমি হাসলাম, কাঁদলাম। তোমার সাথে দেখা হয়ে দারুন লাগল," আরতি বলল।

"আমার কাছেও, যদিও আমি কাঁদি নি," বললাম আমি।

সে আবারো হাসলো। সে আমাকে জড়িয়ে ধরল স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ।

"পুরনো বন্ধু পুরনো বন্ধুই, গোপাল। বয়ফ্রেন্ড আর সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু পুরনো বন্ধুরা যেভাবে বুঝতে পারে তারা সেভাবে পারে না।"

'বন্ধু' শব্দটার ওপর প্রচন্ড রাগ উঠছে কিন্তু আমি কিছুই বললাম না, শুধুমাত্র তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম।

আমার ফোন বেজে উঠল। বেদি।

"ভিসি আমাদের একটা মিটিংয়ের জন্য ডাকছে। ডিএম-এর ফোন কল কাজে লেগেছে। তারা একজন আরেকজনকে ছোটবেলা থেকে চেনে," সে বলল।

"পুরনো বন্ধু পুরনো বন্ধুই," আমি বললাম।

অধ্যায় ২২

গঙ্গাটেকের উদ্বোধন উপলক্ষে জীবনে প্রথমবারের মত স্যুট পরলাম। সবধরনের সাজসজ্জার তদারকি করতে লাগলাম আমি। আগের রাতে আমার অফিসে ঘুমিয়েছি আমরা সবাই। তিনটা ক্লাসরুমকে ভর্তি সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফরম, কলম তথ্যের বুকলেট ঠিকঠাক আছে তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক সময় জেগে রইলাম।

শুকলাজিকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। একজন চিফমিনিস্টার আসছেন উদ্বোধন করার জন্য। দুজন স্টেটমিনিস্টারও তার সাথে থাকবেন। তাদের সিকিউরিটি অফিসাররা আগেরদিনই কলেজ দেখে গিয়েছে। এখনো আমাদের কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় তাবুর মধ্যে একটা অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়েই বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হল।

"দু-হাজার আমন্ত্রণপত্র দেয়া হয়েছে স্যার, বারানশির সব প্রখ্যাত পরিবারকে," কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির অজয় আমাকে বলল।

আমরা লাঞ্চের আয়োজন করছি। তাই আমাদের ধারণা মেহমানদের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যা উপস্থিত হবে। শহর থেকে দূরে হওয়ার কারনে চারটা বাস দেয়া হয়েছে সাধারন লোকজনের আসার জন্য, আর মিডিয়ার দৌড়া-দৌড়ির জন্য ডজনখানেক গাড়ি।

শহরের প্রধান খবরের কাগজগুলোতে টানা তিন দিন ফুল-পেজ বিজ্ঞাপনের জন্য দশ লাখ খরচ করেছি। প্রতিষ্ঠার সময় একবারই সুযোগ পাওয়া যায়। শুকলাজি সারা শহরকে জানাতে চায় সে একটা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় কাজ শেষ হল। অনুষ্ঠানের আগে হালকা ঘুমানোর জন্য অফিসের সোফায় শুয়ে পড়লাম। সাড়ে ছয়টায় শুকলাজি'র কল আমাকে জাগিয়ে তুলল। আমি ঘুমকাতুরে অবস্থায় আমার চোখ ডলতে লাগলাম।

"গুড মর্নিং, শুকলাজি," আমি বললাম।

"তুমি কি খবরের কাগজ দেখেছ?"

আমি বুঝতে পারলাম সে ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন দেখে উত্তেজিত হয়ে আমাকে ফোন করেছে। বছরের পর বছর অপেক্ষার পরে এ দিনটা এসেছে। "না, আমি ক্যাম্পাসে। কাগজ এখনো আসে নি।"

"এটা কিভাবে হল?" শুকলাজি বলল।

আমি অবাক হলাম তার কথা আনন্দময় শোনাচ্ছে না কেন। সম্ভবত সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে অভ্যস্ত না, আমি ভাবলাম। "বিজ্ঞাপনগুলো সুন্দর হয়েছে, তাই না?"

"বিজ্ঞাপন না, গাধা। আমি দৈনিকের আর্টিকেলের কথা বলছি।"

শুকলাজি আগে কখনো আমাকে গালি দেয় নি। যদিও আমি তার সাথে কাজ করছি। কিন্তু আজকের আগে সে আমার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে নি!

"কোন আর্টিকেল?" আমি বললাম, আমার হাত কপালের দুপাশে চলে গেল, নির্ঘুম থাকার কারণে সেখানে ধপধপ করছে।

"পত্রিকা পড়ে আমাকে কল কর।"

"ঠিক আছে। বিজ্ঞাপন কেমন লাগছে?"

জবাবে আমি শুধুমাত্র ক্লিক শুনতে পেলাম।

পিওনকে চিৎকার করে বললাম সবগুলো খবরের কাগজ এনে দিতে। আর একঘণ্টার মধ্যেই সেগুলোকে আমার ডেস্কে পেলাম।

প্রতিটা পত্রিকায় আমাদের ফুল-পেজ রঙিন বিজ্ঞাপন ছেপেছে। ক্যাম্পাসের ছবিটা চমৎকার লাগছে দেখতে। বিজ্ঞাপনের একেবারে নিচের দিকে আমি আমার নাম দেখতে পেলাম। তখনই শুকলাজি'র কঠিন কথাগুলো আমার মাথায় বেজে উঠল।

আমি *দৈনিকের* পাতা উল্টাতে লাগলাম। ছয় নম্বর পাতায় আমি একটা আর্টিকেল দেখতে পেলাম।

হেডলাইনে লেখা :

"শহরে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ–দুর্নীতির টাকায়?"

"কি লিখেছে এসব!" আমি বাকি অংশ পড়তে পড়তে বললাম।

রাঘব কাশ্যপ, স্টাফ রিপোর্টার

আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হল সে এসব করেছে। প্রথম দু লাইনে তেমন খারাপ কিছু লেখা নেই।

বারানশি শহর, যাকে কিনা শিক্ষার শহরও বলা হয়, সেখানে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু হচ্ছে। গঙ্গাটেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, লক্ষ্ণৌ হাইওয়েতে পনের একর জায়গার উপর নির্মিত এ কলেজে এ সপ্তাহের শেষেই ভর্তি চালু হচ্ছে।

রাঘব অবশ্য আমাদের সুযোগ সুবিধা, ফ্যাকাল্টিদের তালিকা, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেসব শাখায় পড়াশোনা করা যাবে তাদের তালিকা এবং ভর্তি প্রক্রিয়ার কথা লিখেছে। আধ পৃষ্ঠার আর্টিকেলে আমার আর শুকলাজি'র ছবিও রয়েছে। আমি কখনোই আমার ছবি পত্রিকায় দেখি নি। কিন্তু আর্টিকেলের বাকিটা পড়তে গিয়ে ছবিটা ভালভাবে উপভোগ করতে পারলাম না।

মজার বিষয় হচ্ছে, এমএলএ রামনলাল শুকলা গঙ্গাটেকের একজন ট্রাস্টি। সে কলেজের ফান্ড জোগার করতে সাহায্য করেছে। গঙ্গাটেক কলেজের পাশেই শুকলাজি'র নিজস্ব জমিও আছে যার দাম পাঁচ থেকে দশ কোটি হবে। শুকলা এসব ফান্ড কোথা থেকে পেল? ঘটনাক্রমে, সে কলেজের কাজ শুরু করেছে তিন বছর আগে, ঠিক যখন তার নাম গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান কেলেংকারিতে এল। এই কলেজ কি

তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা? মানুষ গঙ্গায় আসে তাদের পাপ মোচনের জন্য। শুকলা কি গঙ্গাকে নিয়ে সৃষ্ট পাপ মোচনের চেষ্টা করছে গঙ্গাটেক দিয়ে?

আর্টিকেল শেষ হতেই মুখে গালি চলে এল।

পত্রিকাটা দুমড়েমুচড়ে ফেললাম। আমাদের সাথে এটা হতে পারে না। ভর্তির এ দিনে তো অবশ্যই না। কখনোই না। শুকলাজি আবারো কল করল। আমি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ফোন ধরলাম।

"আমি এটা দেখেছি," বললাম তাকে।

"এটা কিভাবে হল? এই বানচোত রিপোর্টার রাঘবটা কে? সে সত্যিই তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল?"

"সে আমার...ব-বন্ধু...স্কুলের," তোতলাতে তোতলাতে বললাম। "তার ব্যালেন্স করে ছাপার কথা ছিল।"

"এটা কি ব্যালেন্সড্? সে আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করেছে!"

"আমি খুবই সরি শুকলাজি। তবে চিন্তা করবেন না, অন্যান্য পত্রিকাগুলো এরকম কিছু লিখে নি।"

"দৈনিক সবচাইতে বড় আর এটার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ইতোমধ্যেই সিএম অনুষ্ঠানে আসবে না বলে দিয়েছেন।"

"কি?" আমি যেন শক খেলাম। "তাহলে কলেজ উদ্বোধন করবে কে? তার নামে আমরা একটা পাথরের ফলক বানিয়েছি।"

"আমি জানি না। পিওনকে দিয়ে উদ্বোধন করাও, আর কি করবে?" শুকলাজি বলল।

"মাথা ঠান্ডা করুন, শুকলাজি," আমি বললাম। "আসলেই তিন ঘণ্টার মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।"

এমএলএ একটা গভীর দম নিলেন। "স্টেট এডুকেশন মন্ত্রী তো আসছেই। সে করবে উদ্বোধন।"

"আর ফলক?"

"এর উপরে স্টিকার লাগাও গোপাল। আমাকে কি সবকিছু বলে দিতে হবে?"

"সরি শুকলাজি, আমি ওটা ঠিক করে ফেলব," বললাম তাকে।

আমি মেহমানদের ফলোআপ দেখতে লাগলাম। তাদের বেশিরভাগই আসবে বলেছে। একটা ফ্রি লাঞ্চের প্রস্তাব দুর্নীতির অভিযোগের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক।

"ভেতরে আসতে পারি, স্যার?" একটা ফোনকল শেষ হতেই আমি একটা মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

আমি উপরে তাকালাম। "আরতি!"

"বিরক্ত করছি তোমাকে?" আরতি বলল। "আমি অবশ্য আগেই চলে এসেছি।"

সে নয়টায় চলে এসেছে, উদ্বোধনের সময়ের চেয়ে একঘণ্টা আগে। আমার মাথায় দুশ্চিন্তা ভর্তি থাকলেও খেয়াল করলাম সে অনুষ্ঠানের জন্য সেজেগুজে এসেছে। সবুজ সালোয়ার কামিজ পরেছে যার কিনারে বেগুনী আর সোনালী কাজ করা।

"হাহ? হ্যা, অবশ্যই," আমি বললাম। "ওয়াও, তোমাকে অনেক..."

"কি?" সে বলল।

"তোমাকে অনেক ফরমাল লাগছে," আমি বললাম। কি বলতে কি বলেছি নিজেও জানি না।

"ওহ, আমি ভেবেছিলাম তুমি বলবে আমাকে সুন্দর লাগছে।"

"তা তো ধ্রুব সত্য, আরতি।"

"কি ধ্রুব সত্য?"

"তোমাকে সবসময়ই সুন্দর লাগে," আমি বললাম।

"তাই? আমি অবশ্য এসব কথা এখন আর তেমন শুনি না।"

"কেন? তোমার বয়ফ্রেন্ড কি বলে না?" আমি কাটা কাটা স্বরে বললাম। রাঘবের আর্টিকেলের কথা এখনো মাথায় ঘুরঘুর করছে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমি খবরের কাগজ দিয়ে পোশাক বানিয়ে না পরা পর্যন্ত সে আমাকে খেয়ালই করবে না।"

আমি হাসলাম। আর স্কুলের কোন প্রিন্সিপালকে মিস করেছি কিনা তা চেক করতে লাগলাম।

"তোমাকে ব্যস্ত মনে হচ্ছে," আরতি বলল। "আমি কি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করব?"

আমি আরতিকে কখনোই বাইরে যেতে দিতাম না কিন্তু আমাকে কয়েক লক্ষ ফোন করতে হবে।

"বাইরে থাকতে কোন সমস্যা হবে না তো?" আমি বললাম।

"না, সমস্যা নেই। আম্মু এসেছে, বাইরে আছে। আব্বু একটা ট্যুরে থাকায় আসতে পারে নি।"

"ওহ্," আমি বললাম। "তাহলে আন্টিকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।"

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। তার মা প্রথমসারিতে বসে আছে। আমাদের প্রথম অতিথিদের একজন।

"হ্যালো আন্টি," আমি বললাম। আমার হাত জোর করা।

"কংগ্রাচুলেশন্স গোপাল। কি সুন্দর ক্যাম্পাস," সে বলল।

"এটা এখনো নির্মানাধীন," বলে একজন ওয়েটারকে চা-নাস্তা নিয়ে আসার জন্য ইশারা করলাম।

"আমাদের নিয়ে চিন্তার দরকার নেই," আরতি বলল। "তুমি তোমার কাজ কর।

উচ্চপদস্থ অতিথিদের দিকে মনযোগ দাও।"

আমি চলে যাবার আগে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তার মায়ের দৃষ্টি আমার দিকে।

আমি আবারো হাতজোর করে নিজেকে এখান থেকে মুক্ত করলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভালভাবেই সম্পন্ন হতে লাগল যদিও সিএম ছাড়া অনুষ্ঠানের চাকচিক্য কিছুটা কমে গিয়েছে। স্টেট শিক্ষা মন্ত্রী কলেজের নাম-ফলক উন্মোচন করলেন, যেখানে কালো পাথরের উপর তার নাম সিএম-এর নামের ওপর লেপ্টে দেয়া হয়েছে। সিএম-এর অনুপস্থিতি নিয়ে মিডিয়ার লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন লেগেই থাকল।

"একটা সমস্যার কারনে একেবারে শেষ মুহূর্তে সিএম অনুষ্ঠানে আসতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন," শুকলাজি স্টেজে উঠে বললেন। সে এক মিনিটেরও কম সময় স্টেজে থাকলো। প্রেস প্রশ্ন করার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। তারা সবাই দৈনিকের আর্টিকেলের ব্যাপারে কথা বলতে চায়। কিন্তু এমএলএ তাদের সবাইকে স্টেজ থেকে গেট পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন।

"আমি দুঃখিত, আজ কোন প্রশ্ন নয়। আমাকে গ্রাম পরিদর্শনে যেতে হবে। কৃষকদের আমাকে খুবই দরকার। বাকি কাজ মিঃ গোপাল মিশ্রা করবে।"

মিনিটের মধ্যে তার গাড়িতে করে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেল। হাইওয়ে থেকে সে আমাকে কল করল।

"আমি *দৈনিকের* সম্পাদকের বাচ্চার সাথে কথা বলতে চাই," সে বলল।

"ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিব, তবে ভর্তি ফরম ভালই যাচ্ছে।"

"ওই বেজন্মারা কি জানে তাদের আমরা কতগুলো বিজ্ঞাপন দিয়েছি?" সে বলে যেতে লাগল।

"শুকলাজি, ভর্তির মধ্যে..." আমি বললাম।

কিন্তু ততক্ষণে সে কল কেটে দিয়েছে।

বাকি সিটগুলো একটা বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন করে পূরণ করব ভাবলাম।

"আমরা সারা বছর বিজ্ঞাপন দেব," *বারানশি টাইমস্*-এর মার্কেটিং প্রধানকে বললাম আমি। "একটা বড়সড় ছাড় আশা করছি।"

সারা দিন পত্রিকায় পত্রিকায় ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছি। এখন আমর ট্রিভেদির অফিসে বসে আছি, *বারানশি টাইমস্*-এর মার্কেটিং প্রধান।

"আমাদেরকে আপনার মিডিয়া পার্টনার করছেন না কেন?" সে বলল।

"এটা আবার কি?" আমি বললাম।

"কিছু বেশি ফি দিলে আপনার কলেজ সম্পর্কে ভাল ভাল আর্টিকেল ছাপা হবে।

আমরাও খবর পেলাম, আপনাদেরও সুনাম বাড়ল। এটা একটা উইন-উইন পার্টনারশিপ," সে বলল।

"আমরা কিভাবে বুঝব সেটা আমাদের জন্য ভাল হবে।" একবার ধাক্কা খেয়ে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

"আর্টিকেলগুলো আপনারাই আমাদের পাঠাবেন," আমর বলল।

আমি তাকে লিখিত আবেদন জানাতে বললাম।

বারানশি টাইমস্-এ কাজ শেষ করে আমি বনস্ফটকে গেলাম, দৈনিকের অফিসে।

"স্বাগতম গোপালজি," শৈলেশ গুপ্ত, *দৈনিকের* সেলস্ ম্যানেজার বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি তার উত্তরে একটুখানি হেসে তার অফিসে গেলাম।

"কি খাবেন স্যার?" সে বলল।

আমি মাথা দোলালাম।

"চা? কফি??"

"ভুলে ভরা আর্টিকেল ছাপাচ্ছেন?" বললাম তাকে।

"কি?" সে বলল।

"শৈলেশ, আমরা যত জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি তার মধ্যে আপনাকে সবচেয়ে বড় চেকটি দিয়েছি। আর কি করলেন এটা আপনি? আমাদের শুরুর দিনেই?"

শৈলেশ আমার প্রসঙ্গ বুঝতে পেরে অন্য দিকে তাকাল।

"সামনের সপ্তাহের জন্য আমার বাজেট পাঁচলাখ। আপনি এখন বলুন আমি কেন *বারানশি টাইমস্*-কে কাজটা দিয়ে খুশি করব না?" আমি ট্রাস্টের চেকবই হাতে নিয়ে দোলালাম।

"গোপাল ভাই," শৈলেশ নিচু কণ্ঠে বলল, "কি বলছেন আপনি? আমরা এক নম্বর পত্রিকা।"

"তো? তাই বলে আমাদের বাঁশ দিবেন?"

"গোপাল ভাই আমি এসব করি নি।"

"কলেজ দুর্নীতির টাকায় তৈরি হয়েছে! আপনারাও তো আমাদের থেকে টাকা নিয়েছেন।"

"এসব সম্পাদকীয়র কাজ। তাদের আসলেই বুদ্ধি কম, বাস্তবজ্ঞান নেই," বলল শৈলেশ।

আমি টেবিলে জোরে ঘুসি মারলাম। "আমি আপনাদের প্রধান-সম্পাদকের সাথে দেখা করতে চাই। আপনি যদি এরপর আমাদের কোন বিজ্ঞাপন বুক করতে চান," আমি বললাম।

শৈলেশ আমার চেকবইয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। "চলুন," বলল সে। আমি তার সাথে সাথে সম্পাদকের অফিসের দিকে গেলাম।

প্রধান সম্পাদক অশোক কুমার, তার কাঁচের কেবিনে কয়েকজন উপ-সম্পাদকের সাথে মিটিং করছে। শৈলেশ ভেতরে গেলে তারা বাইরে চলে এল। আমাকে ভেতরে যাবার জন্য ইশারা করল শৈলেশ।

অশোক আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। "আপনি এমএলএ শুকলা'র অফিস থেকে এসেছেন?" সে বলল।

"আমি গঙ্গাটেক কলেজের ডিরেক্টর," বলেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে দায়সারা ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করে আমাকে বসতে বলল।

"আমি ফুলপেজ বিজ্ঞাপন দেখেছি," অশোক শুরু করল, তার কেবিনে আমার উপস্থিতির কারণ বুঝতে পারছে না সে।

"আমাদের নিয়ে যে আর্টিকেলটা করেছেন সেটা কি দেখেছেন?" আমি বললাম।

"আমি নিশ্চিত দেখেছি সেটা। কে লিখেছে?" অশোক বলল। সে তার চশমা পরে কম্পিউটারে খুঁজতে লাগল।

"স্যার, রিপোর্টারের নাম হয়তো মনে করতে পারবেন না," অশোক আমাকে বলল। "আমরা কি তারিখ অনুযায়ী খুঁজব?"

"রাঘব কাশ্যপ লিখেছে," আমি বললাম।

"নতুন রিপোর্টার?" অশোক বলল, তার কণ্ঠ এই প্রথম উপরে উঠল। সে তার কম্পিউটারে তাড়াতাড়ি আর্টিকেলটা বের করল। মনিটরটা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিল সে। "এটা?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"রিপোর্টারকে অভিনন্দন জাননো উচিত। সে নতুন, কিন্তু তার আর্টিকেল মানুষের চোখে পড়ছে।"

"ফালতু রিপোর্ট লিখলে সেটা মানুষের চোখে পড়বেই," আমি বললাম।

"কি হয়েছে শৈলেশজি। আপনার ক্লায়েন্টের মেজাজ খারাপ কেন? আমরা তার কলেজের উপর আধ পৃষ্ঠার প্রোফাইল করেছি," অশোক বলল।

"শেষের দু-প্যারা লিখেছেন কি জন্য? আর হেডলাইন?" আমি কথার মাঝখানে বললাম।

"কি?" বলে অশোক আর্টিকেলটা আবার দেখল। "ওহ্, দুর্নীতির বিষয়। এতে সমস্যা কোথায়?"

"এতে আমাদের সুনাম নষ্ট হচ্ছে," আমার দুটো হাত টেবিলের উপর ঠাস করে রাখতে রাখতে বললাম আমি।

অশোক আমার এরকম আচরণ মোটেও আশা করে নি। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। টেবিলের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম আমি।

"আপনি সুনাম নিয়ে এত চিন্তিত হলে এমএলএ শুকলা'র টাকায় কলেজ কেন চালু করেছেন?" অশোক বলল।

শৈলেশ বুঝতে পারল ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। "স্যার, গঙ্গাটেক আমাদের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট হতে চাচ্ছে।"

"সে জন্য কি আমরা সত্য-সংবাদ প্রকাশ করব না?" অশোক বলল।

"অভিযোগ এখনো প্রমাণিত হয় নি," আমি বললাম। "তিন বছর আগের একটি মৃত-ইস্যু আমাদের শুরু করার দিনই তুলে এনেছেন। এটা কি ঠিক হয়েছে?"

"অশোক স্যার, আপনার সাথে একান্তে দু-মিনিট কথা বলতে চাচ্ছি," শৈলেশ বলল।

আমি বাইরে বের হয়ে এসে চারদিকে তাকালাম। একজন পিয়নকে জিজ্ঞেস করলাম রাঘব কাশ্যপ কোথায় বসে। তার ছোট কেবিনটা দেখতে পেলাম আমি। সে তার কম্পিউটারে ক্ষিপ্রভঙ্গিতে টাইপ করে যাচ্ছে, আশেপাশের জগত সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

শৈলেশ আমাকে ভেতরে যেতে বলল। "চিন্তা করবেন না, সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। অশোক স্যার নিজে এমএলএ-র সাথে কথা বলবে। আমরা সবকিছু ঠিক করে ফেলব। প্লিজ, আমাদের লেনদেন ঠিক রাখবেন," শৈলেশ বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "আর রিপোর্টারের কি হবে?"

"তার আর কি হবে?" শৈলেশ বলল। "সে একজন ট্রেইনি।"

"আমি চাই সে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে," বললাম তাকে।

শৈলেশ অশোকের দিকে তাকাল।

"সেটা তার উপর নির্ভর করে," বলল অশোক। সে তার সেক্রেটারিকে ফোন করে রাঘবকে ভেতরে পাঠাতে বলল।

পাঁচ মিনিট পরে দরজায় নক্ করল রাঘব।

"স্যার, আপনি আমাকে ডেকেছেন?" রাঘব বলল, আমাকে দেখেছে সে। "হেই গোপাল, তুই এখানে?"

"আপনারা একজন আরেকজনকে চিনেন?" ভ্রু নাচিয়ে অশোক বলল।

"সে আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে," বললাম তাকে।

রাঘব আমার কাঠখোট্টা জবাব শুনে অবাক হয়েছে মনে হল। সে বুঝতে পেরেছে আমি এখানে কোন পূর্বসম্পর্ক দেখাতে চাই না।

"কি হয়েছে?" রুমের সিরিয়াস ভাব দেখে রাঘব বলল।

শৈলেশ আমাদের আগের কথাবার্তার পুণরাবৃত্তি করল।

"ক্ষমা?" রাঘব বলল। "গোপাল, তুই আমাকে ক্ষমা চাইতে বলিস?"

"আপনারা একজন আরেকজনকে আগে থেকে চেনেন?" আমাদের মনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পেরে অশোক আবারও বলল।

"আমরা একই স্কুলে পড়তাম," আমি বললাম।

"আর একই বেঞ্চে বসতাম, ক্লোজ বন্ধু," রাঘব বলল। "তুই কেন সেটা তাদের

বলছিস না?"

তুই আমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে গিয়েছিস সেটা আমি তাদের বলছি না কেন, গাধা? অথবা আমার সাফল্য দেখে তুই যে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটা ফালতু আর্টিকেল ছেপেছিস তা-ও বলতে পারি তাদের, তাই না?

"ঐসব দুর্নীতি এখনো প্রমাণিত হয় নি। আর কলেজ প্রোফাইলে এসব উল্লেখ করার কোন দরকার কি আছে?" আমি বললাম।

"আমার আরও ব্যালেন্স হওয়া দরকার ছিল," রাঘব বলল। "শুকলা খুবই পরিচিত দুর্নীতিবাজ।"

"ননসেন্স," আমি জোরেসোরেই বললাম।

"মিঃ গোপাল, উচ্চস্বরে কথা বলার কোন দরকার নেই। রাঘব, আপনাকে সবগুলো রিপোর্টে অ্যাকটিভিস্ট হওয়ার দরকার নেই।"

"স্যার, আমি তেমন কিছুই লিখি নি। কলেজের বিল্ডিংয়ে যে সমস্যা আছে তা-ও লিখি নি।"

"কোন সমস্যা নেই। সব প্ল্যান অনুমোদনপ্রাপ্ত," আমি বললাম।

"আর শুকলা সেসব অনুমোদন কিভাবে পেয়েছে? যাহোক আমি সেসব কিছুই লিখি নি।"

"আসলে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানও অনেক আগের খবর রাঘব," অশোক বলল। "এর কোন নতুন, সলিড প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এটা রিপিট করার কোন প্রয়োজন আমি দেখছি না। আমরা কারও সুনাম ক্ষুণ্ন করতে পারি না।"

রাঘব বিহ্বলভাবে তার চুলে হাত বোলাল। "ঠিক আছে, আমি সলিড কিছু না পাওয়া পর্যন্ত আর কিছু লিখব না। আমি এখন যেতে পারি?"

"আপনি গোপাল স্যারের কাছে ক্ষমা চান নি," শৈলেশ বলল। "আমাদের গঙ্গাটেকের ক্লায়েন্ট।"

"সম্পাদকেরা শুধুমাত্র তাদের সত্যিকার ভুলের জন্যই ক্ষমা চায়," রাঘব বলল।

"অথবা যদি আপনার প্রধান-সম্পাদক আপনাকে চাইতে বলে," শৈলেশ শক্ত কণ্ঠে বলল।

রাঘব অশোকের দিকে তাকাল। "স্যার আপনি কিভাবে..." বলতে শুরু করল সে।

"রাঘব, এসব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিন। একঘণ্টার মধ্যে আমাকে বিজ্ঞাপনের চুক্তি সাইন করতে হবে," অশোক তার কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে বলল।

দশ সেকেন্ড অথবা আরও কিছু সময় নিরবতা বজায় থাকল।

"আমি সরি," দীর্ঘশ্বাসের সাথে বলল রাঘব।

"না, ঠিক আছে," আমি বললাম, কিন্তু ততক্ষণে সে প্রায় উড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

অধ্যায় ২৩

"তোমার আর রাঘবের মধ্যে কোন ঝামেলা হয়েছে?" আরতি বলল। সে আমাকে তার পছন্দের সময়, রাতে কল করেছে।

"সে তোমাকে বলেছে?" আমি বললাম।

"আমি তাকে বলেছি আমরা তিনজন একসাথে দেখা করি। আর তাতেই সে আমার মাথা খেয়ে ফেলল।"

"কোন দরকার নেই! আমি তোমার মাথা পছন্দ করি," বললাম আমি।

"সামনের সপ্তাহেই হোটেল খুলছে। আমি বলেছিলাম আমি অনুমতি নিয়ে তোমাদেরকে আগেই জায়গাটা দেখাব। এটা আসলেই অনেক সুন্দর," সে বলল।

"তুমি তাকে আলাদাভাবেও দেখাতে পারবে।"

"কি হয়েছে?" আরতি বলল। "তুমি তার সাথে দেখা করেছিলে, ঠিক? আমাকে কেউ কিছু বলছে না কেন?"

"এটা কাজের একটা বিষয়, চিন্তার কিছু নেই। সবকিছু এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

"তোমার যদি তাই মনে হয়, কাল কি ওখানে আসতে পারবে?"

"অবশ্যই।"

"গুড নাইট, ডিরেক্টর সাহেব!"

আমি রামাদা হোটেলের প্রবেশপথে আরতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সিকিউরিটি আমাকে ভেতরে যেতে দিবে না। আরতি এসে তার স্টাফ কার্ড দেখাতেই সে ঢুকতে পারল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। সে একটা মেরুন রঙের বেনারসি শাড়ি পরেছে, তার ইউনিফর্ম। "আরতি প্রতাপ প্রধান–গেস্ট রিলেশনস্ ট্রেইনি," তার ব্যাজে লেখা।

"ওয়াও, তোমাকে অন্যরকম লাগছে," আমি বললাম।

"অন্যরকম? ফরমাল? তুমি কি শুধু এগুলাই বল?" সে উপহাস করল।

"না...তোমাকে দারুণ লাগছে। কিন্তু তোমাকে শাড়ি পরা দেখব তা আমি ভাবতে পারি নি," বললাম তাকে।

"কি ভাবতে পার নি? তোমার স্কুলের বোকা ক্লাসমেট সত্যি সত্যি চাকরি পেয়ে যাবে সেটা?" সে কোমরে হাত রেখে ভ্রু নাচাল।

"হ্যা। তুমি তো বোকা-ই," আমি একমত হওয়ার ভান করলাম। আর তাতে সে

আমার হাতে ঘুসি মারল।

আমরা হোটেলের লবিতে ঢুকলাম। কন্সট্রাকশন শ্রমিশ্রা চকচকে ইটালিয়ান মার্বেলের উপরে পলিশিং মেশিন দিয়ে আরও চকচকে করে তুলছে। মেশিনে প্রচন্ড শব্দ হচ্ছে। বাতাসে রংয়ের গন্ধ। সে আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল যেখানকার ভেলভেটের সোফাগুলো অনেক মোলায়েম।

"এটা আমাদের বার হবে–বিষাক্ত।"

মানুষজন এখানে তাদের পাপ মোচন করতে এলেও তারা যাতে নতুন আরও পাপ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে এই হোটেল। অন্যান্য ফ্যাসিলিটি দেখার জন্য আমরা হাঁটতে লাগলাম।

"তো, কেউ আমাকে কিছু বলছে না কেন?" সে বলল।

"কি ব্যাপারে?" আমি বললাম।

"রাঘব আর তোমার মধ্যে কি হয়েছে?"

"পত্রিকার একটা খবর কলেজের পছন্দ হয় নি। সে ক্ষমা চাইল। ঘটনা এখানেই শেষ।"

আমি তাকে দু-মিনিটের একটা সারাংশ বললাম যা ঘটেছে তা সম্পর্কে। অবশ্য আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি যাতে রাঘবকে না বলে। সে বলল সে আমাদের দেখা করার কথাই রাঘবকে বলে নি, আর অন্য কিছু বলার তো প্রশ্নই আসে না। আর মানুষের সম্পর্কগুলো এমনই–বিভ্রান্তির সময়ে বাছাই করা মানুষদের সাথে তথ্য শেয়ার করা আর তথ্য গোপন করা।

আমরা নিজেদের একটা নৃ-তাত্ত্বিক-থিমের রেস্টুরেন্টে আবিষ্কার করলাম। "অঙ্গন, ইন্ডিয়ান খাবারের জন্য," সে ব্যাখ্যা করল। এটার পাশের জিমে আমাকে নিয়ে গেল সে। আমি ট্রেডমিলগুলো দেখতে পেলাম যেগুলোর সাথে টেলিভিশন লাগানো।

"বাইরে থেকে আনা?" আমি বললাম।

সে মাথা নাড়ল। "মাঝেমাঝে নিজেকে অনেক অপরাধী মনে হয়," বলল আরতি।

মেয়েরা একসাথে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে দেখছি। "কেন?"

"আমি তোমার আর রাঘবের বন্ধুত্ব নষ্ট করে দিয়েছি," সে বলল।

"এটা ঠিক না," আমি বললাম।

সে একটা বেঞ্চ-প্রেসে বসল। আমি একটা ব্যালেন্সিং বল নিয়ে তার উপর বসলাম।

"আমরা তিনজন ছোটবেলায় বন্ধু ছিলাম। আর কি হল এখন?" বলতে বলতে তার চোখ জলে ভরে উঠল।

"জীবন," আমি বললাম। "জীবন এরকমই।"

"আমি না থাকলে তোমাদের মধ্যে এরকম কখনোই হত না।"

"না, তা ঠিক না। আমি তোমার উপযুক্ত না। রাঘব যা করেছে সেটাই ঠিক," আমি বললাম।

"এটা কখনো বলবে না," আরতির কণ্ঠ খালি জিমে প্রতিধ্বনিত হল। "এটা ঠিক না যে তুমি আমার যোগ্য না। তুমি অনেক অনেক ভাল একটা ছেলে, গোপাল। আর আমাদের মধ্যে যথেষ্ট খাপ খায়।"

"কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে ওভাবে ভাব না আমি জানি, আমি জানি। আমার ক্ষুধা লেগেছে। লাঞ্চ কোথায় করব আমরা?"

"এটা মোটেও সেরকম না," সে বলল।

"কি রকম না?"

"মেয়েরা ওরকম না। এটা কখনো টাইমিংয়ের ব্যাপার, কখনো তুমি কিরকম চাপ দিচ্ছ তার উপর নির্ভর করে।"

"আমি তোমাকে রিলেশনশিপের জন্য যথেষ্ট চাপ দেই নি?"

"তুমি অতিরিক্ত চাপ দিয়েছ," বলে সে চোখ মুছল।

তাকে সান্ত্বনা দেব কিনা বুঝতে পারছি না। এক, সে এখন অন্য আরেকজনের। দুই, সে তার কাজের জায়গায়।"

আমি এসব ঝামেলায় না গিয়ে বিশ পাউন্ডের একটা ডাম্বেল তুলে নিলাম। এটা যথেষ্ট ভারি কিন্তু আরতির সামনে এটা সহজেই তুলে নেয়ার ভান করলাম। রাঘব নিশ্চয়ই আমার থেকে দ্বিগুণ বেশি তুলতে পারত, ভাবলাম। *ওহ্ আমি কেন সবসময় ফালতু ব্যাপার নিয়ে রাঘবের সাথে তুলনা করি?*

"আমি সরি," বললাম তাকে। "আমি তোমাকে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে থাকলে দুঃখিত।"

"তুমি এমন সময়ে এলে যখন আমি সত্যিই এসব কিছু অনুভব করি নি। তুমি অনেক বেশি চাইলে। তুমি আমার উপর নির্ভর করতে চাইলে। আমার মনে হয় নি তোমাকে সাপোর্ট দেবার মত এতটা শক্তি আমার আছে।"

"কি হচ্ছে এসব? আজকে কি আমার পারফর্মেন্স মূল্যায়নের দিন?" আমি বললাম। ডাম্বেলটা রেখে দেয়ার আগে পাঁচবারের একটা সেট করে ফেললাম।

"আমি আসলে বলতে চাচ্ছি...আমি জানি না কেন। আমার মনে হচ্ছে তোমার সাথে কথা বলা দরকার।"

"অথবা শোনা দরকার," বললাম আমি।

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম।

"হ্যা, ঠিক তাই। তুমি আমার সম্পর্কে কেমন জান, গোপাল?"

"তোমার সম্পর্কে অনেক অনেক ভাল করেই জানি," বলে আমি হাসলাম।

"চালু হওয়ার আগেই কি তুমি রুমগুলো দেখতে চাও?" সে বলল।

"অবশ্যই। আমরা কোথায় খাব?"

"স্টাফ ক্যান্টিনে," সে বলল।

আমরা স্টেইনলেস স্টিলের এলিভেটর দিয়ে থার্ড-ফ্লোরে গেলাম। তার কাছে একটা মাস্টার কি-কার্ড আছে যেটা দিয়ে যেকোন রুমে ঢোকা যায়।

"আমার অবশ্য হোটেলে কাউকে নিয়ে আসার অনুমতি নেই," সে বিশ্বাসের সাথে তার গোপন কথা বলল।

"তো?" আমি বললাম। বুঝতে পারছি না এর মানে কি আমাদের চলে যাওয়া উচিত?

"আমি বলতে চাচ্ছি তুমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমার জন্য চাকরির ঝুঁকি নিচ্ছি।"

"তারা তোমাকে ছাটাই করলে আমি তোমাকে নিয়ে নিব।"

আমাদের চোখাচোখি হল। হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা। কয়েক বছর ধরে এরকম একটা মুহূর্ত আমরা পাই নি। স্কুলে থাকতে আমরা এভাবে হাসতাম–একসাথে এবং তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে–ক্লাসের কোন বাচ্চা ঢেকুর তুললে, সে টিচারদের অনুকরণ করলে, ইতিহাস ক্লাসে আমি ঘুমের ভান করলে।

সে ৩১০৩ নম্বর রুমটা খোলল। আমার সারজীবনে এত বিলাসবহুল জায়গা দেখি নি। "দারুণ," আমি বললাম।

"তাই না?" সে বিশাল বিছানায় বসল যেটার উপর উজ্জ্বল লাল রঙের ছয়টা কুশন রাখা। "এ বিছানাটা যেন স্বর্গ! বসে দেখ।"

"তুমি নিশ্চিত?" আমি বললাম।

"বস না," সে বলল।

আমরা পাশাপাশি বসলাম, আমি বিছানার কিনারায়।

"এটা আসলেই চমৎকার," বললাম, যেন আমি একজন ম্যাট্রেস বিশেষজ্ঞ।

"এখানে শুয়ে থাকা আরও আরামদায়ক," সে বলল।

আমি তার দিকে তাকালাম, বিস্মিত। সে আমার ভাবমূর্তি দেখে তার পেটে হাত রেখে হাসিতে ফেটে পড়ল।

"আমি বলছি না চল শুতে যাই," সে বলল। "তুমি কবে থেকে এরকম সিরিয়াস হলে?"

পরবর্তি বিশ মিনিট আমরা লাইটের সুইচ আর বাথরুমের ট্যাপ নিয়ে খেললাম। আমি কখনো তার সাথে এরকম নির্জন জায়গায় থাকি নি। আমার মাথায় এসব ভাবনা চলছে। আর আমি বাতাসে একটু টেনশনের উপস্থিতি টের পাচ্ছি। হয়তো টেনশন শুধুমাত্র আমার দিক থেকেই।

"চল চলে যাই," ঘড়ি চেক করলাম। আমাকে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পাসে চলে যেতে হবে।

"ঠিক আছে," বলে সে বেসিনের ট্যাপ বন্ধ করল।

আমরা রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। কড়কড়ে নতুন স্যুট পরা একজন লোক আমাদের দেখে ফেলল।

"আরতি?" সে অবাক হয়ে বলল।

আরতির মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"স্যার," সে বলল। আমি তার স্যুটের ট্যাগে নাম লেখা দেখলাম। বিনায়াক শাস্ত্রী, খাদ্য ব্যবস্থাপক।

"আপনি এখানে কি করছেন?" সে বলল।

"স্যার," ইনি মিঃ গোপাল মিশ্রা। আমাদের ক্লায়েন্ট।"

"আমরা তো এখনো চালুই করি নি," সে বলল, এখনো সন্দিহান।

"হাই," আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম। "আমি গঙ্গাটেক গ্রুপ অব কলেজের ডিরেক্টর।"

সে হ্যান্ডশেক করল।

"আমরা কলেজের একটা অনুষ্ঠান এখানে করতে আগ্রহী," বললাম তাকে।

আমরা এলিভেটরের দিকে এগোতে লাগলাম। আমি যখন আশা করছি সে যেন আর কোন প্রশ্ন না করে ঠিক তখনই সে বলল, "কি ধরনের অনুষ্ঠান?"

"আমাদের প্লেসমেন্টের জন্য যেসব বড় কোম্পানিদের আমন্ত্রণ জানাব তাদের নিয়ে ডিনার হবে," আমি বললাম।

আরতি আমার দিকে একবারও তাকাল না।

"অবশ্যই, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আনন্দিত হব," বিনায়াক বলতে বলতে আমাকে তার কার্ড দিল।

আমি বুঝতে পারলাম আমাদের স্টাফ ক্যান্টিনে লাঞ্চের চিন্তা বাদ দিতে হবে।

"আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তবে আমার টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে," লবিতে চলে আসলে আমি বললাম।

আরতি আমার দিকে তাকিয়ে প্রফেশনালদের মত হাসি দিয়ে রিসিপশন ডেস্কের পেছনে উধাও হয়ে গেল। আর আমার গাড়ি আসা পর্যন্ত বিনায়াক আমার সাথেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

"কিন্তু রুম দেখার দরকার হল কি জন্য?" বিনায়াক বলল।

"আমাদের গেস্ট ফ্যাকাল্টি থাকবে। সম্ভবত বিদেশ থেকে," আমি বললাম। আর ঠিক সে সময়ই সৌভগ্যক্রমে আমার ড্রাইভার গাড়ি বারান্দায় এসে থামল।

অধ্যায় ২৪

পরবর্তি দু-মাসে প্রথম ব্যাচের দুশ' সিটের মধ্যে একশ' আশিটা সিট পূরণ করতে পারলাম। প্রথমবারের মত আমি শুকলাজি'র হিসাবরক্ষককে টাকা দিলাম। অনেক স্টুডেন্ট ক্যাশ টাকা দিয়েছে। বিশেষ করে কৃষকের সন্তানেরা চটের ব্যাগে করে বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত টাকা নিয়ে এসেছে।

"আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দিন," একজন কৃষক জোরহাতে মিনতি করে বলল।

এটা জীবনকে সহজ করে তোলে। চাকরি আর যৌতুকের বাজারে বিটেক ডিগ্রি একরকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ডিন শ্রীবাস্তব আর তার বিশজনের দল ক্লাসের বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। আমি নিজেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখি যেমন, হোস্টেলের মেস ঠিকভাবে চলছে কিনা, নতুন স্টাফ নিয়োগ দেয়া, কন্সট্রাকশনের বাকি কাজগুলো সময়মত হচ্ছে কিনা এসব বিষয় তদারকি করি। আমার সামাজিক চলাফেরা কমে গিয়েছে। সপ্তাহে একবার ফ্যাকাল্টিদের সাথে ডিনার করি, আসলে কাজের বিষয়ে কথা বলার জন্য। মাঝেমধ্যে শুকলাজি'র বাসায় রাতে ঘুমিয়ে গিয়েছি।

"তুমি ইন্সিটিউটের ডিরেক্টর। তোমার ছোট পুরনো বাসায় থাকলে চলবে?" সে একদিন অতিরিক্ত হুইস্কি খাওয়ার পরে বলল।

"ফ্যাকাল্টি বাংলো কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। বেশিরভাগ রাত আমি অফিসেই কাটিয়ে দিই," আমি বললাম।

আর আরতি আমার জীবনে আবার ফিরে এসেছে, একমাত্র মানুষ যার সাথে আমি কাজ ছাড়াই দেখা করি। রামাদা খুলেছে, সে কাজে জয়েন করেছে আর লবিতে গেস্ট রিলেশন্স ডেস্কে সুন্দরভাবে বসে থাকে। তার কাজের প্রথম দিনে আমি তাকে একবক্স চকলেট আর ফুল পাঠিয়েছি। আমার হয়তো পাঠানো ঠিক হয় নি, কিন্তু আমি ভাবলাম দিনটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর আমি সাবধান ছিলাম, তোড়াতে শুধুমাত্র সাদা গোলাপ ছিল বন্ধুত্বের জন্য–কোন লাল গোলাপ না।

"হেই, থ্যাঙ্কস। আসলেই দারুণ!!" তার এসএমএস এল।

আমি মেসেজটা পঞ্চাশবার পড়লাম। শেষমেষ একটা রিপ্লাই লিখলাম। "তোমাকেও ধন্যবাদ, তোমার জন্য চমৎকার ক্যারিয়ার অপেক্ষা করছে।"

সে দশ মিনিট পরে রিপ্লাই করল। "তোমাকে আমার কাছে এত দারুণ কেন লাগে?"

এর কোন উত্তর আমার কাছে নেই। আমি মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য ট্রিক খাটালাম। সন্দেহে থাকলে একটা স্মাইলি পাঠাও।

আমি তিনটা পাঠালাম। ☺

সে মেসেজ দিল: "কাজের শেষে দেখা করবে? সাতটায় সিসিডি-তে?"

"অবশ্যই, আমি তড়িঘড়ি করে রিপ্লাই দিলাম।"

ক্যাম্পাস থেকে গাড়ি চালিয়ে সিগড়ায় গেলাম তার সাথে দেখা করতে। সে আমাকে তার সারাদিনের কাজের কথা বলল। সে পাঁচজন জার্মানকে হোটেলে উঠতে সাহায্য করেছে, দশজনের একটা জাপানী প্রতিনিধি দলের জন্য তিনটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে আর একজন আমেরিকানের রুমে একটা সারপ্রাইজ বার্থডে কেক পাঠিয়েছে। তাকে দেখে খুশি মনে হল। আমার মনে হয় না সে এয়ার হোস্টেস না হতে পারায় দুঃখিত।

"তো, আজ আমরা দেখা করলাম। অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় কি কর তুমি?" সে বলল।

"তেমন কিছু না। ক্যাম্পাসেই থাকি। কাজ করি," আমি বললাম।

"এটা কিছু হল? বন্ধুদের সাথে দেখা কর না?" সে বলল।

আমি মাথা দোলালাম। "কলেজে আমার কলিগরা আছে। তাদের সাথে দেখা করাই যথেষ্ট।"

সে আমার হাত ধরল। "তোমার বন্ধু থাকা দরকার। আমাকে দেখ, আমার সাথে তুমি আছ।"

"আর রাঘব?"

"সে পত্রিকায় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে। তার হাতে একটুও সময় নেই..." সে তার হাত সরিয়ে নিয়ে বলল। আমাকে বলে নি রাঘব আমাদের দেখা করার ব্যাপারে জানতে পারলে কি মনে করবে, বরং আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে শুধু বলেছে রাঘব জানতে পারবে না।

"তোমার উচিৎ কাজের শেষে বন্ধুদের সাথে দেখা করা," তার কথা শুনে মনে হল সে নিজেকেই বোঝাচ্ছে।

"আমি হয়তো তোমাকে আমার হোটেলের কথা বলতে বলতে বিরক্ত করে ফেলি কিন্তু..."

"তুমি কখনোই আমাকে বিরক্ত কর না। যদি তুমি একটা কথাও না বল তবুও না," আমি বললাম।

এভাবেই আরতি আর আমি 'কাজের-শেষে-দেখা-করা-বন্ধু' হয়ে গেলাম। আমরা সপ্তাহে দু দিন দেখা করি, মাঝেমধ্যে তিনদিন। নতুন নতুন রেস্টুরেন্টে খাই, ক্যাফেতে ক্যাফেতে ঘুরি, রবিদাশ পার্কে হাঁটি আর মাঝেমধ্যে মুভি দেখি।

আমাদের কিছু অনুচ্চারিত নিয়ম আছে। আমরা ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলি না, আর বেশিরভাগ সময় একজন আরেকজনকে টেক্সট পাঠাই। আমরা কখনোই অতীতের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি না অথবা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা

করি না। আমি কখনোই তাকে স্পর্শ করি না, যদিও সে মাঝেমধ্যে কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে। মুভি থিয়েটারে আমরা আলাদা আলাদাভাবে প্রবেশ করি আবার আলাদা আলাদাভাবে বের হই। বারানশির ছেলে আর মেয়েরা এরকমই করে অবশ্য। রাঘব যখন কল করে, আমি তার কয়েক পা সামনে চলে যাই যাতে তার কথা শোনা না যায় আর অবশেষে যখন রাঘবের কাজ শেষ হয় আরতি চলে যায়।

আমি নিজেও জানি না কেন আমি তার সাথে সাথে থাকছি। তার বয়ফ্রেন্ডের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে সাথে থাকি। আমার ধারনা আমার কাজে বিরতি দরকার, যেটা আমি এখানে পাচ্ছি। আর এটা যখন আরতির সাথে, আমার কারণ সম্পর্কে ভাবার কোন অবকাশই থাকে না।

"তো, রাঘবের কোন ধারণাই নেই যে আমরা দেখা করছি?" একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে মাথা দুলিয়ে ঠোঁট থেকে কফি মুছল।

উদ্বোধন দিনের ঝামেলার পর থেকে রাঘব আমার জীবন থেকে দূরেই ছিল। কিন্তু সে তার পুরনো অভ্যেস থেকে বেশি দিন দূরে থাকতে পারে নি।

বারানশি নগর নিগাম খাচ্ছে ঘুষ, নির্মানকাজে দুর্নীতি

—রাঘব কাশ্যপ, স্টাফ রিপোর্টার

কলেজ চালু করার একমাসের মধ্যেই এ খবর দেখে আমি লাফিয়ে উঠলাম। সে মাঝেমধ্যে কালোবাজারি রেশনের দোকানের মালিকের কথা, কালোবাজারে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে, আরটিও অফিসার ঘুষ নিচ্ছে যেগুলো নিয়ে মানুষ মোটেও মাথা ঘামায় না, সেসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লিখেছে। আমি এ আর্টিকেল নিয়েও মাথা ঘামাতাম না যদি সে গঙ্গাটেকের নাম না লিখত।

আমি কয়েক লাইন পড়লাম।

আর্টিকেলে বলা হয়েছে, "অদ্ভুতভাবে অসঙ্গত অনুমোদন আর সেগুলোর মাধ্যমে নির্মিত অবৈধ দালান আমাদের চোখের সামনে অহরহ দেখা যাচ্ছে। অন্যসব দুর্নীতি যেখানে গোপনে করা হচ্ছে (যেমন গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান), সেখানে এ বিষয়ের প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। কৃষিজমি কলেজে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর তারপর যতদূর সম্ভব নিয়মকানুন উপেক্ষা করছে। কলেজের পাশেই শপিংমল তৈরি হতে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদ, যারা আমাদের এসব সমস্যা থেকে রক্ষা করবে তারাই বরং এসবের সাথে যুক্ত। এখানেই শেষ নয়, শহরে নতুন হোটেল হচ্ছে, আবাসিক ভবন, অফিস বিল্ডিং হচ্ছে যেখান থেকে ভিএনএন তাদের অংশ ঠিকই বুঝে নিচ্ছে। অনুমোদনের নিয়ম-কানুন, আর ভিএনএন যা অনুমোদন করেছে তাদের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের প্রমাণ আমাদের হাতে আছে..."

নিচের বক্সে বিতর্কিত অনুমোদগুলোর একটা তালিকা দেয়া আছে।

আমি তালিকাটা পড়লাম :

- ভি-কোন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, লো-ফ্লাইং জোনে দশ তলা একটা টাওয়ার।
- হোটেল ভেনটো, যেটার নির্মাণকাজে পাশের একটা পার্ক দখল হয়ে আছে।
- গঙ্গাটেক কলেজ–কৃষিজমি রহস্যময়ভাবে অনুমোদন পেয়েছে। আর কলেজ বিল্ডিং গ্রহনযোগ্য ফ্লোরস্পেস ইনডেক্স না মেনে করে তৈরি করা হয়েছে।

আমি পত্রিকাটা ছুড়ে ফেলে দিলাম। শুকলাজি'র সাথে খুব কষ্ট করে সম্পর্কের উন্নতি করেছি। তাকে আমি বলেছি রিপোর্টার আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং আর কখনো এসব বিষয় তুলবে না। আমি জানি রাঘব সেদিনের 'সরি'-র প্রতিশোধ নিচ্ছে। সে নিশ্চয়ই গঙ্গাটেকের বিল্ডিং প্ল্যান তার ভিএনএন'র বদমাশ স্পাই থেকে জেনেছে।

আমি আমার ফোন হাতে নিলাম। শুকলাজিকে কল করার আগে সে-ই আমাকে কল করল।

"আমি জানি না এসব কিভাবে ঘটল," বললাম তাকে।

"দৈনিকের সবগুলো একেকটা বানচোত," শুকলাজি বলল।

"এই সাংবাদিকটাকে এসব বন্ধ করতে হবে..." আমি বললাম।

"এটা সাংবাদিক না। নিশ্চয়ই বিরোধীদলের কাজ এগুলো।"

"আমি ঠিক জানি না, স্যার।"

"অথবা আমার দলের কেউ? ঈর্ষাকাতর বাস্টার্ড আমার দুর্নাম রটাতে চাচ্ছে।"

"আমার তা মনে হয় না, স্যার।"

"কি?"

"এটা সাংবাদিকের কাজ। আমি তাকে আগে থেকেই চিনি। সে একরকম বিদ্রোহী টাইপের। তাছাড়া, তাকে আমার কাছে মাফ চাইতে হয়েছে। এখন সেটার প্রতিশোধ নিচ্ছে।"

"কে?"

"রাঘব কাশ্যপ, তার নাম আর্টিকেলে আছে।"

"তার শাস্তি আমি হারাম করে দিব," শুকলাজি বলল।

"আমি কি তাকে কল করব?" বললাম তাকে।

"না। আমি তার সিনিয়রদের সাথে কথা বলব।"

"এ আর্টিকেলে কোন সমস্যা হবে আমাদের?"

"যদি ভিএনএন কল করে, আমার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে," শুকলাজি বলল।

ভিএনএন'র কোন অফিসার কল করল না, বরং তারা আমার কলেজে চলে এল। অফিসাররা খালি হাতে আসে নি, সাথে দুটো বুল্ডোজার নিয়ে এল।

দুনিয়া কাঁপানো শব্দে ক্লাস বিঘ্নিত হওয়ায় স্টুডেন্টরা ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে

বাইরে তাকাচ্ছে। আমি দৌড়ে গেটে এলাম।

"গেট খুলুন, আমরা উচ্ছেদ অভিযানে এসেছি," সস্তা সানগ্লাস আর হলুদ প্লাস্টিকের হেলমেট পরা একজন লোক বলল।

"কি?" বললাম আমি।

"আমাদের অর্ডার আছে," ভিএনএন অফিসার বলল। সে তার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল।

আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। "আপনারা কি উচ্ছেদ করবেন?"

"মেইন বিল্ডিং। এখানে অবৈধ কন্সট্রাকশন হয়েছে," সে অবজ্ঞার সুরে বলল।

রুক্ষ সকালের সূর্যের আলো আমাদের মুখে পড়ল। "আমরা একটু কথা বলতে পারি?" আমি বললাম।

সে তার মাথা দোলাল।

আমি ফোন বের করে শুকলাজিকে কল করলাম, সে ফোন ধরল না।

"এটা এমএলএ শুকলা'র কলেজ। আপনার নাম কি, স্যার?" আমি বললাম।

"রাও। আমি অমৃত রাও। এমএলএ না পিএম আপনি যা বললেন তা আমার দেখার বিষয় না।"

অনেক কষ্টে আমি তাকে দশ মিনিট ধৈর্য ধরতে রাজি করতে পারলাম। সে বুল্ডোজারগুলোর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। আমি পিয়নকে বললাম সবার জন্য বরফ দিয়ে সফট্ ড্রিংকস আনার জন্য। শুকলাজি'র নাম্বারে কল করেই গেলাম। সে অষ্টম বারে ফোন ধরল।

"কি হচ্ছে গোপাল? সিএম-কে কল করতে হয়েছিল। এই ফালতু আর্টিকেল বিশাল মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"স্যার, এখানে বুল্ডোজার দাঁড়িয়ে আছে।"

"কি?" শুকলাজি বলল।

"আমি রাওকে ফোনটা দিলাম, সে এমএলএ-কে তার মিশন বলল। তবে অন্য প্রান্ত থেকে এমএলএ কথা বললে সে চুপ হয়ে গেল। রাও শুকলাজি'র সাথে কথা বলার জন্য দশ মিনিট একপাশে সরে দাঁড়াল।

আমার ফোন ফিরিয়ে দিল রাও। "শুকলাজি আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।"

"স্যার?" আমি বললাম, এখনো হতবাক।

"অফিসে কত ক্যাশ আছে?" শুকলাজি জানতে চাইল।

"সঠিক জানি না স্যার। প্রায় দু-লাখের মত আছে নিশ্চিত।"

"ওটা তাকে দিয়ে দাও। নোটগুলো একটা খালি সিমেন্টের ব্যাগে ভরে উপরে বালি দিয়ে ভরে দাও।"

"জি স্যার," আমি বললাম।

"তার কলিগরা যেন দেখতে না পায়। তার সুনাম আছে, তা যেন ক্ষুণ্ন না হয়।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"আর তাকে কিছু একটা ভাঙতে হবে। সে উচ্ছেদের ছবি না নিয়ে যেতে পারবে না।"

"কি?"

"এমন কিছু আছে যেটা আংশিক নির্মান হয়েছে আর এখনই দরকার হচ্ছে না?"

"স্যার, স্টুডেন্টরা ভাঙচুর দেখতে পাবে," আমি বললাম।

"কিছুই করার নেই। তোমার সাংবাদিক বন্ধু লাথিটা মেরেছে..."

"সে এখন আমার বন্ধু নেই, স্যার," আমি বললাম।

"সে আকাজ তো করেছে। যাহোক, এখন বল কোনটা সহজে ভাঙা যাবে আর ঠিক করতে সবচেয়ে কম খরচ হবে?"

"মেশিনিং ল্যাব। মেশিনগুলো আমরা অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলি," আমি বললাম।

"তাহলে তাই কর। তারপর ল্যাবের বাইরে ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখ। তাদের বাকি কাজ করতে দাও। সিমেন্টের ব্যাগের কথা ভুলে যেও না।" শুকলাজি লাইন কেটে দিল।

আমি সিকিউরিটি গার্ডকে গেট খোলার ইশারা করলাম। রাও আমার দিকে তাকিয়ে একটা তেলতেলে হাসি দিল।

অধ্যায় ২৫

"আমি আজকে মুভি দেখতে পারব না। দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে চলে যেতে হবে।" আরতি আমার ইনোভার মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ভ্রু নাচাল।

আমি *রক অন* ছবির সাড়ে সাতটার শো-এর টিকিট নিয়ে তার হোটেলের সামনে এসেছি তাকে তুলে নিতে।

"তুমি কি এগুলো ফেরত দিতে পারবে?"

আমি টিকিটগুলো ছিঁড়ে ফেললাম।

"গোপাল!" সে বলল। "কি করছ তুমি? আমাকে জিজ্ঞেস না করে টিকিট কিনে আনাই তোমার ঠিক হয় নি।"

"তোমাকে এরকম উদ্ভ্রান্ত লাগছে কেন?"

"এটা রাঘবের একটা ব্যাপার। আমার তার সাথে থাকা দরকার।"

"কি?" আমি বললাম।

"রাঘবের বিষয়ে কথা বলা যাবে না। এটা কার নিয়ম, মিঃ মিশ্রা?"

"আমার। কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি প্ল্যান বাতিল করছ কেন?"

"আমি তোমাকে বলব। তুমি কি আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিতে পারবে?"

"ডিএম-এর বাংলো," আমি ড্রাইভারকে বললাম।

"এটা তোমার মধ্যেই রাখবে, ঠিক আছে?" আরতি বলল। "সে আমাকে বলেছে কাউকে না বলতে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, তাই না?"

"এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে?" আমি বললাম।

"ঠিক আছে, রাঘব তার চাকরি হারিয়েছে," সে বলল।

"কি?" আমি বললাম। উষ্ণ আনন্দের একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস আমার মধ্যে প্রবাহিত হল।

"আমি অবাক হয়ে গেলাম। দৈনিক তাকে সাংবাদিকতার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলত," আরতি বলল।

"তারা কোন কারণ দেখিয়েছে?" আমি বললাম। যদিও কারন তার পাশেই বসে আছে।

"জানি না। সে কিছু বলে নি। শুধু বলেছে ব্যবস্থাপনা পরিষদ তাকে বলেছে চলে যেতে।"

"ছাটাই?" আমি অবাক হবার ভান করে বললাম। "তারা মন্দার সময় খরচ কমাতে অনেক স্টাফ ছাটাই করে থাকে।"

"একজন ট্রেইনি সাংবাদিককে ছাটাই করে তুমি আর কয় টাকা বাঁচাবে? আর

দৈনিক তো ভালই করছে।"

গাড়ি আরতির বাড়ির সামনে পৌছাল।

"সে কি তোমার বাসায়?" আমি বাইরে আসতে আসতে বললাম।

মাথা দোলাল সে। "আমি তার সাথে গিয়ে দেখা করব। আমি চেঞ্জ করতে বাসায় এলাম।"

"তার কণ্ঠ শুনে কেমন লাগল? মন খারাপ?" বললাম আমি।

"খুব, খুব রেগে আছে," বলে আরতি ভেতরে চলে গেল।

তাকে কল দেয়া মোটেও ঠিক হবে না জানি। এরপরেও আমি গভীর রাতে রাঘবকে কল না করে পারলাম না। আমার জানা দরকার এরকম বেকার অবস্থায়ও তার একগুঁয়েমি কি আগের মতই আছে কিনা। আমি হুইস্কির বড় একটা গ্লাস আমার ডান হাতে, আর ফোন বাঁ হাতে নিলাম।

ভাবলাম সে আমার কল ধরবে না কিন্তু সে তাড়াতাড়িই ফোন ধরল।

"তোর কাছে কি আরেকবার ক্ষমা চাইতে হবে?" তার প্রথম কথা।

"হাই রাঘব," আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম। "কেমন আছিস?"

"খুব ভাল। এমন কি হয়েছে যে আমাকে কল করতে হল?"

"আমার সাথে রাগ করিস না," আমি বললাম।

"রাগ তাদের সাথেই করা যায় যারা গুরুত্বপূর্ণ," রাঘব বলল।

"চাকরিটা তোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"

"বাই গোপাল," সে বলল।

"আমি তোকে বলেছিলাম আমাদের নিয়ে এসব ফালতু বিষয় না লিখতে," আমি বললাম।

"আমার কাজ কিভাবে করব সে বিষয়ে তোর কাছ থেকে উপদেশ নিতে হবে না নিশ্চয়ই।"

আমি হুইস্কির গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিলাম। "ওহ, তাই তো, সেটা তুই কিভাবে পারিস? বিএইচইউ থেকে পাশ করা কেউ অশিক্ষিত লোকের কাছ থেকে উপদেশ নেবে কিভাবে?"

সে চুপ করে থাকলে আমি আমার গ্লাস আবার ভরে নিলাম। হুইস্কি আমাকে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলল।

"এটা পড়াশোনার কোন বিষয় না, গোপাল। আসলে তুই এমন হয়ে গিয়েছিস কেন? আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না!"

"বড়লোক, সফল। বিশ্বাস করা কঠিন, তাই না? আর যে জেইই-তে চান্স পেয়েছে সে বেকার।"

"আমি চাকরি খুঁজে নিতে পারব। আর তোর এমএলএ-কে বলিস, সে দৈনিকের একজন ট্রেইনিকে ছাটাই করিয়েছে তার মানে এই না যে সত্য চিরতরে চেপে থাকবে।

"আমি তোকে চাকরি দিতে পারি, রাঘব। আমার জন্য কাজ করবি?"

উত্তরে একটা ক্লিক শুনতে পেলাম।

"রেভুল্যুশন ২০২০," আরতি বলল। তার চিবুক হাতের উপর আর দুটো কনুঁই টেবিলের উপর রাখা।

আমরা রামাদা হোটেলের কফিশপে এসেছি। এটা তার জন্য ছুটির দিন। সে চাইলে যেকোন পোশাকে রেস্টুরেন্টগুলোতে যেতে পারে। ওয়েটাররা তাকে চিনতে পেরে হাসছে, সে-ও তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। রাঘবের চাকরি হারানোর পরে সে আমার সাথে তেমন দেখা করে নি যেহেতু সে রাঘবের সাথে থাকতে চেয়েছে। অবশেষে তার সাপ্তাহিক ছুটিতে আমি তাকে দেখা করতে রাজি করেছি।

"এটা আবার কি?" আমি বললাম।

"কোন প্রশ্ন করবে না। রেভুল্যুশন ২০২০–যখন আমি তোমাকে বলছি, তখন তোমার মাথায় কি আসছে? কি হতে পারে?"

সে আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। আমি খেয়াল করলাম সাদামাটা কমলা রঙের টি-শার্ট আর কালো জিন্সে তাকে কতটা আকর্ষণীয় লাগে।

"নতুন কোন রেস্টুরেন্ট? রামাদা চালু করছে?"

সে হাসলো।

"এখানে হাসির কি আছে?" আমি বললাম। "এই রেভুল্যুশন-২০২০ জিনিসটা কি?"

"এটা নতুন খবরের কাগজ, রাঘবের।"

"তার নিজের পত্রিকা?" আমি চমকে উঠে বললাম।

"হ্যা, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারও চাকরি করবে না।"

সে চাইলেও বারানশির কোন মিডিয়ায় চাকরি পেত না, কমপক্ষে বড় পত্রিকাগুলোতে। শুকলাজি প্রধান প্রধান সম্পাদকদের বলে দিয়েছে। আরতি অবশ্যই এসবের কিছুই জানে না। এমনকি সে রাঘবের চাকরি হারানোর কারণও জানে না।

"রাঘব বলেছে দৈনিক তাকে কোন কারণ দেখায় নি। এটা কি ঠিক, বল?" সে বলল।

"প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনীতি থাকে। সে এসবের সাথে মানিয়ে নিবে," আমি বললাম।

"সে মানিয়ে নিতে চায় না। সে সাংবাদিকতার দুনিয়াকে বদলে ফেলতে চায়। এটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে চায়," আরতি বলল।

আমরা কফি অর্ডার করলাম। কফির সাথে ওয়েটার আমাদের গরম গরম বিস্কিট আর কেক দিল।

"আমরা কি এগুলো সব অর্ডার করেছি?" বললাম তাকে।

"পরিচিতি," বসে সে চোখ টিপল।

"সে পত্রিকা কিভাবে চালু করবে?" আমি জানতে চাইলাম। "টাকা-পয়সা তো লাগবে।"

"আসলে টাকা না। খবর কি থাকবে সেটাই বিষয়," বলে আরতি কফিতে চুমুক দিল। তার ঠোঁটে একটু ফেনা লেগে গেল।

"আরতি, তুমি কি এগুলা বিশ্বাস কর? তুমি একটা বাস্তববাদী মেয়ে।"

"অসম্ভব কিছু তো না, গোপাল। তুমি একটা কলেজ চালু করেছ। সে এটা কেন পারবে না?"

"আমার পেছনে একজন পেয়েছিলাম–এমএলএ শুকলা, যার টাকা আর যোগাযোগ ছিল।"

"সে তাকে ঘৃণা করে। রাঘব বলে শুকলা বারানশির ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ নেতা," আরতি বলল।

"সেটা অনুমান," বললাম আমি। "এমন কোন সফল মানুষ আছে যার সমালোচনা হয় নি? শুকলার অনেক নাম-ডাক, আর সে উপরে উঠছে। মানুষ তাকে নিচে নামাতে চাইবেই।"

"ঠিক আছে, আমরা কি রাজনীতির আলোচনা বাদ দিতে পারি?" আরতি বলল। "রাজনীতির জিন আমার পরিবার থেকে আমার দাদুর সাথেই বিদায় হয়ে গিয়েছে।"

"তাতে কি হয়েছে? তুমি রাজনীতিতে যোগ দিতে পার," আমি বললাম। "মানুষ তোমার দাদুর কথা এখনও স্মরণ করে।"

সে তার হাত উপরে তুলে মুঠিবদ্ধ করে স্লোগানের অভিনয় করতে লাগল। "আমাকে ভোট দিন, আমি আপনাদের ফ্রি কফি আর বিস্কিট খাওয়াব।" সে হাসলো। "না, ধন্যবাদ। আমি রামাদাতেই ভাল আছি।"

আমিও হাসলাম। "তো আসলে সে কিভাবে শুরু করতে যাচ্ছে তার...রেভলভিং কি যেন?"

"*রেভুল্যুশন ২০২০*। এটা তার লক্ষ্য। ইন্ডিয়ায় ২০২০ সালের মধ্যে একটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত রেভুল্যুশন হবে বলে তার আশা। তরুণদের হাতে ক্ষমতা চলে আসবে। আমরা পুরনো দুর্নীতিগ্রস্ত সিস্টেমকে টুকরো টুকরো করে সেখানে আমাদের নতুন সিস্টেম চালু করব।"

"আর সেটা সে বারানশি থেকে চালু করতে চাচ্ছে?" আমার সন্দেহ আমার কণ্ঠে প্রকাশ পেল।

"হ্যা, অবশ্যই। বড় শহরের ছেলেমেয়েরা এসবের ক্ষতি থেকে কিছুটা মুক্ত। তারা ভাল কলেজে যাচ্ছে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। রেভুল্যুশন শুরু করতে হবে ছোট শহর থেকেই।"

"সে তোমাকে পুরোপুরি তার দলে পেয়েছে," আমি বললাম।

"যে শহর পাপ মোচন করে সেখান থেকে ভাল আর কোন জায়গা হতে পারে?" সে বলল।

তার কণ্ঠে প্রচন্ড উৎসাহ আমি টের পেলাম। হয়তো সে রাঘবের এসব কাজ পছন্দ করছে। তার ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলা, যদিও এসব অদ্ভুত আর উদ্ভট চিন্তাভাবনা। মেয়েরা অবশ্য বাস্তবতা তেমন পছন্দ করে না। অথবা বাস্তবসম্মত প্রশ্ন।

"এ পত্রিকা কাজ করবে কিভাবে? কাগজ, ছাপানো, প্রচারের জন্য টাকা কে দিবে?"

তার মধ্যে গম্ভীর ভাব ফিরে এল। "আসলে এটা পুরোপুরি খবরের কাগজ হিসেবে শুরু হবে না। এটা একটা নিউজলেটার। একটা বড় কাগজ।"

"আচ্ছা?" আমি তাকে আরও বলতে উৎসাহিত করলাম।

"কাগজের একপাশে বিয়ের বিজ্ঞপ্তি থাকবে। বারানশির মানুষেরা যথেষ্ট বিয়ের বিজ্ঞপ্তি দেয়। সে এখানকার পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞপ্তি সেই পাশে ছাপাবে। প্রথমে বিনামূল্যে পরে টাকা দিয়ে। হয়তো কিছু চাকরির বিজ্ঞপ্তিও পাওয়া যাবে।"

"মানুষ প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে এখানে কেন দিবে?"

"*রেভ্যুলুশন ২০২০*-এ বিজ্ঞাপনের মূল্য কম হবে আর এটা একদমই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তুমি তোমার নিজের বাড়ির পাশেই পাত্র-পাত্রী পেয়ে যাবে।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"অন্যদিকে, রাঘব এলাকার খবর ছাপাবে। আর এটা যেহেতু আসল খবরের কাগজ না, সে তার ইচ্ছেমত ঝাঁঝাল আর ধারালো খবর লিখতে পারবে।"

"সে এসব করতেই পছন্দ করে," আমি সম্মতি দিলাম।

"তো, এটাই আসলে। ছাপানোর খরচ কম, আর শুধুমাত্র একটা বড় কাগজ লাগবে শুরু করতে। প্রথম দিকে সে মন্দিরে যোগাযোগ করবে বিজ্ঞাপনের জন্য, তো দেখা যাক কি হয়। নামটা তোমার ভাল লেগেছে?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। সে তার কেকে কামড় বসাল।

"সবাই যার যার কাজ করে গোপাল," আরতি মুখ ভর্তি কেক নিয়ে বলল। "তোমার যেমন কলেজ আছে। তেমনি এটা তার।"

"এতে কখনোই টাকা আসবে না," বললাম তাকে।

"তো?" সে তার কেক আমার দিকে ধরে নাড়ল। "টাকা সবকিছু না।"

"ফাইভ স্টার হোটেলে বসে কেক খেতে খেতে এসব কথা বলা সহজ," আমি বললাম।

সে হেসে তার কেক নিচে নামিয়ে রাখল।

"আমি টাকা পছন্দ করি," আমি বললাম।

"তাতে তো কোন সমস্যা নেই। আমার কথা হল সহজ। টাকা হোক অথবা রেভ্যুলুশন হোক, সবারই তাদের হৃদয়ের কথা শোনা উচিৎ।"

"কখনো কখনো তোমার হৃদয় তোমাকে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে," আমি বললাম।

সে থেমে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা হজম করতে লাগল। "আহহ," বিস্মিত হবার ভান করল সে, "আবারো মর্মমূলে আঘাতের চেষ্টা, তাই না?"

"অবশ্যই না," আমি বললাম। বিল চাইলাম, যেটাতে বিশ পার্সেন্ট স্টাফ ডিসকাউন্ট দেখতে পেলাম।

লবিতে ফিরে এলাম আমরা। "তোমাকে কি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে?" আমি বললাম।

"এক্ষুনি যেতে হবে তা নয়, কেন?"

"বছরখানেক হয়ে গিয়েছে আমি নৌকা বাইছি না," বললাম তাকে।

অধ্যায় ২৬

ফুলচাঁদ, আশী ঘাটের আমার সবচেয়ে পছন্দের মাঝি, আমাকে দূর থেকেই চিনতে পারল। সে আমাকে ফরমাল স্যুট পরা দেখে খুব মজা পেল মনে হল। আমাদের জন্য তার নৌকার বাঁধন খুলে দিল সে। আমি আরতিকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করে ফুলচাঁদকে একশ রুপির একটা নোট দিলাম। সে আমার হাতে ছোট একটা কাগজের প্যাকেট ঢুকিয়ে দিল।

"এটা কি?"

"খাঁটি জিনিস। আমি আগরি সাধুদের কাছ থেকে নিয়েছি। তোমার কাছে ম্যাচ আছে?"

আমি বুঝতে পারলাম সে আমাকে কি দিয়েছে। আরতিও বুঝতে পেরে আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গীতে হাসলো। পানের দোকান থেকে কয়েকটা সিগারেট আর ম্যাচ কিনলাম।

আমি বৈঠা পানিতে নামালাম। আরতি আর আমি একসাথে দূরে ভেসে যেতে লাগলাম।

"অনেক বছর পর। আমি নৌকাভ্রমণ অনেক মিস করেছি রাঘব," সে বলল।

"গোপাল," আমি তার দিকে না তাকিয়েই শুধরে দিলাম।

"কি? আমি কি রাঘব বলেছি নাকি? ওহ্ সরি। আমি খুবই সরি। আমি আসলে বলতে চাই নি..."

"না, ঠিক আছে," আমি বললাম।

আমি নৌকা নদীর অপর পাড়ে নিয়ে গেলাম। বৈঠা অনেক ভারি মনে হচ্ছে। আমার বাহু আগে যখন প্রতিদিন নৌকা বাইতাম তখনকার মত শক্তিশালী নেই। বারানশির প্রধান ঘাটের চারপাশ প্রাচীনকালের স্থাপনা আর মন্দির দিয়ে ভরে আছে। নদীর অন্য পাড়ের বালুময় তীর খুবই নিঃসঙ্গ লাগছে। শামিয়ানা টাঙানো ছোট একটা চায়ের দোকান এখানকার একমাত্র ঘর; মাঝেমধ্যে কোন টুরিস্ট এপাড়ে চলে এলে তাদের প্রয়োজন মেটায়। আমি গাছের একটা খুটির সাথে নৌকা বাঁধলাম। সন্ধ্যার সূর্য বারানশির আকাশকে কমলা রঙে রাঙিয়ে দিল।

"চল হাঁটি," আরতি বাতাস পেতে তার মুখ উপরে তোলে বলল। আমরা নদীর অন্যপাশের ব্যস্ত ঘাটের দিকে তাকালাম। অপর পাড়ের কাজকর্ম দেখতে পেলেও কোন শব্দ আমাদের কানে আসছে না। আমরা কিছুক্ষণ ধীর পায়ে হেঁটে চায়ের দোকানে গিয়ে টুলে বসে চা অর্ডার করলাম।

"ফুলচাঁদ যা তোমাকে দিয়েছে তা কি তুমি খাবে?"

"তুমি যদি কিছু মনে না কর," আমি বললাম।

সে কাঁধ নাড়ল। আমি সিগারেটের প্যাকেট খুললাম। একটার মধ্য থেকে তামাক বের করে শুকনা মারিজুয়ানা ভরে জ্বালিয়ে একটা টান দিলাম।

"আমি কি খেয়ে দেখতে পারি?" সে বলল।

আমি মাথা দোলালাম।

তার ফোন বেজে উঠলে ব্যাগ থেকে সেটা বের করল। তার স্ক্রিন দেখতে পেলাম আমি : রাঘব কলিং।

"হিস! চুপ," সে আমাকে ইঙ্গিত করল। "হাই," সে তার ফোনে বলল। কিছুক্ষণ রাঘবের কথা শুনল।

"সেটা তো দারুণ। হ্যা পন্ডিতজি'র ছবি কাগজে ছাপাও। সে অনেক খুশি হবে। তোমাকে নিশ্চয়ই পাত্র-পাত্রীর তালিকা দিয়ে দিবে," বলে সে হাসলো। "হ্যা," বলে যেতে লাগল সে। "এখনো হোটেলে। এটা একটা ফালতু জায়গা, বন্ধের দিনেও কাজের উপর রাখে...হ্যা, একটা বাসভর্তি ফ্রেঞ্চ টুরিস্ট এসেছে এইমাত্র।"

সে আমাকে ধৈর্য ধরার জন্য ইশারা করল। আমি মাথা ঝাঁকালাম আকাশের রঙ কালো হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে।

"হ্যা বেবি, তোমাকে মিস করছি," আরতি ফোন রেখে দিয়ে সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল।

"কি?" আমি বললাম।

"আমাকে একটু টান দিতে দাও।"

"তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ?"

"কেন? কারন আমি একটা মেয়ে? একদম বারানশির পুরুষদের আসল রূপ বেরিয়ে গিয়েছে, না?"

"এটার গন্ধ লেগে থাকবে।"

"আমি সোজা গিয়ে গোসল করব। আর বেনারসি পান আছে কিসের জন্য? আমি যাওয়ার আগে একটা সুগন্ধি পান খেয়ে নিব," সে বলল।

আমি তাকে সিগারেটটা দিলাম। সে কয়েকবার টান দিল। "এটা আমার উপর কোন কাজ করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না," অসন্তুষ্ট হয়ে বলল সে।

আমরা আমাদের চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। সে হেঁটে পানির কাছাকাছি চলে গেল।

"এসো, পানিতে আরতির প্রদীপ দেখি," সে বলল।

"এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে," আমি বললাম। "আমরা বরং চলে যাই।"

"এখানে থাকতেই ভাল লাগছে আমার কাছে। এসো," বলে সে বালির উপর বসে পড়ল। তার পাশে আমাকে বসতে বলল সে।

আমি তার পাশে বসলাম। "তোমার ফোন আবার বেজে উঠবে।"

"যা ইচ্ছে হোক," সে বলল। "সে যখন *দৈনিকে* কাজ করত তখন মোটেও কল করত না। এখন তার ছুটি, তাই কল করে। তার *রেভুল্যুশন ২০২০* শুরু হলে আবার

সবকিছু আগের মত হয়ে যাবে।"

"সে কি এসব নিয়ে সিরিয়াস?" আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম।

"ওহ, হ্যা। দু-সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম খবর বেরোবে," সে বলল।

আমি সিগারেট শেষ করে পবিত্র নদীর দিকে মনোনিবেশ করলাম। সারা দুনিয়া তাদের পাপ মোচনের জন্য বারানশিতে আসে। তারা কি কখনো একটিবার চিন্তা করেছে বারানশি সম্পর্কে? তারা যে পাপ ফেলে রেখে যাচ্ছে তা নিয়ে এখানকার মানুষ কি করবে? মারিজুয়ানা আমার মধ্যে দার্শনিক ভাব জাগিয়ে তুলেছে।

আমি আমার হাত নাড়াচাড়া করলাম, আবার নৌকা চালানোর জন্য প্রস্তুতি। আরতি আমার ডান হাত তার কোলে নিয়ে ম্যাসেজ করতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

"ভাল না?" সে বলল।

আমি কিছু বললাম না। কিছু করলাম না। আমি আমার হাতও তুলে নিলাম না। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঁকি দিল।

"আজ পূর্ণিমা," সে নরম কণ্ঠে বলল।

"আমাদের নিচের বালুরাশি, তার মুখ আর চাঁদের আলো.... হঠাৎ সে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

"তুমি ঠিক আছ তো?" আমি বললাম।

সে মাথা দোলাল, এখনো চোখ পিটপিট করছে। তার চোখে বালুকণা ঢুকে গিয়েছে। আমি তার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে দু-হাত দিয়ে তার মুখ ধরলাম।

"চোখ খোল," বললাম তাকে।

সে আবার মাথা দোলাল।

"খোল আরতি," আমি দু-হাত দিয়ে তার মাথা ঝাঁকালাম।

সে ডান চোখ খুলল। আমি চোখে ফু দিলাম। "এখন ঠিক হয়েছে?"

মাথা নেড়ে আবার তার চোখ বন্ধ করল সে। আমি তার ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পেলাম।

"তুমি ব্যথা পেয়েছ?" জানতে চাইলাম আমি।

সে ফোঁপাতেই থাকল। আমার কাঁধে তার মাথা রাখল।

"কি হয়েছে আরতি?"

"রাঘবকে নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে। সে যদি ব্যর্থ হয়ে যায়।"

আমি তার মাথার পেছন দিকে ধরলাম। সে আমার বুকে তার মাথা লুকালো। আমার কাছে অদ্ভুত লাগল আমি কিভাবে তার বয়ফ্রেন্ডের বিষয়ে সান্ত্বনা দেব। তবে আমাকে নিয়ে তার অনুভূতি আমার কাছে দারুণ লাগছে।

"তার কোন সমস্যা হবে না। আমি তাকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাঘব যোগ্য। তার কোনই সমস্যা হবে না। সে কিছুটা কল্পনাবিলাসী কিন্তু মনের দিক থেকে ভাল," আমি বললাম।

সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, তার মুখে বিশ্বাসের ছাপ।

আমি তার চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। "তুমি আমার প্রতি সবসময় যত্নশীল। আমি এটা সবসময় মিস করি," সে বলল।

আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র নিঃশ্বাসের দূরত্ব। এ নৈকট্য আমাকে বিমূঢ় করে দিল, আমি কথা বলতে পারলাম না।

"মন খারাপ থাকলে কথা বলার মত আমার কেউ নেই। তোমাকে ধন্যবাদ," সে বলল।

গঙ্গা থেকে পানির ঝাঁপটা আমাদের উপর এসে পড়ল। আমি আমার মুখ এগিয়ে নিতে একপ্রকার বাধ্য হলাম। আমার ঠোঁট তার ঠোঁটের সংস্পর্শে এল। সে যদিও আমাকে চুমু খেল না। সে সরেও গেল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি–খুব তাড়াতাড়ি–সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"গোপাল!" সে বলল।

আমি কিছুই বললাম না। আমি আসলে এরকম কিছুই আশা করেছিলাম। আসলে, আমি আরও বকা আশা করেছিলাম।

"আমি সরি," বলেই অন্য দিকে তাকিয়ে রইলাম। দূরে দেখতে পেলাম আরতির প্রদীপগুলো পানিতে কাঁপছে। আমাকে যেন ভর্ৎসনা করছে।

"চল চলে যাই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে," সে বলল। মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে নৌকার দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে যেতে লাগল। আমি চা দোকানদারকে টাকা দিয়ে তাকে ধরার জন্য দৌড় দিলাম।

"আমাকেই নৌকা চালিয়ে তোমাকে দিয়ে আসতে হবে। তুমি দৌড়ে যেতে পারবে না," আমি বললাম।

সে চুপ করে থাকল। আমার দিকে একবারও তাকাল না। ঠিক আছে, আমি মেনে নিলাম আমি ভুল করেছি, কিন্তু আমার সাথে এরকম ব্যবহার করা তার মোটেও ঠিক হচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত আগে সে আমার হাত ম্যাসেজ করে দিয়েছে, আমার বুকে মাথা লুকিয়েছে। সে নৌকায় আমার থেকে যত দূরে সম্ভব গিয়ে বসল।

আমি জোরে জোরে বৈঠা চালাতে লাগলাম।

"আমি সরি বলেছি," মাঝপথে বললাম আমি।

"দয়া করে আমরা কথা না বলে থাকতে পারি?" বলল সে।

মাঝি আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারল।

"*মালটা* ভাল হয় নি?" ফুঁলচাদ জিজ্ঞেস করল। আমি জবাব দিলাম না।

আরতি হেঁটে চলে যেতে থাকল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমাকে নামিয়ে দিব," বললাম আমি।

"আমি অটো নিয়ে নিব," বলে সে আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল।

অধ্যায় ২৭

বাবার মৃত্যুতেও আমি এতটা নির্ঘুম হই নি। আর আরতির আশী ঘাট থেকে চলে যাওয়ার দু-রাত পরেও এখন রাত চারটায় আমি আমার অফিসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি। এতটা ঘাবড়ে গিয়েছি যে তাকে কল বা মেসেজ পাঠানোর সাহস হচ্ছে না। যদিও তাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। তার চেহারা, সিক্ত চোখ আর আমার ঠোঁটে তার ঠোঁট...আমি কন্ট্রাকটরের দেয়া আমার নির্মিতব্য বাংলোর বাথরুমের প্ল্যানের দিকে মনযোগ দিতে পারছি না। আমি ফ্যাকাল্টি মিটিংয়ে ভুতের মত বসে থেকেছি, আর বারবার মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়েছি।

"কোন কল আশা করছেন, স্যার," ডিন শ্রীবাস্তব বলল।

আমি মাথা দোলালাম, আসলে ফোনটা দেখার জন্য। *ঈশ্বর মেয়েদের এত ক্ষমতা দিয়েছেন কেন? তারা কিভাবে ব্যস্ত, কর্মঠ আর উচ্চাকাঙ্খী একজন মানুষকে নির্জীব অকর্মা বানিয়ে ফেলে?*

"স্যার, তাহলে আপনি আগামি সপ্তাহে মিড-টার্ম পরীক্ষা শুরু করার ব্যাপারে একমত?" অমল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর বলল।

"হ্যা," সে যদি আর ফোন না করে তাহলে আমি কি করব ভাবতে ভাবতে কোনমতে বললাম।

আমার তৃতীয় নির্ঘুম রাতে দু-টার সময় আমার ফোন বেজে উঠল।

সে মেসেজ পাঠিয়েছে : "কল বা মেসেজ করবে না।"

সে কেন এমন মেসেজ পাঠাল? আমি তো তাকে কল বা মেসেজ করি নি।

আমি ফোন হাতে নিয়ে বসে আছি এমন সময় সেটা আরেকবার বেজে উঠল।

"কখনো না," তার মেসেজে লিখা।

সেও ঘুমুচ্ছে না, আমার বিষয়ে ভাবছে–আমার আশাবাদী, অযৌক্তিক মন কাজে নেমে পড়ল। *সে এই মেসেজ কেন লিখেছে? মেয়েদের ভাষায় এসবের মানে কি? যদিও মেয়েদের ভাষায় অনেক সময় তারা যা চায় তার উল্টো বলে, তার মানে কি–আমাকে কল কর?*

"ঠিক আছে," আমি রিপ্লাই করলাম। একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম কিন্তু সে কিছুই করল না।

কিছুক্ষণ পরেই আমি তাকে নিয়ে নৌকা ভ্রমণের একটা স্বপ্নে ডুবে গেলাম।

সকালের খবরের কাগজ থেকে উজ্জ্বল একটা গোলাপি এ-থ্রি সাইজের কাগজ নিচে

পড়ল। আমি ভাবলাম এটা কোন ট্রাভেল এজেন্সি অথবা পড়াতে চাই ধরনের বিজ্ঞাপন। কিন্তু এতে পত্রিকার মত শিরোনাম দেখতে পেলাম। আহা, আমি তাচ্ছিল্যের সাথে হাসলাম, দুনিয়া বদলের জন্য রাঘবের প্রচেষ্টা।

রেভুল্যুশন ২০২০, মোটা কালিতে বড় করে লেখা। তার নিচে সম্পাদকের কলাম, হেডলাইনে লিখা : কারণ, যথেষ্ট হয়েছে। আমি পড়তে থাকলাম।

একটা সমাজের ব্যাপারে কি বলবেন যেটার বড় বড় নেতারা সবাই দুর্নীতিবাজ? আপনি সেখানে কি করবেন যেখানে যাদের একটু ক্ষমতা আছে তারাই দুর্নীতি করছে? ইন্ডিয়া অনেক সহ্য করেছে। ছোটবেলা থেকে আমরা জেনে এসেছি ইন্ডিয়া একটা গরিব দেশ। কেন? পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানকার মানুষ গড়ে যা আয় করে তা ইন্ডিয়ার মানুষের গড় আয়ের পঞ্চাশ গুণ। পঞ্চাশ গুণ? সেখানকার মানুষ কি আমাদের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বেশি যোগ্য? একজন ইন্ডিয়ার কৃষক কি কঠোর পরিশ্রম করে না? ইন্ডিয়ার স্টুডেন্টরা কি পড়াশোনা করে না? আমরা কি ভাল করতে চাই না? কেন, তাহলে কেন আমরা গরিব হতে বাধ্য?

রাঘবের আত্মপ্রত্যয়ী দৌড়ঝাপ দেখে হাসলাম আমি। সকালের চায়ে চুমুক দিয়ে পড়ে যেতে থাকলাম।

এসব বন্ধ করতে হবে। এ সিস্টেম আমাদের বন্ধ করতে হবে। মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারা একবার বলেছিলেন, "ক্ষমতা কোন আপেল না যা গাছ থেকে আপনার কোলে পড়বে। যেসব মানুষের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হয়।" আমাদের একটা রেভুল্যুশন শুরু করতে হবে, একটা রেভুল্যুশন যা আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সিস্টেমকে ঢেলে সাজাবে। একটা সিস্টেমে নিয়ে আসবে যেখানে ক্ষমতা আবার জনগনের হাতে ফিরে আসবে, আর যেখানে রাজনীতিবিদরা শুধুমাত্র কর্মী হবে, রাজা নয়।

অবশ্যই এটা রাত পোহালেই হয়ে যাবে না। যতদিন দুর্দশার চূড়ান্ত না হবে ততদিনে এটা হবে না। ইন্ডিয়ার তরুণ জনসংখ্যা যেহেতু বাড়ছে, আমাদের আরও কলেজ আর চাকরির দরকার। কিছুদিন পরেই এসবের বাজারে হাহাকার লেগে যাবে। মানুষ বুঝতে পারবে কারা তাদের বোকা বানাচ্ছে। এতে দশ বছরও লাগতে পারে। আমি এটাকে রেভুল্যুশন ২০২০ বলছি, যে বছরে এটা ঘটবেই। সেই মুহূর্ত যেটা জরাজীর্ণ ইন্ডিয়াকে শক্ত করে ঝাঁকুনি দেবে। যখন দেশের সবগুলো কলেজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হবে। যখন আমরা আন্দোলনে যাব, সবকিছু বন্ধ করে দেব, যতদিন না সবকিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে। যখন তরুণরা তাদের ক্লাস, অফিস বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসবে। যখন ইন্ডিয়া ন্যায়বিচার পাবে, অপরাধী শাস্তি পাবে।

আর এসব কিছু বারানশিতেই শুরু হবে। আর এ জন্যই আমরা আপনার সামনে উপস্থাপন করছি *রেভুল্যুশন ২০২০*।

আপনার বিশ্বস্ত,

রাঘব কাশ্যপ

সম্পাদক

আর্টিকেলের নিচে ইন্ডিয়ার মানচিত্র আঁকা দেখে আমার হাসি পেল। এটাতে বারানশির উপরে একটা ডট দেয়া, যেটা থেকে বিভিন্ন শহরের দিকে তীর চিহ্ন চলে গিয়েছে। ম্যাপের সাথে ছোট্ট "রেভুল্যুশন ২০২০ পটেন্সিয়াল প্ল্যান" দেয়া আছে। এখানে বিভিন্ন শহবের প্রধান কলেজগুলোর নাম দেয়া আছে যেখান থেকে ঐ জায়গার রেভুল্যুশন শুরু হবে।

আমার একাউন্টেন্ট মাস শেষের একাউন্টে সাইন করাতে আমার অফিসে এল। আমার আনন্দিত মুখ দেখে সে বিস্মিত।

"কি হয়েছে স্যার? কৌতুক পড়ছেন?" সে বলল।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

পৃষ্ঠার উপরে শবদাহের দোকানের উপর একটা আর্টিকেল আছে। যেটা সাধারণ কাঠের উপরে কৃত্রিম সুগন্ধি মেখে চন্দন কাঠ বলে বিক্রি করে।

একাউন্টেন্ট গোলাপি রঙের কাগজটা দেখতে পেল।

"কোন বিজ্ঞাপন? পোস্টার?" সে বলল।

"আমার কোন ধারণা নেই," আমি বললাম।

আমি পৃষ্ঠাটা উল্টে না হেসে পারলাম না। উপরের পৃষ্ঠার কাঠখোট্টা আর্টিকেল, আর নিচের পৃষ্ঠায় পাত্র-পাত্রী চাই? আমি জোরে জোরে পড়তে লাগলাম।

"কায়স্থ ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত সরকারি চাকরিজীবি ছেলের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত, আকর্ষনীয় ঘরমুখো কুমারী পাত্রী চাচ্ছি। পাত্রীকে অবশ্যই যৌথ পরিবারে থাকতে আগ্রহী হতে হবে আর ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলতে হবে।"

আমি রাঘবের কাগজটা একাউন্টেন্টকে দিলাম।

"পাত্রী খুঁজছেন স্যার?" সে বলল।

আমার চেহারায় বিরক্ত ভাব ফুটে উঠল।

"সরি স্যার," সে বলল। "স্যার, আমরা ভর্তির জন্য আরও আবেদন পাচ্ছি," প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল।

"সিট তো ফাঁকা নেই," আমি বললাম। "আপনি জানেন সেটা। আমাদের যত স্টুডেন্ট ভর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমরা তা পূরণ করেছি।"

"স্যার, এআইসিটিই যদি কিছু করতে পারে..."

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "কতজন?"

"পাঁচজন, দশজন..." সে বলল। "সর্বোচ্চ বিশজন।"

"তাদের নিয়ে নিন। আমি সময়মত এআইসিটিই'র ব্যাপারে দেখব।"

"ঠিক আছে স্যার," বলে সে অফিস থেকে চলে গেল।

আমি গোলাপি কাগজটা তুলে নিলাম, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টুকরোগুলো

একসাথে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম।

প্রতি শুক্রবারে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে দেখি। তিনদিন শেভ না করে নিজের মধ্যে বয়স্ক বয়স্ক ডিরেক্টর ভাব নিয়ে এলাম। আমি একটা ক্লাসে ঢুকলাম যেখানে গণিত ক্লাস হচ্ছে।

আমাকে দেখামাত্র প্রফেসর লেকচার দেয়া থামিয়ে দিল। চল্লিশজন স্টুডেন্টের পুরো ক্লাস দাঁড়িয়ে গেল। এটা আমার কাছে ভাল লাগল। আমি আটটা ক্লাসরুমের যেকোন ক্লাসে গেলে একই ঘটনা ঘটবে। টাকা, পদমর্যাদা আর ক্ষমতা–যদিও খারাপ লোকেরাই এভাবে বলে–জীবনে সম্মান নিয়ে আসে। কয়েক বছর আগে আমি ভর্তি হওয়ার জন্য ক্যারিয়ার ফেয়ারে ভিক্ষা করে মরেছিলাম। আর আজ, আমার আগমনে শতশত লোক উঠে দাঁড়ায়।

"শুভ বিকাল, ডিরেক্টর স্যার," প্রফেসর বলল।

আমি উত্তরে মাথা নাড়লাম। সামনের সারিতে বসা ঢিলেঢালা শার্ট পরা এক ছেলে চোখ পিটপিট করতে লাগল যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি?"

"মনোজ, স্যার," সে বলল।

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

"শর্নাথ, স্যার।"

"বাবা-মা সেখানে কাজ করে?"

"আমাদের জমি আছে, স্যার। বাবা কৃষক।"

আমি সাথেসাথেই নরম হয়ে গেলাম। "তুমি কৃষক হতে চাও না?"

সে উত্তর দিল না, উত্তর দিলে আমি কি বলব তা নিয়ে ভয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম।

"গঙ্গাটেকে কোন সমস্যা হচ্ছে?" আমি বললাম।

"না স্যার," সে নার্ভাস কণ্ঠে বলল।

"লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, আমাকে বল।"

"ইংরেজি অনেক বেশি, স্যার," সে বলল। "আমি ইংরেজি ভাল বুঝি না।"

"শিখে নাও। না হলে পৃথিবী তোমাকে এগোতে দেবে না। ঠিক আছে?" আমি বললাম।

সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকালাম। "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সরি," আমি বললাম।

প্রফেসর হাসলো। তাকে দেখে কোটার মিঃ পুলির কথা মনে পড়ল আমার।

ক্লাস ঘুরে দেখা শেষ হলে এক ডজন কাগজপত্র আমার জন্য অপেক্ষারত দেখলাম। আমার ফোন বেজে উঠল।

আরতি মেসেজ পাঠিয়েছে: "আর২০২০ দেখেছ?"

"হ্যা," আমি লিখলাম।

"তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে জানতে চাইল।

আমি উত্তর দিলাম না। কাগজপত্রগুলো দেখতে লাগলাম। আমার ফোন আবারও বেজে উঠল।

সে লিখেছে : "?"

"রেভুল্যুশনের জন্য শুভকামনা," আমি বললাম।

"থ্যাঙ্কস," তার রিপ্লাই এল।

আমি বুঝতে পারলাম না এটাই কি আলোচনার শেষ কিনা।

"তোমাকেও ধন্যবাদ," আমি লিখলাম, আর কি লিখা যায়?

"জেনে খুশি হলাম," সে লিখল।

"কি?"

"যে আমি এখনো ধন্যবাদ পাচ্ছি," সে লিখল।

আমি জানি না এখন কি বলা যায়। মেয়েদের একটা অতি-সহজ মেসেজেরও খুব কঠিন অর্থ থাকতে পারে।

আমি আরেকটা মেসেজ লিখলাম : "ঐ সন্ধ্যার জন্য আমি দুঃখিত।" বারবার ভাবছি এটা পাঠাব কিনা।

"ঐ সন্ধ্যার জন্য দুঃখিত," তার মেসেজ এল।

ঘটনার আকস্মিকতা দেখে আমার শ্বাসরোধ হয়ে এল। যা লিখেছি তা মুছে ফেলে আমি আবার লিখলাম। "না, ঠিক আছে। আমার সীমা অতিক্রম করা ঠিক হয় নি।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিপ্লাই এল : "এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোর না।"

হতবিহ্বল হয়ে আমি ফোন সরিয়ে রাখলাম।

সে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে? মেয়েরা কেন সরাসরি কথা বলতে পারে না? দুশ্চিন্তা কোর না? সে কি শুধুমাত্র ফরমালিটি দেখিয়েছে? নাকি সে বুঝিয়েছে আমি তাকে চুমু দিয়েছি তা ঠিক আছে, আর তার নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তার কিছু নেই? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কি অধ্যায়টা শেষ করে দিয়েছি নাকি নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি?

তাকে এ সবগুলো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না।

আর আমি বিষয়গুলো ঝুলিয়ে রাখতেও পছন্দ করি না। একটা চুমু, আর তার নিরবতা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি তাকে শুধুমাত্র একবার চুমু দিতে চাই না। আমি তাকে লক্ষ লক্ষ বার চুমু দিতে চাই, অথবা একজন মানুষের সারা জীবনে আরেকজনকে যতবার চুমু দেয়া সম্ভব। আমি তার সাথে দুর্বোধ্য মেসেজের মাধ্যমে কথা বলতে চাই না। আমি তাকে সবসময় আমার পাশে চাই।

আমি রাঘবকে আর পরোয়া করি না। সে এমনিতেও তার পত্রিকা নিয়ে অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। আরতি আরও ভাল ছেলের যোগ্য, আর আমার থেকে ভাল কে হতে পারে? এবছর আমাদের কলেজ এক কোটি টাকা কামাবে। রাঘব তার সৎ, ফালতু, বিদ্রোহী সারাজীবনেও তার নিজের এক কোটি টাকা দেখতে পাবে না। এধরনের চিন্তা ভাবনা আমার মাথার মধ্যে খাঁচায় আটকানো পাখির মত ছটফট করতে লাগল।

"যথেষ্ট হয়েছে," জোরে বলে ফোনটা হাতে তুলে নিলাম।

"আই লাভ ইউ," লিখে আমি বুড়ো আঙুল সেন্ড বাটনে রাখলাম। কিন্তু আমি সেটা ডিলিট করতে বাধ্য হলাম। সেখানে আমি আরও হালকা কিছু লিখলাম : "তোমাকে মিস করছি।" কিন্তু সেটাও মুছে ফেললাম।

আমি কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গেলাম কিন্তু একটা বাক্যও পড়তে পারলাম না। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাথেসাথেই তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলাম যখন তাকে ধরেছিলাম, বাতাসে তার চুল আমার মুখ ঘেষে যাচ্ছিল, আর তাকে চুমু দেয়ার মুহূর্তটা চলে এল।

আমার ফোন বেজে উঠল। সে আমাকে কল করেছে। আমার একটা অংশ ফোন ধরতে চাইছে না, কিন্তু আমি একবার বাজতেই ফোন ধরলাম।

"হাই!"

"আরতি!"

"হ্যা?" সে বলল।

"আমি সেদিন সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলাম।"

"এসব আর বলার দরকার নেই।"

"কোন সমস্যা নেই, সত্যি?" আমি বললাম।

"হ্যা, সত্যি। কাগজটা কেমন লেগেছে? সত্যি করে বল।"

আমি তার হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পাল্টানোতে একটু কষ্ট পেলাম।

"কায়স্থ ব্রাহ্মণ এক পাতায়, বিশাল রেভুল্যুশন আরেক পাতায়। বিষয়টা অদ্ভুত না?"

"আমি তোমাকে বলেছি। এভাবেই কাগজটা টিকে আছে," সে বলল।

"পাঠকরা এটা কিভাবে নেবে?"

"চমৎকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। দৈনিক পত্রিকায় রাঘবের প্রাক্তন বস তাকে ক...কল করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে," সে আনন্দে তোতলাতে লাগল।

"আচ্ছা, আমি আর পত্রিকা সম্পর্কে কি জানি? দৈনিকের লোকেরা যদি এটাকে ভাল বলে তাহলে এটা তো নিশ্চয়ই ভাল," আমি নিরসকণ্ঠে বললাম।

"তুমি এখনো কিছুই দেখ নি। রাঘব কিছু বড় বিষয় নিয়ে কাজ করছে।"

"বাহ, ভাল তো," আমি বিনয়ী কণ্ঠে বললাম।

"সরি, আমি আসলে তার বিষয়ে কথা বলতে চাই নি। শুধুমাত্র প্রথম দিনের বিষয়টা নিয়ে শিহরিত হয়ে গিয়েছি। আমি হোটেলের লবিতেও কয়েকটা কপি রেখে দিয়েছি," সে হেসে স্বীকার করল।

"আমি নিশ্চিত টুরিস্টরা আমাদের দেশের দুরাবস্থা দেখে মজা পাবে।"

"অথবা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন," আরতি বলল।

নদীর পাড়ের ঐ সন্ধ্যা তার কাছে খুব দূরের স্মৃতি বলে মনে হচ্ছে। *মেয়েরা কিভাবে ভান করে যে কিছুই হয় নি? তারা কি মাথা থেকে কিছু বিষয় মুছে ফেলে, একপাশে ফেলে রাখে, নাকি তারা খুব ভাল অভিনেত্রী?*

"আরতি," আমি বললাম।

"কি?"

"আচ্ছা যদি আমি..." বলে থামলাম।

"আচ্ছা যদি আমি কি?"

সে বিষয়টা তুলে এনেছে। এখন আমি চাইলে আমার ভীরুতা দেখিয়ে ফালতু কিছু বলতে পারি, যেমন "আচ্ছা যদি আমি বলি তুমি অনেক সুন্দর," যেরকম সারা জীবন বলে এসেছি। অথবা আমি আমার সাহস প্রকাশ করে যা বলতে চাই তা বলে ফেলতে পারি, যদিও এতে সে সারাজীবনের জন্য আমার সাথে কথা বন্ধ করে দিতে পারে। একবারের জন্য, আমি পরের অপশনটা বাছাই করলাম।

"তুমি কি করবে যদি আমি তোমাকে আবার চুমু খাই?"

"গোপাল!" সে চাপা কণ্ঠে বলল।

"এরকম বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই। আমরা চুমু খেয়েছি, মনে আছে?"

"আমি জানি না কি ঘটেছিল," সে বলল। সে কিভাবে না জেনে থাকতে পারে কি ঘটেছিল?

"প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে না," আমি বললাম।

"কি?" আরতি বলল। তার কণ্ঠে সামান্য ইতস্তত ভাব।

"তুমি কি করবে যদি আমি তোমাকে আবার চুমু খাই?"

"আমি জানি না," সে বলল।

সে হ্যা বলে নি। কিন্তু সে বিরক্ত হয়ে ফোন রেখেও দেয় নি।

"আমি হয়ত করব।"

"না!" সে বলল।

"আমি হয়তো করতে পারি।"

"আমরা কি অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারি?" সে বলল।

"আমরা কি দেখা করছি?" বললাম তাকে।

"কোথায়?" সে বলল। আবারো, কোন হ্যা বা না নয়। সে কখন দেখা করব তা-ও জানতে চাইল না। শুধুমাত্র জায়গাটা জানতে চাইল। আমি তাকে সতর্ক করে

দিয়েছি আমি তাকে চুমু দিতে পারি, কিন্তু তবুও সে আমার সাথে দেখা করতে চাইছে। আমার মাথা এক ডজন স্মাইলিতে ভরে উঠল।

"আমি তোমাকে কাজের শেষে তুলে নেব। তোমার কাজ শেষ হবে কখন?"

"ছয়টায়। তবে আজকে না। রাঘবের কিছু বন্ধু আসবে। *রেভুল্যুশন ২০২০*-এর প্রথম দিন উপলক্ষে।"

"পার্টি?"

"মোটামুটি। ছোটখাট ব্যাপার-স্যাপার। পার্টি করার মত টাকা রাঘবের কাছে নেই। সব টাকা সে পত্রিকার পেছনে ঢেলেছে।"

"তুমি কি চাও আমি তাকে কিছু টাকা দিই?" আমি বললাম। আমার কথার প্রতিটা শব্দ আমার কাছে চমৎকার শোনাল।

"বাদ দাও তো গোপাল। তো, কাল ছয়টায়?"

"আমি তোমাকে কল দিব," আমি বললাম।

"ওহ, ঠিক আছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি?" সে জানতে চাইল।

"প্রাইভেট কোন জায়গায়," আমি বললাম।

সে এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল।

"যেখানে আমরা কথা বলতে পারব," আমি যোগ করলাম।

"তাহলে আমাকে জানিও।"

অধ্যায় ২৮

"আপনার রুম নাম্বার ২১০৫, মিঃ মিশ্রা।"

আমি রামাদায় পাঁচ হাজার রুপি দিয়ে একটা রুম বুক করেছি একরাত থাকার জন্য।

"আপনার লাগেজের জন্য কোন সাহায্য লাগবে, স্যার?" রিসেপশনে বসা মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার শুধুমাত্র এটা আছে," পিঠের ব্যাগের দিকে দেখিয়ে বললাম তাকে।

রিসেপশনিস্ট আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সে আমার সাথে লবির গেস্ট রিলেশন্স ডেস্ক পর্যন্ত গেল।

"ইনি আরতি," রিসেপশনিস্ট বলল, "সে আপনাকে আপনার রুম পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।"

আরতি তার কম্পিউটার থেকে উপরে তাকাল। তার মুখ আপনা-আপনি হা হয়ে গেল।

"হ্যালো," আমি যতটা নির্লিপ্তভাবে বলা সম্ভব বললাম।

"ওহ্ হাই...মানে, শুভ সন্ধ্যা," ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল সে।

"আরতি, ইনি মিঃ গোপাল মিশ্রা, গঙ্গাটেক কলেজের ডিরেক্টর। ২১০৫ নম্বর রুম। তাকে তার রুমটা দেখিয়ে দিন।"

"অবশ্যই অবশ্যই," আরতি বলল, এখনো হতভম্ব।

সে এলিভেটর পর্যন্ত হেটে গেল। একজন হাউজকিপিং স্টাফ আমাদের সাথে এলিভেটরে ঢুকল। আমরা কোন কথাই বলতে পারলাম না। সে সেকেন্ড ফ্লোরের করিডরে গিয়ে কথা বলতে পারল।

"গোপাল, তুমি এখানে কি করছ?" ফিসফিস করে বলল সে, আমার থেকে দু-পা আগেই হাঁটতে থাকল।

আমার গল্প বানানোই ছিল। আরতিকে বলা মোটেও সম্ভব না যে আমি আমাদের দুজনের জন্যই রুম বুক করেছি।

"আমাদের একজন সিনিয়র গেস্ট ফ্যাকাল্টি লন্ডন থেকে আসবে।"

"তো?"

"সে শেষ মিনিটে তার মত বদলেছে। ততক্ষণে আমরা রুমের জন্য টাকা দিয়ে দিয়েছি। তো আমি ভাবলাম রামাদার আতিথেয়তা থেকে কেন বঞ্চিত হব?"

"কি? তুমি আমাকে বললেই পারতে। আমি ফেরত দেয়ার চেষ্টা করতাম।"

"বাদ দাও। আমি কখনোই ফাইভ-স্টার হোটেলে থাকি নি। এটা পরখ করে

দেখতে চাই।"

আমরা ২১০৫ নাম্বার রুমে পৌছে গেলাম। সে তার ম্যাগনেটিক কি-কার্ড দিয়ে রুমটা খুলল। তাকে তার ইউনিফর্মে চমৎকার লাগছে, ফরমাল শাড়ি, তার চুল একটা ব্যান্ড দিয়ে বাধা।

আমি আমার পিঠের ব্যাগ বিছানায় ফেললাম।

"তোমাকে কি রুমের ফিচারগুলো দেখিয়ে দিতে হবে?" সে বলল।

"না," আমি হাসলাম। "কেউ একজন আমাকে আগেই দেখিয়েছে।"

"তুমি আসলে একটা পাগল, গোপাল," সে বলল। "যাহোক, আমি বরং যাই।"

"আমি সিঙ্গেল সিটের সোফায় বসলাম। "থাকো," আমি বললাম।

"আমি পারব না। আমি এখন ডিউটিতে।"

"ছয়টার পরে? এখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে," আমি বললাম।

"আমি একজন গেস্টের রুমে থাকতে পারি না!"

"তুমি এ গেস্টকে চেন," আমি বললাম। "দুই মিনিট?"

সে দরজার কাছে গিয়ে না আটকে দরজা যতটুকু বন্ধ করা যায় করল। ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

"কি হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি এই প্ল্যান কর নি?" সে বলল।

"কিসের প্ল্যান? ফ্যাকাল্টি মত বদলিয়েছে," আমি বললাম।

"সেই ফ্যাকাল্টির নাম কি?"

"মি: এলেন," আমি বললাম।

"ওহ আচ্ছা? কোন কলেজের?"

"তার কলেজ..." বলে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

"দেখ, গুল মারা বন্ধ কর," সে বলল।

"আমি তার কলেজের নাম কিভাবে জানব? ডিন হয়তো জানে। আমি যা জানি তা হল আমাদের একটা রুম ভাড়া করা হয়েছে আর আমি সেটা নিয়ে নিলাম।"

মাথা নাড়ল সে।

"তোমার কাজ শেষ হলে এখানে চলে এসো," আমি বললাম।

"কিভাবে? এটা তো নিয়মের বাইরে।"

"তুমি কি সবসময় নিয়ম মেনেই কাজ কর?" আমি বললাম।

"না, কিন্তু..."

"তোমার সেই সাহস নেই," আমি বললাম।

"আসলে সেটা বিষয় না," বলে সে উঠে দাঁড়াল। "আর তুমি সেটা জান।"

"কেউ জানতে পারবে না," বললাম আমি। "কাজ শেষে চলে এসো। আমরা এখানেই খাব। একঘণ্টা বা কিছুক্ষণ থেকে চলে যাবে।"

"রুম সার্ভিস যদি আমাকে দেখতে পায়?"

"তারা এলে তুমি টয়লেটে লুকিয়ে থাকবে," আমি বললাম।

"জঘন্য," সে বলল।

"আচ্ছা, তুমি আসার আগেই আমি খাবারের অর্ডার দেব। স্যান্ডউইচ?"

সে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আমার প্রস্তাব নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। "ঠিক আছে," দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমার আসা বা যাওয়ার সময় কোন স্টাফ যেন দেখতে না পায় তা তুমি নিশ্চিত করবে।"

"অবশ্যই, আমি করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকব। ফোনে তোমাকে গ্রিনসিগন্যাল জানাব।"

সে আমার কাছে এসে আমার মাথায় আলতো করে একটা ধাক্কা দিল। "তোমার জন্য আমাকে কি সব করতে হচ্ছে!" বলে রুম থেকে চলে গেল সে।

স্যান্ডউইচ, চকলেট কেক আর এক বোতল মদ অর্ডার করলাম। আমি শাওয়ার নিলাম, একসপ্তাহে যতটা ব্যবহার করি, শ্যাম্পু আর গরম পানি তারচেয়ে বেশি ব্যবহার করলাম।

সে সাড়ে ছয়টায় কল করল। "করিডোর চেক কর।"

আমি রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। "সব ঠিক আছে," মাথা ডানে-বায়ে ঘুরিয়ে করিডোর স্ক্যান করতে করতে ফোনে বললাম।

দু-মিনিট পরে শক্ত করে আটকানো দরজার মধ্যে আবদ্ধ আমরা দু'জন। সে তার কাজের শেষেই কাপড় বদলে সাদা শার্ট আর জিন্স পরে নিয়েছে।

"তুমি একটা বোকা সেটা তুমি জান?" বিছানায় ধপ করে বসতে বসতে বলল। তার একটা হাত দক্ষ অভিনেত্রীর মত বুকে চেপে ধরে রেখেছে। "আমার হৃদপিন্ড কত জোরে লাফাচ্ছে!"

"শান্ত হও," আমি বললাম।

সে হাসলো। "তোমার ভাগ্য ভাল যে আমাদের করিডোরে সিসিটিভি এখনো লাগানো হয় নি। ওগুলো এরকম চমক দেখানো যেত না।"

"তার মানে সঠিক সময় বেছে নিয়েছি," আমি বললাম। "ক্ষুধা লেগেছে?"

আমি স্যান্ডউইচ প্লেটের সিলভারের ঢাকনা তুলে ফেললাম।

"প্রচন্ড," সে স্বীকার করল।

আমি স্যান্ডউইচের সাথে ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই আর সালাদ যোগ করলাম। "এসো শুরু করি।"

"আমি এতটাই ক্লান্ত যে নড়াচড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। টানা আটঘণ্টা হিল পরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিছানায় খেতে পারি?"

"অবশ্যই," বললাম আমি। তার দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে দিলাম। আমি একটা গ্লাসে লালচে মদ ঢাললাম।

"তুমি একটা পুরো বোতল মদ অর্ডার করেছ?" জিজ্ঞেস করল সে।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"তুমি মদ খাওয়া শুরু করলে কবে থেকে?"

"শুকলাজি আমাকে সবকিছুর স্বাদ নেয়া শিখিয়েছে," বললাম আমি।

"মদ খেতে ভাল লাগে তোমার?"

"আমি সাধারণত হুইস্কি খাই। কিন্তু ভাবলাম তুমি মদ পছন্দ করবে।"

"তা ঠিক আছে। কিন্তু আমার ড্রিংক করা মোটেও ঠিক হবে না। এটা আমার কাজের জায়গা।"

"এক গ্লাস..." আমি জোরাজোরি শুরু করলাম।

সে আস্তে করে মাথা নেড়ে গ্লাসটা হাতে নিল।

"রাঘব তেমন ড্রিংক করে না। মাঝেমধ্যে তাকে একদম নিরস মনে হয়," বলে সে এক চুমুক খেল। "ভালই তো। এটার নাম কি?"

"জ্যাকব'স ক্রিক, অস্ট্রেলিয়ার," উৎপাদনের দেশটার উপর জোর দিয়ে বললাম আমি। এটা আমার পকেট থেকে দু-হাজার রুপি খসিয়েছে, কিন্তু আমি দামের কথা বললাম না।

"এটা ভাল। আমার উপর প্রভাব ফেলবে তাড়াতাড়ি।"

"চিন্তার কিছু নেই। আমার ড্রাইভার তোমাকে বাসায় পৌছে দেবে।"

সে দু-হাতে তার স্যান্ডউইচ শক্ত করে ধরে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মত গোগ্রাসে খেতে লাগল।

"আস্তে খাও," আমি বললাম।

সে মুখে খাবার নিয়ে বলল, "আমি সকালের নাস্তার পরে আর কিছুই খাই নি।"

"তুমি স্কুলে থাকতেও এভাবে মুখভর্তি করে খেতে," ঠাট্টা করলাম আমি।

"যদি তুমি আমার জন্য কিছু বাকি রাখতে তবে!"

"আমি একবারই তোমার টিফিন চুরি করেছি। তা-ও অর্ধেকটা। আর সেটার জন্য আমাকে এখনো শাস্তি পেতে হচ্ছে।"

"ওহ্, তাই নাকি?" সে বলল। "টিচার তোমাকে মাত্র এক পিরিয়ডের জন্য শাস্তি দিয়েছিল।"

"কিন্তু তোমার কাছে এখনো কথা শুনতে হচ্ছে," হতাশ কণ্ঠে বললাম।

সে তার প্লেট থেকে একটা ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই তুলে আমার দিকে ছুড়ে মারল। তার লক্ষ্য ব্যর্থ হলে ওটা নিচে পড়ে গেল।

"ওহ্, ওটা তোল, প্লিজ। আমি আমার নিজের হোটেল নোংরা করতে পারি না।"

অধ্যায় ২৯

জুতো খুলে বিছানায় পা ভাঁজ করে বসল সে। আমি আরও মদ ঢেলে দিতে চাইলাম।

"আমি মাতাল হয়ে যাব," বললেও সে তার গ্লাস বাড়িয়ে দিল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঘড়ি দেখল। খাটের পাশের ঘড়িতে দেখাচ্ছে সাড়ে আটটা বাজে।

"তুমি কতক্ষণ থাকতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"নয়টা পর্যন্ত," সে বলল। "আর আধ ঘণ্টা।"

"দশটা পর্যন্ত থাকতে পারবে না?"

সে মাথা দোলাল। "আম্মু হাজারটা প্রশ্ন করবে। যদি না...আমি তাকে বলি আমাকে ডাবল শিফট্ কাজ করতে হয়েছে।"

"তাহলে তাই বল," আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

"তাহলে আমাকে আরও আট ঘণ্টা থাকতে হবে। দুটো পর্যন্ত।"

"চমৎকার," আমি বললাম।

"তুমি কি পাগল হয়েছ?" সে বলল। "আমি তোমার রুমে দুটো পর্যন্ত থাকতে পারি না।"

"কেন না?" আমি বললাম। "এরকম সুযোগ কি সবসময় পাওয়া যায়?"

"আমার বয়ফ্রেন্ড যদি জানতে পারে..." এতটুকু বলে চুপ হয়ে খাটের হেডবোর্ডে হেলান দিল।

"কি জানতে পারে?" আমি বললাম।

আমরা বোতলের অর্ধেকটা খালি করে ফেলেছি। আমি আমার জন্য আরও কিছুটা ঢাললাম।

"যে আমি অন্য একজনের রুমে এতটা সময় কাটিয়েছি শুনতে পেলে সে আমাকে মেরে ফেলবে।"

"তাই করবে?"

হেসে বললো, "আসলে তা না। তবে অনেকটা পাগল হয়ে যাবে। হয়তো কিছু ভাঙচুর করবে।" একটা বালিশ আমার দিকে ছুড়ে মারল, একজন যত্নশীল বয়ফ্রেন্ডের অভিনয় করল যেন।

"সে তোমাকে আসলেই মেরে ফেলবে যদি জানে আমার সাতে থেকেছো," তাকে বললাম।

"সে জানতে পারবে না," আরতি বলল।

আমি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার পাশে চলে এলাম।

"তুমি ডাবল শিফট্ করছ," আমি তার ফোনটা দেখিয়ে বললাম।

"তুমি নিশ্চিত?" সে বলল। "আমি রাত দুটো পর্যন্ত থাকলে তোমার মাথা খেয়ে ফেলব!"

"এটা তুমি সারাজীবনই করেছ," আমি বললাম।

সে আমাকে আরেকটা বালিশ দিয়ে আঘাত করল। আমি সেটা ধরে একপাশে সরিয়ে রাখলাম। সে তার ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল, আমাকে চুপ থাকার ইঙ্গিত। বাড়িতে ফোন করছে।

"আম্মু, আমি এখনো কাজে। ডাবল শিফট্ করতে হচ্ছে। কি করব বল?"

তার মা কয়েক সেকেন্ড কথা বলল। আরতি বলে গেল : "ঐ গাধি বেলাটার করার কথা ছিল এ শিফট্, সে কিছু অজুহাত বানিয়েছে না আসার জন্য। তার এঙ্গেজমেন্টের পরে সে অনেক বেশি ফাঁকি দিচ্ছে।"

তার মা আবার কথা বলা শুরু করলে আরতিকে কিছুটা রাগান্বিত মনে হল।

"বেলার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে বলে আমাকেও বিয়ে করে ফেলতে হবে কেন? হ্যা...আমি একদিন করব, আম্মু...ঠিক আছে...হ্যা, হোটেলের গাড়ি আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে...বাই।"

বিছানায় ফোন রাখল সে। তাকে দেখে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

"কোন সমস্যা?" আমি বললাম।

"আমার মনে হয় ইন্ডিয়ার বাবা-মায়েদের মাথায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভুত চাপে। প্রথমে 'পড়, পড়, পড়' তারপর শুরু হয় 'বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে।' "

"তুমি বিয়ে করতে চাও না?"

"আমি করব," বলে সে বিছানায় হাত রেখে বলল, "তুমি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

আমি বিছানায় খুব সাবধানে তার থেকে একটু দূরে বসলাম।

"তুমি এ রুমের জন্য অনেক খরচ করেছ। একটু আরাম করে বস।"

"হাহ?" আমি বললাম।

"আমার কাজ হল গেস্টদের আরামের ব্যবস্থা করা," বলে সে কর্পোরেট হাসি হাসলো। তার দাঁতে মদের লাল দাগ থাকলেও হাসিটা চমৎকার।

আমি আমার জুতা-মোজা খোলার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলাম। "তুমি রাঘবকে কল করবে না?"

সে মাথা দোলাল। "ও এসব খেয়ালই করবে না। একটা বড় বিষয় নিয়ে কাজ করছে," সে বলল। সে তার জন্য আরও খানিকটা মদ ঢেলে নিল।

"যদি সে কল করে?" আমি বললাম।

তার হাত আমার মুখে রাখল। "যদি কল করে তাহলে তুমি চুপ হয়ে যাবে আর আমি বাকিটা দেখব," বলল সে।

তার স্পর্শ যেন আমার কাছে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মনে হল।

সে তার হাত সরিয়ে নিল। "তো, মিঃ ডিরেক্টর, কাজ কেমন চলছে, জীবন, সবকিছু?"

"কাজই সবকিছু। কলেজ চালানো সহজ কিছু না," আমি বললাম।

"শুধু কাজ?" সে তার মাকে নকল করল। "কি? তোমার বিয়ে করা উচিৎ। তুমি এখনো অবিবাহিত থাকলে চলবে?"

আমরা হেসে আমাদের গ্লাসে গ্লাসে টোকা দিলাম।

"আমি অবশ্য তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলব," সে বলল। "অনেক চাপ দিচ্ছে।"

"আর রাঘব কি বলছে?"

"অবশ্যই সে এখন প্রস্তুত না। আমি যদি চাপ দেই তাহলে সে করবে।"

"আর তোমার বাবা-মা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট?" আমি বললাম।

"তারা তাকে পছন্দ করে। বাবা চাকরিতে যোগ দিয়ে পরিবার থেকে রাজনীতি দূর করেছে। সে তার অবস্থানের প্রশংসা করেছে।"

"সে টাকা উপার্জন করছে না তারপরেও?"

"সে করবে। একদিন সে করবে," আরতি প্রতিজ্ঞা করল যেন। "আর তুমি আমার আত্মীয়দের মত কথা বলছ কেন?"

সে রিমোট হাতে নিয়ে টেলিভিশন চালু করল।

"এটা খুবই বিরক্তকর," বলতে বলতে সে খবরের চ্যানেলগুলো পাল্টাতে থাকল। চ্যানেল ভি'তে এসে থামল সে, যেখানে একটা আইটেম গার্ল একটা রিমিক্সড্ গানের সাথে নাচছে।

"সে তার ঠোঁট আর নাকে কাজ করেছে, সম্ভবত স্তনেরও।"

"কি?" তার শব্দচয়ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"স্তনের কাজ। মানে স্তন বড় বড় করার জন্য সার্জারি করেছে," সে বলল।

আমি যেরকম স্তম্ভিত হয়েছি সেরকমটাই দেখাল আমাকে।

"তুমি আমার বেস্টফ্রেন্ড," বলে সে ঠাট্টাছলে আমার হাতে ঘুসি মারল। "তোমার সাথে তো আমি আমার ইচ্ছেমত কথা বলতেই পারি।"

সে আবার চ্যানেল পাল্টাতে লাগল আর হঠাৎ *হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি* ছবিটার মাঝখানের কোন জায়গা সামনে এসে পড়ল।

"ছেলে আর মেয়ে বন্ধু হতে পারে না," বিলি ক্রিস্টাল, মেগ রায়ানকে বলল, তার মুখে একটা টুথপিক।

"অবশ্যই হতে পারে। আমাদের দেখ," আরতি অধৈর্য নিয়ে বলে ভলিউম বাড়িয়ে দিল। "এই মুভিটা আমার অনেক পছন্দ।"

"তুমি এটা দেখেছ?" আমি বললাম।

"হ্যা, তুমি দেখেছ?"

আমি মাথা দোলালাম। আমি ইংলিশ মুভি তেমন দেখি নি।

"এসো দেখি। এতক্ষণ কি হয়েছে তা আমি তোমাকে বলছি।"

আমি তার কাছে চলে গেলাম। বেডসাইড প্যানেল থেকে রুমের আলো কমিয়ে দিলাম। সে সংক্ষেপে মুভির প্লট আমাকে বলতে লাগল। হ্যারি আর স্যালি নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত, কয়েকবার দেখা করে আর ঝগড়াও করে কিন্তু কখনো সেভাবে যোগাযোগ করে না, সেটা করা খুবই দরকার হলেও। আমরা নিঃশব্দে মুভিটা দেখতে লাগলাম।

"ওয়াও, আমরা বোতল শেষ করে ফেলেছি," সে কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করল। একটা বালিশ তুলে আমার কোলের উপর সেটা রেখে সেখানে মাথা রেখে মুভির বাকি অংশ দেখতে লাগল।

"তোমার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো?" আমার কোলের উপর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। টেলিভিশনের আলোতে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। তারপর আমার হাত আলতো করে তার মাথায় রেখে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সে আপত্তি করল না। তার সাথে থাকতে দারুণ লাগছে। আমার এ জীবনে এরচেয়ে সুখময় আর কোন সময় কাটিয়েছি বলে মনে হচ্ছে না।

"আরতি?" আমি বললাম।

"বল," সে বলল, তার চোখ এখনো টিভিতে।

"আমার কোলে এভবে শুয়ে থাকাটা তোমার কাছে ভাল লাগছে?"

সে মাথা ঝাঁকাল, চোখ স্ক্রিনের দিকেই।

"সেদিন নদীর পাড়ে ওভাবে চলে গেলে কেন?" আমি বললাম।

"আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না। মুভি দেখ।"

"তুমি কি আবারো চলে যাবে?" আমার কণ্ঠ ভারি।

সে আমার টেনশন বুঝতে পারল। টেলিভিশনের শব্দ বন্ধ করে উঠে বসল।

"তুমি ঠিক আছ, গোপি?" তার কণ্ঠ কিছুটা অস্পষ্ট। টিভির আলো আমাদের মুখের উপর পড়ছে।

"এখনই চলে যাও তুমি যদি চলেই যেতে চাও," আমি বললাম, আমার কণ্ঠ খুব কষ্টে গলা দিয়ে বের হচ্ছে। "কারণ, তুমি যদি আমার জীবনে কিছুসময় থাক তারপরে চলে যাও..."

আমি অনেক বেশি বলে ফেলেছি। অস্ট্রেলিয়ান মদ ইন্ডিয়ার এক তরুণের হৃদয় খুলে দিয়েছে।

"চুপ কর," বলে সে তার হাত আবার আমার মুখে রাখল। "ড্রামা-কুইন। সরি, ড্রামা-কিং!"

কিন্তু আমি সত্য কথাই বলেছি, তার থেকে দূরে থাকা আমি আর মেনে নিতে পারছি না।

"আমিও নিঃসঙ্গ, গোপাল," সে বলল। "খুবই নিঃসঙ্গ।"

"কেন?"

"রাঘবের হাতে কোন সময় নেই। আব্বু-আম্মু বুঝতে পারছে না আমি কেন চাকরি করছি। তারা বুঝতে পারছে না ডিএম'র মেয়েকে কেন রাত-দিন কাজ করতে হচ্ছে। আমার সব বান্ধবীরা বিয়ে করে ফেলছে, বাচ্চা নেয়ার চিন্তা করছে কিন্তু আমি করছি না। আমি আসলে জঘন্য।"

"তুমি অন্যরকম," আমি তাকে শুধরে দিলাম।

"আমি কেন অন্যরকম? আমি কেন সাধারণ হতে পারি না–বাড়িতে থেকে, স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না?

"সেটা সাধারণ না। ব্যাকডেটেড।"

"রাঘবকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আমি তাকে সাপোর্ট দিতে চাই। কিন্তু সে আসলে পেরে উঠছে না। সে স্বাধীন থাকার জন্য সংবাদপত্রের সাথে কাজ করতে চাচ্ছে না। এভাবে করে সে কবে টাকা উপার্জন করবে?"

"তুমি বলেছিলে সে একদিন করবে," আমি বললাম।

"আমি সবসময় সাহসের ভান করে বসে থাকি। কিন্তু আমার ভয় নিয়ে তো তোমার সাথে আলোচনা করতে পারি, তাই না?"

"অবশ্যই তুমি পার," বলে আমি তার গালে হাত বুলিয়ে দিলাম।

আমরা টিভির দিকে ফিরে তাকালাম। একরাতে স্যালির মন খারাপ। হ্যারি তার বাড়িতে এল। সে স্যালিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তার সান্ত্বনা চুমুতে গিয়ে শেষ হল। আমি জানি না এ দৃশ্যটা, অথবা মদ অথবা আমি আর কখনো সুযোগ হয়তো পাব না এ চিন্তা–কোনটা আমাকে প্রেরণা যোগাল। আমি চুমু দিতে আরতির দিকে মাথা নিচু করলাম। আরতি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু সে আমাকে বাধা দিল না। শুধুমাত্র তাকিয়ে থাকল।

আমি তাকে আবার চুমু খেলাম, এবার আরও দৃঢ়তার সাথে। দু-মিনিট কিছুই না করে তারপর সে-ও আমাকে চুমু খেল। আমরা বারবার চুমু খেতে লাগলাম। তার ঠোঁটে, গালে, কপালে, নাকে, তার কানে এবং আবারো ঠোঁটে চুমু খেতে লাগলাম। রুমের লাইট নিভিয়ে দিলাম আমি।

আমি যখন তাকে আবারো জড়িয়ে ধরলাম তখন সে বলল, "এটা ঠিক হচ্ছে না।"

"আমি জানি, কিন্তু আমি থামতে পারছি না।" আমার হাত তার শার্টের বোতামের উপর চলে গেল।

"না," বলে সে শক্ত করে আমার হাতটা ধরে রাখল।

আমি আমার অন্যহাত তার শার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ঈশ্বকে ধন্যবাদ, মানুষের দুটো হাত আছে; না থাকলে কেউই এটা করতে পারত না। আমার হাত,

অবশেষে তার স্তনের উপর গিয়ে থামল।

"গোপাল, তুমি বুঝতে পারছ তুমি কি করছ?" সে বলল।

আমি মাথা দোলালাম।

"আমাদের মোটেও উচিত না..."

আমি আরেকটা চুমুর মাধ্যমে তাকে চুপ করিয়ে দিলাম। সে একটু মোচড় দিতে লাগল, কিন্তু আমি তাকে চুমু খেতেই থাকলাম। সে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপরে আমার সাথে তাল মিলিয়ে আর অবশেষে আমার থেকেও তরিৎগতিতে।

"এটা অন্যায় হচ্ছে গোপাল," সে হাঁপাতে হাঁপাতে, আমার নিচের ঠোঁট কামড়ে বলল।

আমি চুমুর মাধ্যমেই উত্তর দিলাম। মুভি শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি তার শার্ট খোলার জন্য টানাটানি করতে করতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন শুনতে পেলাম।

"না গোপাল!" সে ফিসফিস করে বললেও তার হাত উঁচু করল যাতে আমার কাজ সহজে করতে পারি।

আমি আমার শার্ট খুলে ফেললাম। এবার যখন আমরা আলিঙ্গন করলাম, তার শরীরের উষ্ণতা আর কোমলতায় হারিয়ে গেলাম আমি।

"আমি তোমাকে অনেক কেয়ার করি..." বললাম তাকে।

"কথা বন্ধ কর," সে আমার স্বতঃস্ফূর্ত কথা থামিয়ে দিয়ে বলল।

তার কাঁধে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে তাকে শুইয়ে দিলাম। আমি আমার বাকি পোশাক খুলে ফেললাম।

সে অন্য দিকে তাকাল।

"কি হল?" আমি বললাম।

সে আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই মাথা নাড়ল।

আমি তার পাশে শুয়ে পড়লাম। সে আমাকে আবেগপ্রবণ হয়ে চুমু দিতেই থাকল, কিন্তু যখন আমি থেমে তার চোখের দিকে তাকাচ্ছি, সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

আমি তার জিন্স খোলার জন্য নিচের দিকে নামলাম। সে আমাকে শেষবারের মত বাধা দিল।

"আমার বয়ফ্রেন্ড আছে," আমাকে মনে করিয়ে দিল সে।

"আমি বছরের পর বছর এই কথা শুনে কাটিয়েছি," বললাম আমি।

"আমি সে-রকম মেয়ে না গোপাল," সে দীর্ঘশ্বাসের সাথে বলল।

"তুমি একটা অসাধারণ মেয়ে," আমি বললাম, আমার হাত তার নাভিতে। আমি সেখানে চুমু দেয়ার জন্য একটু থামলাম। "দুনিয়ার সবচেয়ে অসাধারণ মেয়ে।"

তার হাত আমার শরীরের উপর রাখলাম। আবারো তার জিন্স খোলার কাজে

নেমে পড়লাম। মেয়েরা দুনিয়ার সবচেয়ে টাইট, খোলার অযোগ্য জিন্স পরে। তার সাহায্য ছাড়া এটা খোলা মোটেও সম্ভব না।

"তুমি কি পারবে?" পাঁচ মিনিট রীতিমত যুদ্ধ করে বললাম আমি।

আমার অনুরোধে সে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে একটু মোচড় দিয়ে সেটা খুলল। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে কাছে টেনে নিলাম।

"গোপাল," বলে সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। বছরের পর বছর জমিয়ে রাখা আবেগ বিস্ফোরিত হল যেন। তার সাথে যতবার এক হয়ে যাচ্ছি ততবার তাকে চুমু দিতে থাকলাম।

আমি জানি আমার জীবন আর এরকম থাকবে না। যা ঘটেছে তা শুধুমাত্র তার প্রতি আমার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। অনেকে বলে ছেলেরা সেক্স করার পরে সবকিছু ভুলে যায়। কিন্তু আমি সবসময় তাকে কাছে টেনে নিতে চাই, তাকে বুকের সাথে চেপে ধরতে চাই আর সারাজীবন তাকে আমার সাথে রাখতে চাই। তাকে শক্ত করে জরিয়ে ধরে আমি তার চুলে চুমু খেতেই সে কোনরকম অভিব্যাক্তি না দেখিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

"তুমি চমৎকার আরতি। তোমার প্রতিটা অংশ চমৎকার।"

সে একটু হাসলো যেন। আমি কনুঁইয়ের উপর ভর করে একটু উঁচু হলাম।

"তোমার কি এটা ভাল লেগেছে?" আমি বললাম।

সে মাথা ঝাঁকালেও অন্য কোন দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমার দিকে তাকাও," আমি বললাম। সে তার চোখ আমার দিকে ফেরাল, কিন্তু তাকাল অন্য কিছুর দিকে।

"তুমি ঠিক আছ তো?"

সে মাথা ঝাঁকাল।

আমরা আবারো শুয়ে পড়লাম। সিলিংয়ে ছোট্ট এলইডি লাইট জ্বলে উঠল।

"এটা কি?" এটা ক্যামেরা হতে পারে ভেবে বললাম।

"ধোঁয়ার অ্যালার্ম," সে বলল।

কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলাম আমরা।

"আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আরতি।"

"এটা বলবে না, প্লিজ," সে বলল।

"এটাই সত্যি। আমি তোমাকে ভালবাসি," বললাম তাকে।

"প্লিজ, চুপ কর!" বলে সে বিছানায় উঠে বসল। বিছানার চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করল সে।

"কি হয়েছে?" বলে আমি তার হাত ধরলাম।

তার ফোন বেজে উঠলে মেসেজটা দেখল সে। রিপ্লাই দিতে দিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"আমি কি আমার কাপড় পরতে পারি?" বলে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আরতি।

চাদরটা দিয়ে নিজেকে ভালভাবে ঢেকে নিল সে। তার কাপড় নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। আমি বাতি জ্বালালাম। আমার মধ্যে আবেগমিশ্রিত বিভ্রান্তি জেগে উঠল।

সে অবশ্যই আমার প্রতি যত্নশীল। নয়তো সে যা করেছে তা কোন মেয়েই করবে না। কিন্তু তবুও কেন দূরে থাকার অভিনয় করছে? সে কি চাচ্ছে আমি তাকে বলি যে আমি তার সাথে থাকব? নাকি সে অনুতপ্ত বোধ করছে? এটা কি আমাদের কাছে নিয়ে আসবে নাকি আরও দূরে ঠেলে দিবে?

আমি নগ্ন এবং বিভ্রান্ত। আমি আমার বিভ্রান্তি দূর করতে পারছি না, তবে অন্তত আমার কাপড় পরতে পারি। সে আবার রুমে ঢুকলে আমাকে শার্টের বোতাম লাগাতে দেখল।

"আমি বরং বাসায় চলে যাই," সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

বিছানার পাশে ঘড়িতে দেখাচ্ছে বারটা বাজে।

"তোমাকে দুটো পর্যন্ত থাকতে হবে না?"

"আমি তাদের বলব শিফট্ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে। হয়তো ঘুমের ঘোরে তাদের সময় দেখার কথা মনে থাকবে না," সে বলল।

আমার সাথে বস, আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। তার সাথে কথা বলা দরকার। আমি তাকে জানাতে চাই এটা আমার জন্য কতটা দামি। *আসলে মেয়েরা কি এটাই চায় না, কথা বলতে?*

"তুমি কি তোমার ড্রাইভারকে কল করবে?" সে বলল।

"পাঁচ মিনিট থাক," আমি অনুরোধ করলাম। "প্লিজ।"

সে সোফায় বসল। আমি বসলাম বিছানায়।

"তুমি এতটা উদ্বিগ্ন কেন? আমি তোমার গোপাল। তুমি আমার প্রতি যত্নশীল নও?"

"এখনো তোমার প্রমাণ দরকার?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি তার পাশে এসে। তার হাত ধরলাম। খুব ঠান্ডা হাত।

"এটা নিয়ে তোমার মোটেও লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই," বললাম তাকে। "এটা অসাধারণ, আমাদের গর্ব করা উচিত।"

"কিন্তু আমার বয়ফ্রেন্ড আছে," সে বলল।

"এমন একজন ছেলে যে কখনোই তোমার নয়?"

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

"আমি কখনোই তোমার আর রাঘবকে নিয়ে কিছু বলি নি। তার মানে এই নয় যে আমি কিছুই খেয়াল করি না। আরতি, তুমি আরও ভাল কিছুর যোগ্য। জীবনের সুখগুলো পাবার অধিকার তোমার আছে।"

"আমি একটা সাধারণ মেয়ে, গোপাল," আরতি তার ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল।

"আর একটা সাধারণ মেয়েরও ভালবাসা দরকার, নিরাপত্তা দরকার, মনযোগ দরকার, সমর্থন দরকার, ঠিক?" আমি বললাম।

সে চুপ করে থাকল।

"একদিন এই সাধারণ মেয়েটি বিয়ে করবে। তাকে জানতে হবে তার স্বামী তার সাথে একটা সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে পারবে কিনা," বললাম তাকে। বছরের পর বছর আমি চুপ করে থেকেছি। আরতিকে পাশে পেয়ে আমি আক্রমণাত্মক হবার আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেলাম।

"আমি ক্লান্ত। আমাকে বাড়িতে যেতে হবে," বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি আমার ড্রাইভারকে কল করলাম, তার সাথে নিচে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল। যাওয়ার আগে আমার কাছে এল সে। আমি একটা চুমু আশা করলেও সংক্ষিপ্তভাবে শুধুমাত্র জড়িয়ে ধরল। দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও তার সৌরভ রুমে কয়েক ঘণ্টা আর আমার হৃদয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত থেকে গেল।

অধ্যায় ৩০

রামাদার রাতের পরে আমরা দু-দিন পর্যন্ত কেউ কারো সাথে কথা বলি নি। আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে শেষমেষ কল করলাম। তার বাবা-মা পাশে থাকায় সে আমার সাথে কথা বলল না। তবে পরদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে সিসিডি-তে দেখা করার আমন্ত্রণ জানাল।

"আমি সরি, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম," সে তার অতি-গরম কফিতে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে বলল। সে একটা কুঁচি দেয়া স্কার্ট আর সাদা প্রিন্ট করা টপ পরে আছে। তার ভেজা চুল দেখে বোঝা যাচ্ছে এইমাত্র গোসল করে বেরিয়েছে। "কাজে যাওয়ার আগে আমার হাতে বিশ মিনিট সময় আছে," সে বলল।

"ঐ রাতে তোমার কি হয়েছিল?"

"তুমি আসলে জান কি হয়েছিল," সে বলল।

"তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে আরতি," আমি তার হাতে হাত রেখে বললাম।

"গোপাল!" বলে তার হাত সরিয়ে নিল সে।

"কি?" আমি বললাম। আমি চাই সে আমার দিকে লজ্জিত চোখে তাকাবে, আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে হাসবে আর আমার হাত জোরে চেপে ধরবে। কিন্তু সে কিছুই করল না।

"মানুষ আমাদের চেনে," সে বলল। আমাদের কফির কাপ থেকে ধোঁয়া আমাদের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। বাইরের ডিসেম্বরের সকালের তুলনায় ক্যাফে যথেষ্ট উষ্ণ লাগছে।

"তুমি কি আমাকে ভালবাসো?" তার সমর্থনের আশায় মরিয়া হয়ে বললাম। *তার আমাকে ভালবাসা উচিত। আমাকে না ভালবেসে সে কিভাবে পারে?*

আরতি হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তোমার সমস্যাটা কি? এখন কমপক্ষে তোমার অনুভূতি মেনে নাও," বললাম তাকে।

"তুমি কি জানতে চাও আমি কি অনুভব করি?" সে বলল।

"অন্য যেকোন কিছুর চেয়ে বেশি জানতে চাই," আমি বললাম।

"অপরাধবোধ," বলল সে।

"কেন?" আমি প্রতিবাদ করে বললাম। "এটা কি চমৎকার না? এটাই কি ভালবাসা না?"

"গোপাল, তোমাকে এই 'ভালবাসা' শব্দটা বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে?"

মেয়েদের বোঝা কঠিন। আমি চুপ হয়ে গেলাম।

"রাঘব আমার সাথে কোন ভুল করে নি," সে এক মিনিট পরে বলল, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

"আচ্ছা, তাহলে এটা রাঘবের ব্যাপার..." বলতেই সে আমাকে থামিয়ে দিল।

"তুমি কি শুনতে পার না? শুধু শোন, ঠিক আছে?" সে কঠোর দৃষ্টিতে বললে আমাকে মেনে নিতে হল। ছেলেরা দুনিয়াতে এসেছে শুধুমাত্র মেয়েদের কথা শোনার জন্য। তাই আমি মাথা নাড়লাম।

"সে শুধুমাত্র সৎ কাজ করে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে। এটা সহজ কোন কাজ না।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম। আমাকে আবার অসৎ ভাবছে কিনা তা ভেবে মেজাজ গরম লাগছে।

"তার সাথে প্রতারণা করা আমার ঠিক হয় নি। আমি একটা জঘন্য মানুষ।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

"তোমার কি মনে হয় আমি জঘন্য মানুষ?" সে বলল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"কিছু বল," সে চিৎকার করে বলল।

"তুমি আমাকে শুধুমাত্র শুনতে বলেছ," আমি বললাম।

"তো সেটা কর।"

"কি?"

"কিছু বল," সে বলল। ছেলে-মেয়ের মধ্যে আলোচনায় কিছু বিষয় থাকে। আমার মনে হয় না একপক্ষ কখনোই অপরপক্ষের ইচ্ছে বুঝতে পারে।

"আরতি, তুমি একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি ইচ্ছে না হলে কিছুই কর না।"

"কি বলতে চাচ্ছ তুমি?"

"আমার কয়েক বছরের চেষ্টায় কখনোই তুমি হ্যা বল নি। কোন একটা বিষয় নিশ্চয়ই আছে যা ঐ রাতে তোমাকে এটা করিয়েছে।"

"আমি একটা ভুল করেছি," সে বলল।

আমি মেনে নিচ্ছি, তার এসব কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে সে একটা ভুল বলে সংজ্ঞায়িত করছে। আমি আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করলাম।

"তাই ছিল? তাহলে আজ আমার সাথে দেখা করতে কেন এলে?" আমি বললাম।

"শুধুমাত্র কফির জন্য," বলল সে তার চোখে ধূর্ত ভাব।

"আরতি, মিথ্যে বোল না। অন্তত আমাকে না। তোমার আবেগে যদি পরিবর্তন হয়, সেখানে লজ্জার কিছু নেই," আমি বললাম।

তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি একটা টিস্যু বের করে তা মুছিয়ে

দিতে এগিয়ে গেলাম। সে আশেপাশে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করল।

"গোপাল, প্রতিটা সম্পর্কে একজন দুর্বল মানুষ আরেকজন সবল মানুষ থাকে। দুর্বল মানুষটার সবল মানুষটাকে অনেক বেশি প্রয়োজন হয়।"

"ঠিক," আমি বললাম।

"কোন সম্পর্কের দুর্বল মানুষ হওয়াটা সুখের কোন ব্যাপার না।"

"আমি তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি," বললাম তাকে।

সে আমার দিকে তাকাল।

"আমি সরি। আমি শুনছি।"

"আব্বু-আম্মু আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি তাদের আজীবন না বলতে পারি না," সে বলল। "রাঘবের এদিকে কোন মনযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

"সে তোমাকে বিয়ে করতে চায় না?" আমি বললাম।

"কয়েক বছর পরে করতে চায়। সে এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। কখনো কখনো বিষয়টা শুধুমাত্র সংসার শুরু করাই না, তার কাজগুলো খুবই বিপজ্জনক, আর প্রধানত সে খুবই ব্যস্ত। আমি কি করব?"

আমি মাথা নাড়লাম। কখনো কখনো মেয়েদের সাথে আচরণের সবচেয়ে ভাল উপায় সন্তোষজনক মাথা নাড়া। আমি ঠিক সে কাজটাই করলাম, একটা পরিমিত মাথা ঝাঁকানো।

"সে আমাকে ভালবাসে, আমি জানি। সবসময় সে আমাকে দারুণ দারুণ মেসেজ পাঠায়। এটা চমৎকার লাগে।"

আমি বুঝতে পারলাম সে শব্দ করে চিন্তা করছে। আমি শোনার ভান করলেও মনযোগ দিলাম তার ত্রিভুজাকার বেগুনী কানের দুলের দিকে যেগুলো তার কথা বলার সাথে সাথে একটু একটু দুলছে। সে পাঁচ মিনিট পরে তার খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা শেষ করল।

"শোনার জন্য ধন্যবাদ," সে বলল।

"আমাকে কেন?"

"তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?" সে বলল।

"তুমি আমার সাথে কেন বিছানায় গেলে? রাঘবের সাথে তোমার কিছু ঝামেলা আছে ঠিক আছে। কিন্তু আমি কেন?"

সে আমার দিকে তাকাল। আবেগের বহিঃপ্রকাশের পরে কিছুটা নরম হয়েছে।

"কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি," সে বলল।

"তাই?" আমি বললাম।

"অবশ্যই আমি করি। আর আমি জানি তুমিও আমাকে কতটা পছন্দ কর। আমি শপথ করে বলছি তুমি তোমার মনের মত অন্য কাউকে পেয়ে গেলে আমি খুব খুশি হব।"

"আমি পারব না," বললাম।

"কি পারবে না?"

"আমি অন্য কোন মেয়ের সাথে থাকতে পারব না। এটা হয় তুমি অথবা কেউ না," সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

"তুমি কি জান এতে আমি কতটা অপরাধবোধ অনুভব করছি?" সে বলল।

"তুমি আমার সাথে বিছানায় গিয়েও অপরাধবোধ অনুভব কর আবার না গিয়েও তাই কর?"

সে হতাশভাবে হাসলো। "মেয়ে হওয়াটা সহজ কোন বিষয় না। আমাদের সবকিছুর জন্য অপরাধী অনুভব করতে হয়।"

"বিভ্রান্ত হওয়ার কোন দরকার নেই। আমার সাথে এসো," আমি বললাম।

"রাঘবের কি হবে?" সে বলল। "তার এ অবস্থায় আমাকে দরকার।"

"সে যা চায় তা সে করে। তুমি কেন করবে না?"

"সেটা কাজের ক্ষেত্রে। সে কখনো কাজের বিষয়ে আমাকে বাধা দেয় না। আর বিশ্বাসভঙ্গ করা অন্য বিষয়।"

"তুমি আমাকে অনুপ্রেরণা দাও আরতি," আমি বললাম। "আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তুমি পাশে থাকলে জীবনে কত কিছু করতে চাই আমি। আমি আমার কলেজকে অনেক বড় করতে চাই। আমরা এভিয়েশন একাডেমি চালু করতে পারি, এমবিএ, হয়তো মেডিসিন-ও।"

"এর জন্য আমাকে দরকার হবে না তোমার," সে বলল।

"আমি আমার জন্য তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া, আমার কোন অস্তিত্ব নেই," আমি বললাম। "মানুষ অহরহ ব্রেক-আপ করছে আরতি। তোমরা বিবাহিত না। আমরা অনেক সুখি হব।"

"আর রাঘব?" সে বলল।

"তার কোন সমস্যা হবে না। সে কাউকে খুঁজে পাবে, একজন সাংবাদিক, অথবা সংস্কারপন্থী কেউ অথবা কিছু একটা," আমি বললাম।

সে হাসলো।

"কি হল?"

"আমি তোমাকে পছন্দ করি গোপাল। কিন্তু তুমি এত কঠিনভাবে চেষ্টা কর কেন?"

"সরি," আমি শক্তভাবে বললাম। "আমি সবসময় সঠিক সময়ে সঠিক চাল দিতে পারি না।"

"চুপ কর, এটা চালের কোন বিষয় না।"

"তুমি কি আমার হবে?" আমি হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম।

"প্লিজ, আমার উপর চাপ দিও না।"

আমি হাত পেছনে সরিয়ে নিলাম।

"মোটেও না," বললাম আমি।

সে ঘড়ি দেখল। তাকে চলে যেতে হবে। আমি আমার ড্রাইভারকে কল করলাম, ধীরে ধীরে কালো মার্সিডিজ গাড়িটা নিয়ে এল।

"ওয়াও!" সে বলল। "এটা তোমার?"

"না, এটা ট্রাস্টের। এটা শুকলাজি'র। আমরা সবে ডেলিভারি পেলাম।"

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। কালো চামড়ার সিট যথেষ্ট উষ্ণ লাগল। "এটাতে সিট হিটার আছে," তাকে কন্ট্রোল প্যানেল দেখিয়ে বললাম।

"একদিন মিঃ গোপাল, তোমার নিজেরও থাকবে," হোটেলে পৌছে সে বলল।

"গাড়ি, নাকি মেয়ে?" আমি চোখ টিপলাম।

"দুটোই, সম্ভবত," বলে সেও চোখ টিপল।

"আমরা কখন দেখা করব," আমি বললাম। "একান্তে?"

"গোপাল!"

"আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আসলে আমি কিছু করতে চাই না।"

"বিখ্যাত কথা যেটা সব ছেলেরাই বলে," বলে সে হোটেলে ঢুকে গেল।

গার্ডেরা কালো মার্সিডিজকে স্যালুট করল যখন সেটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"তোমার বাবা-মা কোথায়?"

সে তার রুমের পর্দা টেনে দিল। "হাসপাতালে। আব্বুর হাঁটুতে আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

আরতি আর আমি দেখা করতে থাকলাম, যদিও বাইরে কম। বেশিরভাগ সময় তার বাবা-মা যখন বাইরে থাকে তখন সে আমাকে বাসায় যেতে বলে। কয়েক ডজন কাজের লোকের ভীড়েও তার রুমের গোপনীয়তা আছে। রামাদার সে রাতের পরে দু মাস চলে গিয়েছে। রাঘবের সাথে তার প্রতারণার অপরাধবোধ শান্ত হয়ে গিয়েছে, অথবা সে তা ভাল ভাবেই আমার কাছ থেকে লুকিয়েছে। সে আমাকে ভালবাসে কিনা তা জিজ্ঞেস করা বন্ধ করে দিয়েছি যেহেতু সেটা তাকে আমার কাছ থেকে দূরেই নিয়ে যায়।

মেয়েদের আচরণ আসলে পরস্পরবিরোধী। তারা বলবে তারা যোগাযোগ পছন্দ করে, কিন্তু কিছু বিষয়ে তারা চুপ করে থাকবে। তারা যদি আপনাকে পছন্দ করে, তাহলে তারা চাইবে আপনি সেটা আন্দাজ করে নিন। কিন্তু নিজের মুখে বলবে না।

"আঙুর?" সে ফলের একটা ট্রে আমাকে দিয়ে বলল।

"খাইয়ে দাও," বলে আমি ইজি চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম।

"চুপ কর," বলে সে ট্রে-টা আমার দিকে ঠেলে দিল।

আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসল সে। আমাদের একটা অলিখিত নিয়ম আছে–তার বিছানা থেকে দূরে দূরে থাকি।

"একবার?" আমি বললাম।

"এসব কি?" বলে সে উঠে দাঁড়াল। একটা আঙুরের থোকা তুলে নিয়ে আমার মুখের কাছে এনে ধরল। আমি হা করতেই পুরো থোকা মুখের ভেতর পুরে দিল সে।

"রাজাদের এভাবে খাওয়ানো ঠিক না, বুঝেছ?" আমি বললাম। মুখভর্তি আঙুরের রস নিয়ে কথা বলা যথেষ্ট কঠিন।

"সব ছেলেরা একরকম। প্রথমে পেছনে পেছনে ঘোরে, তারপর যখন পেয়ে যায় তখন তার রাজা হয়ে যায়," সে বলল।

"তুমি আমার রাণী, প্রিয়," বললাম আমি।

"দুষ্ট, ফালতু, জঘন্য," সে বলল।

আমি তাকে আঙুর-মাখা একটা চুমু দিলাম।

"কাজের লোকেরা আছে আশেপাশে!"

"তারা নক করে ঢোকে, তুমি তা জান," আমি বললাম।

আমি তাকে আরও চুমু দিতে চাইলাম কিন্তু সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"আমাকে তোমার কাছে খুব নিরস মনে হয়, তাই না?" সে বলল।

"এটা ঠিক আছে," আমি বললাম।

"শারীরিক বিষয়গুলো আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি আবার কয়েক সপ্তাহ মন খারাপ করে থাকি, তাই না?"

"ঠিক আছে, আসলে আমিও চাই না," বললাম তাকে।

"সত্যি?" সে বিস্মিত হয়ে বলল।

ছেলেরা সবসময়ই কিছু করতে চায়। তবুও সে জানে আমি মিথ্যে বলছি না। আমি কখনোই তাকে আমার ক্যাম্পাসে আসতে বলি নি যেখানে একেবারেই আমরা একা থাকতে পারি। অথবা আমি রামাদার মত কিছুর চেষ্টাও আর করি নি।

"সত্যি," আমি সিরিয়াস কণ্ঠে বললাম।

"তুমি চাও না?" সে বলল। জাফরান রঙের সালোয়ার আর সাদা কামিজ পরেছে। আমি তাকে অন্য যেকোন মেয়ের চেয়ে বেশি চাই, তার জন্য দুনিয়ার যা কিছু লাগুক না কেন। তবে, একটা শর্ত আছে।

"যত দিন রাঘব আমাদের সিস্টেম থেকে বাইরে বের না হয়ে যাচ্ছে," আমি বললাম।

"কি?" সে বলল।

"রামাদার সে রাতে আমি তোমার শরীর পেয়েছিলাম, মন পাই নি। আমি এটা আর হতে দিতে চাই না।"

"তুমি একদিনেই মানুষজনকে তোমার সিস্টেম থেকে বাইরে বের করে দিতে

পার না," সে বলল।

"আমি জানি। কিন্তু তুমি কি চেষ্টা করছ?"

"আমি জানি না," সে বলল। "আমি যতই অস্বীকার করি তাতে কোন লাভ নেই, বিষয়টা হল আমি প্রায় প্রতিদিন তোমার সাথে দেখা করছি।"

সে আমার চেয়ারের হাতলে বসল।

"তো, তুমি কি তার সাথে শেষ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত?" আমি বললাম।

আমার বাক্য শেষ হতেই তার ফোন বেজে উঠল। "সে ফোন করেছে," বলল আরতি।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"হেই," আরতি রাঘবকে বলল। সে আমার খুব কাছে এসে বসল যাতে আমি রাঘবের কণ্ঠ শুনতে পাই।

"আমাদের পাঁচ হাজার কপি বেরিয়েছে," সে বলছে।

"অভিনন্দন!" আরতি বলল।

"আমরা বিজ্ঞাপনের জন্য ভাল ব্র্যান্ড পেয়ে যাব শীঘ্রই। তুমি কি করছ?"

"আমি বাড়িতে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।"

"বাবা-মা?"

"আম্মু আব্বুকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। তার হাঁটু তাকে অস্থির করে তুলেছে। দুটো হাঁটুতেই অপারেশন করতে হবে।"

"সেটাতো ভয়াবহ," সে বলল।

আরতি রাঘবের সাথে কথা বলতে থাকলে আমি তার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলাম। সে আমাকে তা বন্ধ করার জন্য মুখ গম্ভীর করে আমার দিকে তাকাল। আমি বন্ধ করলাম না।

"তো আর কি? সন্ধ্যায় কিছু করছ?" আরতি বলল।

"সোমবারের বড় ইস্যুটাকে শেষ করছি। এটা দারুণ হবে।"

"ঠিক আছে," আরতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মুখের উপর ছড়িয়ে যাওয়া চুলগুলো আমি পেছনে নিয়ে এলাম। সে কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে ফেলল।

"আমি তোমার সাথে রাতে কফি খেতে দেখা করতে পারি," রাঘব বলল।

"বাবার দেখাশোনা করতে হবে। আর যতবার আমি বাইরে যেতে চাই, মা আমাকে পরের সপ্তাহে বিয়ে দিয়ে দেবার কথা বলে।"

"তুমি অনেক ছোট," রাঘব বলল।

"আমার পরিবার এসব কিছু বুঝতে চায় না। আমার বয়সের কাজিনদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে," সে বলল।

"আমরা কি আবার ঝগড়া করাটা বন্ধ করতে পারি? আমি ক্লান্ত।"

"আমি না," আরতি বলল।

"আই লাভ ইউ, বাই," রাঘব চমৎকারভাবে বলল।

"তুমি সত্যি ভালোবাসো?" আরতি বলল।

"আহ আরতি। আমাকে রেখে দিতে হবে। আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি এটা বল, বলবে না," রাঘব বলল।

"লাভ ইউ, বাই," আরতি বলল।

আমি তার মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম।

"কি হল?"

"তাকে সিস্টেম থেকে বের করা বলতে এটাই বুঝিয়েছি," আমি বললাম।

"এটা একটা সাধারণ কথাবার্তা," সে বলল।

"তুমি বলেছ 'ভালবাসি,' কিন্তু আমার সাথে এরকম শব্দ বলা পছন্দ কর না।"

"আমি স্বাভাবিক হতে চেয়েছি। এভাবেই আমরা কল শেষ করি," বলে সে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

"আমি সরি। তোমার মুখে অন্য কাউকে এটা বলতে শোনা সহজ না," আমি বললাম।

"কারো সাথে প্রতারণা করাও সহজ না," বলে সে ভেজা চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি তাকে আমার বাহুর মধ্যে নিলাম।

"সে কখনো না কখনো জানতে পারবে," তার মুখ আমার বুকের মধ্যে গুজে সে বলল। "আমি তাকে নিজেই বলতে চাই।"

"তুমি কি আমার সাথে থাকবে?" আমি জানতে চাইলাম।

সে তার মুখ না তুলেই মৃদু মাথা ঝাঁকাল।

"আমি তোমাকে আজীবন ভালবাসবো আরতি।"

সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ পরে সে আমার দিকে তাকাল। "আমার কি তাকে বলা উচিত?"

আমি মাথা দোলালাম। "আমি বলব," বললাম আমি। আমি এটা তার মুখের উপর ছুড়ে মারতে চাই।

অধ্যায় ৩১

আমার পুরনো বাড়ি থেকে জিনিসপত্র ব্র্যান্ড নিউ ডিরেক্টরের বাংলোতে আনতে শুধুমাত্র একটা মিনি-ভ্যান লাগল। আমার শুধুমাত্র জামা-কাপড়, বাবার পুরনো বই আর কিছু ছবি আছে। কন্ট্রাকটর বাকি যা কিছু লাগে কিনে দিল। তিন বেডরুমের ডুপ্লেক্স বাংলোর আমার কোনই দরকার নেই। কিন্তু ডিরেক্টর হোস্টেল রুমে তো আর থাকতে পারে না। আমি নতুন বাড়ির লনে দাঁড়িয়ে আছি, সকালের দৃশ্য উপভোগ করছি। নতুন কেনা জিনিসগুলো নিয়ে একটা ট্রাক এল–ফার্নিচার, কার্পেট, অন্যান্য গৃহস্থালি আসবাবপত্র আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে।

একজন লেবার বাবার কিছু ছবি হাতে ধরে রেখেছে। "এগুলো কোথায় রাখব?" সে বলল।

একটা ফ্রেমের ছবিতে বাবা একটা গাছের নিচে বসে হুকো খাচ্ছেন আর জমির দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তখন পাঁচ বছরের ছেলে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার পাশে বসে আছি। বাবার এক কৃষক বন্ধু তার ছেলের বিদেশ থেকে পাঠানো সাদা-কালো ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলে দিয়েছিল। ছবিটা হাতে নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। আমি যে বাবাকে মনে করতে পারি, তার তুলনায় এখানে তাকে খুব কমবয়সী আর স্বাস্থ্যবান লাগছে। আমি বর্তমান ক্যাম্পাসে ঐ গাছটা কোথায় আছে তা খোঁজার চেষ্টা করলাম। খুঁজে পেলাম না।

বাবার মৃত্যুর চার বছর হয়ে গেলেও কোনদিন তার কথা মনে পড়ে কান্না আসে নি। তবুও আমি জানি না আজ কেন এত আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম। আমাকে এত বড় একটা বাড়িতে উঠতে দেখলে বাবা নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। সম্ভবত তার ছেলে জীবনে কিছুই করতে পারবে না এ চিন্তা করেই তিনি মারা গেছেন। বাবা যদি এখন দেখতে পেতেন!

গোপাল কাঁদে না। গোপাল জীবনের সাথে যুদ্ধ করে, আমার ভেতরে কে যেন বলে উঠল।

"এগুলো সামনের রুমে রাখুন," আমি বললাম।

সকাল দশটায় সবকিছু বাড়িতে তোলা শেষ হল। আমার প্রথম অতিথি হবে, আমি যেরকমটা প্ল্যান করেছি, যার কারণে এসব কিছু সম্ভব হয়েছে–শুকলাজি। আমি তাকে দুপুরে দাওয়াত করলাম। হোস্টেলের বাবুর্চিকে তাড়া দিতে থাকলাম। আমার নতুন বাসার গ্যাস স্টোভ কাজ করছে না। তাই বাবুর্চি হোস্টেলের রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করতে চাইল।

"স্টোভ এখানে নিয়ে আসুন!" আমি চিৎকার করে বললাম। "এমএলএ স্যার

আসছে। আমি হোস্টেলের রান্নার উপর আস্থা রাখতে পারছি না।"

অবশ্যই আমি চাই আরতিও আমার প্রথম অতিথিদের একজন হবে। তবে আমি নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি আরতি আমার নতুন বাড়িতে আসবে আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে। অন্য কারো গার্লফ্রেন্ড, যার আমার সাথেও সম্পর্ক আছে এরকম কেউ হিসেবে না।

সে আমাকে এসএমএস করল : "কেমন হচ্ছে ঘর গোছানো? আমি কখন আসতে পারছি?"

রিপ্লাই করলাম : "তুমি যে কোন সময় আসতে পার কিন্তু এলে আমি তোমাকে আর যেতে দেব না। রাঘবের সাথে দেখা করতে হবে প্রথমে।"

"তুমি নিশ্চিত? রাঘবের সাথে দেখা করার বিষয়টা নিয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন।"

আমি মেসেজ লিখতে থাকলে আমার ফোন বেজে উঠল। আমি শুকলাজি'র কল রিসিভ করলাম।

"স্যার, আমরা পুরি বানাচ্ছি। না খেয়ে আসবেন, ঠিক আছে?" আমি বললাম।

"বাড়িতে আসো গোপাল," সে বলল।

"আমি বাড়িতেই। আমার নতুন বাড়িতে। আসলে এটা আপনারও বাড়ি।"

"আমার বারটা বেজে গিয়েছে," শুকলাজি বলল, তার কণ্ঠ যেকোন সময়ের চেয়ে উদ্বিগ্ন।

"কি?"

"আমার বাড়িতে আসো। তোমার বালের বন্ধু, আমি তাকে ছাড়ব না। এক্ষুনি আসো।"

"কি হয়েছে? আমরা এইমাত্র..." আমি বলতে বলতেই সে কল কেটে দিল।

বাবুর্চি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাড়িতে এল, ভারি স্টোভ তার কাঁধে নিয়ে।

"মাত্র একঘণ্টা সময় লাগবে," বলে সে আমাকে আশ্বস্ত করল।

"খাবারের প্ল্যান বাতিল হয়ে গিয়েছে," বলে আমি বাড়ির বাইরে চলে এলাম।

আমার ফোন বেজে উঠল। আরতি আরেকটা এসএমএস লিখেছে।

"আমাকে বাড়িটা সাজাতে দিবে। হোটেলের অভিজ্ঞতা আর সবকিছু তো আছেই।"

আমি তাকে একটা স্মাইলি পাঠিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে দিলাম।

"এমএলএ শুকলা'র বাসা," ড্রাইভারকে বললাম আমি।

এমএলএ শুকলা'র লোকেরা তার বারান্দায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারা এতটাই শোকগ্রস্ত দেখে মনে হবে কেউ যেন মারা গিয়েছে। গোলাপি রঙের কাগজ কফি টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"শুকলা স্যার কোথায়?" আমি জানতে চাইলাম।

তার দলের একজন কর্মী অফিসের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। "এখানে অপেক্ষা

করুন, সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কল করছে।"

"কি হয়েছে?" আমি বললাম। লোকটা কোন উত্তর দিল না। সে চোখ কটমট করে গোলাপি কাগজের দিকে তাকাল। আমি একটা কাগজ তুলে নিলাম।

রেভল্যুশন ২০২০ সবার উপরে লেখা, সবসময়ের মতই আড়ম্বরপূর্ণ। ইন্ডিয়ার একটা ক্ষুদ্র মানচিত্র, যেখানে তথাকথিত কমান্ড সেন্টারগুলো দেখানো, তাদের লোগো। হেডলাইনে লিখা :

পবিত্র নদীকে নোংরা করে এমএলএ'র অর্থোপার্জন!

শুকলাজি'র একটা ছবি কাগজের এক চতুর্থাংশ দখল করে আছে।

"পঁচিশ কোটি রুপির দিমনাপুর স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এমএলএ হাতিয়েছে বিশ কোটি রুপি," সাব-হেডলাইনে লেখা।

"এগুলো সব পুরনো, মৃত, ফালতু সন্দেহ, তাই না?" আমি বললাম। রাঘব এসব বিষয়কে চাঙা করে তুলতে পছন্দ করে কিন্তু কেউই এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না নিশ্চিত।

রুমের কেউই আমার কথার উত্তর দিল না। দলের কর্মিদের অর্ধেকই অবশ্য পত্রিকা পড়তে পারে না। বাকিরা এতটাই ভীত যে কথা বলতে চাচ্ছে না। আমি পড়ে চললাম।

প্রতি শকালে নাভাবাগের শিশুরা স্যুয়েজের পানিতে কোমড় পর্যন্ত ডুবে স্কুলে যায়। সব জায়গায় এসব নোংরা পানি দেখলে নাড়ি-ভূড়ি উল্টে আসার দশা হয়। বাতাসে দূর্গন্ধের ছড়াছড়ি। এলাকার মানুষ কিছুই জানে না কি ঘটেছে। তারা শুধুমাত্র জানে সরকার গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) বাস্তবায়নের আগে এসব কখনো হয় নি। হ্যা, এই সেই প্ল্যান, যেটা আমাদের পবিত্র নদীকে পরিষ্কার করতে গিয়ে শহরকে আরও নোংরা করেছে।

কিভাবে? আচ্ছা, কারণ নদী পরিষ্কারের কোন উদ্যোগই বাস্তবায়িত করা হয় নি। নাভাবাগ তো নোংরা হয়েছেই, আমাদের পবিত্র নদী আরও নোংরা হয়েছে। আপনাদের ধারণা দেয়ার জন্য বলছি, ফেকাল কলিফর্ম, একধরণের ব্যাকটেরিয়া, প্রতি লিটারে ২,০০০ ইউনিটের মধ্যে থাকার কথা। কিন্তু ঘাটগুলোতে ফেকাল কলিফর্মের মাত্রা প্রতি লিটারে ১,৫০০,০০০ ইউনিট। আমাদের নদী শুধুমাত্র নোংরাই না, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিরাট ঝুঁকি।

আমি শুকলাজি"কে তার অফিস থেকে বেরোতে দেখলাম। দৌড়ে তার দিকে গেলাম আমি। সে আমাকে অপেক্ষা করতে ইশারা করল। এখনো ফোনে কথা বলছে সে। সে কিছু ফাইল তুলে নিয়ে তার অফিসে চলে গেল। আমি পড়তে থাকলাম।

রেভল্যুশন ২০২০ জিএপি দুর্নীতির বিষয়ে অনেক প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু

সবচেয়ে দুঃখজনক হল বারানশির এমএলএ রামনলাল শুকলা'র দিমনাপুর স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। পঁচিশ কোটি রুপির এ প্ল্যান্টটি বছরের পর বছর ধরে অপ্রায়োগিক থেকেছে। আর যখন অবশেষে এটার কাজ হয়েছে, এটা মোটেও জল পরিষ্কারের জন্য হয় নি। আমাদের কাছে আৎকে ওঠার মত প্রমাণ আছে, পান্টের ভেতরে কি ঘটেছিল।

"বিরোধী দল এসব করেছে," একজন কর্মী আরেকজনকে বলছে। আমি আর্টিকেল শেষ করার জন্য বসে পড়লাম।

যখন অপরিশোধিত পানি প্ল্যান্টে পৌছে, এটার আশি পার্সেন্ট আবার বরুণা নদীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়, কোনরকম পরিশোধন না করেই। বাকি বিশ পার্সেন্ট দিমনাপুর প্ল্যান্টের নিজস্ব এক্সিট দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে, অপরিশোধিত। আর পরিদর্শকরা যখন পরিদর্শন এবং মাপজোখ করেছে, সেখানে আশি পার্সেন্ট দূষণ দেখান হয়েছে। আর ভারুণাতে যে পানি ফেলা হয়েছে তা কয়েক কিলোমিটার পরেই গঙ্গার সাথে গিয়ে মিশেছে। ফলাফল–জলের কোনরকম পরিশোধন হয় নি এবং নদী আগের মতই দূষিত থেকেছে। শুকলা আশি পার্সেন্ট দূষণ আর পরিকোঁধন দেখিয়ে তার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কন্সট্রাকশন কোম্পানি, এলিডকন-এর মালিক রোশান শুকলা এমএলএ'র চাচা। সে পাম্পের জন্য ভুয়া চালান দেখিয়েছে যা কখনো কেনাই হয় নি (স্ক্যান নিচে দেয়া হল)।

"আমরা এই পত্রিকার বারটা বাজিয়ে ফেলব," আমাকে এত মনযোগ দিয়ে এটা পড়তে দেখে একজন কর্মী আমার কানেকানে বলল।

পৃষ্ঠার শেষে কিছু ছবি দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে পনের কোটি রুপি দিয়ে পাম্প কেনার চালানও রয়েছে। কিন্তু সাইটের ছবিতে ওরকম কোন পাম্প লাগানোর চিহ্ন নেই। পাম্প উৎপাদনকারী কোম্পানির একটা স্ক্যান করা চিঠিতে দেখাচ্ছে তারা কখনেই পাম্প সরবরাহ করে নি। এলিডকন কোম্পানির মালিকানা নিশ্চিত করছে তার সাথে শুকলাজি"র পরিবারের সংযোগ রয়েছে। অবশেষে কাগজে বরুণা নদীর একটা ছবি দেয়া আছে, একটা ডট দিয়ে যেখানে পানির প্রবাহ ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা দেখান হয়েছে।

"লক্ষ্ণৌ থেকে সিএম চলে আসছে," একজন কর্মী বলল। সাথে সাথেই চিন্তিত গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল রুমের মধ্যে।

আমি নিশ্চিত রাঘব এই খবরের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। পূর্বে প্রমাণের অভাবে তাকে অনেক ভুগতে হয়েছে। এবার সে কোন কিছুই বাদ রাখে নি। ভুয়া চালান, কন্ট্রাক্টর-এমএলএ যোগাযোগ, আর দূষিত জল আবার গঙ্গায় ফেলার ধৃষ্টতা শুকলাজি"র জন্য মোটেও ভাল হবে না। এলাকাবাসী ভয়ঙ্কর রেগে যাবে। একজন রাজনীতিবীদের চুরি এমনিতেই অনেক খারাপ, কিন্তু পবিত্র নদী থেকে ডাকাতি করার চেয়ে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না।

"এটা তো কোনো আসল পত্রিকাও না," শুকলাজি'র পিএ কার সাথে যেন আলোচনা করছে। "কয়েক হাজার কপি হবে হয়তো, কেউ এটার দিকে মনযোগ দিবে না।"

রেভুল্যুশন ২০২০-এর সংখ্যা কম হওয়াটা এমএলএ'র একমাত্র ভরসা। দলের কর্মীরা পত্রিকার দোকান থেকে যত সম্ভব তুলে নিয়েছে। কিন্তু *রেভুল্যুশন ২০২০* সম্পূর্ণ বিনামূলে এসেছে। পত্রিকার ভেতর একটা ব্রোশিয়ারের মত। এটার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এককথায় অসম্ভব।

আরতি কল দিচ্ছে। আমি কয়েক পা বাইরে গিয়ে লনে দাঁড়ালাম।

"আজকের *আর২০২০* দেখেছ?" সে বলল। আমি জানতাম না পত্রিকাটার একটা ডাকনাম আছে।

"এটা আমার হাতেই আছে," বললাম তাকে।

তার কথা শোনার পূর্বে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। "এটা কি বাড়াবাড়ি না?" সে বলল।

আমি বিদ্রুপের সাথে বললাম, "রাঘব কখন বাড়াবাড়ি করে না?"

"এটা সাংঘাতিক, তাই না? তারা দূষিত পানি নদীর অন্য জায়গায় ফেলছে আবার দাবি করছে তারা পরিকোঁধন করছে!"

"সে বড় লোকদের নিয়ে কথা বলছে। তার সাবধান হওয়া উচিত।"

"কিন্তু সে তো সত্য কথা বলছে। কাউকে তো সত্য বলার সৎসাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

"আমি শুধু বলছি তার সতর্ক হওয়া দরকার।"

"আমি চাই না তার কোন বিপদ হোক," সে ভীত কণ্ঠে বলল।

"মনে হয় না সে বিপদ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে," আমি বললাম।

"সে কি সত্যি বিপদে আছে?" প্রতিটা শব্দের পরে থেমে থেমে বলল সে।

"আমি কিভাবে জানব?" বললাম তাকে। আমি বাড়ির বাইরে ট্রাফিকের শব্দ শুনতে পেলাম।

"আহ্, গোপাল, তুমি আর এমএলএ শুকলা..." বলে সে থেমে গেল।

"আমি কোন কেলেঙ্কারিতে জড়িত নই, ঠিক আছে?" চিৎকার করে বললাম।

আমি গেটের দিকে যেতে হর্নের চিৎকার শুনতে পেলাম।

"আমি তা বলি নি," সে নরম কণ্ঠে বলল। "আমি চাই না রাঘবের কোন বিপদ হোক। হয়তো আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত নই। কিন্তু সে আঘাত পাক তা আমি চাই না।"

"এক সেকেন্ড হোল্ড কর আরতি," আমি বললাম।

গেটের কাছে এলাম। বাইরের দৃশ্য দেখে আমার চোখ বড়বড় হয়ে গেল। বিভিন্ন টিভি-চ্যানেল থেকে ছয়টা ভ্যান বাড়ির বাইরে বসে আছে। গার্ডেরা রিপোর্টারদের বাইরে রাখার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করে যাচ্ছে যখন তারা প্রেক্ষাপটে এমএলএ'র বাড়ি

দেখাচ্ছে।

"কি হচ্ছে এসব?" আমি গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

"তারা ভেতরে আসতে চাচ্ছে," গার্ড বলল। "তারা জানে সিএম আসছে।"

"সব ঠিক আছে তো?" আরতি ফোনে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল।

"হ্যা, মোটামুটি।"

"আমাকে বল রাঘবের কোন ক্ষতি হবে না।"

"এটা আমার হাতে না আরতি," ধৈর্যচ্যুত হয়ে বললাম। "আমি নিজেও জানি না কি ঘটবে। এটা একটা ছোট কাগজ। হয়তো বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যাবে।"

"তা হবে না," সে বলল।

"কি?"

"সব প্রধান খবরের কাগজ আর টেলিভিশন চ্যানেল *রেভুল্যুশন ২০২০*-এর অফিসে।

"বাল," আমি বললাম। একটা সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়ির বহর বাড়িতে এসে পৌছাল। ফটোসাংবাদিকরা আমিসহ আশেপাশের সবার ছবি তুলতে লাগল উত্তেজিত ভঙ্গিতে।

"রাঘবের কিছু হবে না। প্রতিজ্ঞা কর।"

"আরতি আমাকে যেতে হবে।"

আমি দৌড়ে বাড়ির ভেতরে গেলাম।

অধ্যায় ৩২

সিএম বাড়িতে ঢোকার সাথেসাথেই সবাই স্থির হয়ে দাঁড়াল। ক্ষমতার প্রতাপ এমএলএ'র বাংলোর প্রতিটা জায়গা থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে। শুকলাজি দৌড়ে এসে জোর হাতে সিএম-কে অভ্যর্থনা জানাল।

"মিডিয়া ডেকেছে কে?" সিএম বলল, তার কণ্ঠ কঠোর।

"কি?" শুকলাজি আশেপাশের সবার মতই কোন উত্তর না পেয়ে বলল।

"ভেতরে চলুন," সিএম বলল। দুজন নেতা এমএলএ শুকলা'র অফিসে ঢুকে গেলেন। সিএম'র লোকজন এমএলএ'র লোকজনের সাথে মিশে গেল। যদিও সিএম-এর লোকজনেরা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলছে। তারা সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে এমএলএ'র লোকজন মাথা হেঁট করে রেখেছে। আমি কোন দলের সাথেই মানাতে পারছি না।

রুমের কোণায় একটা কাঠের চেয়ারে বসলাম আমি।

"গোপাল," শুকলাজি'র গর্জে ওঠা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলাম। উপরে তাকালাম আমি। সে আমাকে তার অফিসে যেতে বলল।

ভেতরে ঢুকতেই এমএলএ দরজা বন্ধ করে দিল।

"গোপাল, স্যার। সে আমার কলেজ চালায়, বিশ্বস্ত ছেলে। বুদ্ধিমান আর..."

"তুমি ঐ লোককে চেন যে এসব করেছে?" সিএম আমার যোগ্যতা অথবা গুণাবলীর দিকে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বলল।

"রাঘব কাশ্যপ, স্যার। একসময় বন্ধু ছিল, এখন আর নেই।"

"তুমি তাকে এসব থেকে বন্ধ রাখতে পার নি?" সিএম বলল।

"তাকে *দৈনিক* থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার পরে সে তার নিজের কাগজ চালু করেছে," আমি বললাম। "কেউই এটাকে কোন পাত্তা দেয় না।"

"মিডিয়া এটাকে লুফে নিয়েছে। কাগজ তেমন ব্যাপার না, কিন্তু সে যদি মিডিয়াতে ইন্টারভিউ দেয় অথবা প্রমাণপত্রগুলো দিয়ে দেয়, তাহলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে।"

"সে সেটাই করছে," আমি বললাম।

তারা দুজন আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল।

"আমার সূত্র আমাকে বলেছে। তার সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই," আমি পরিষ্কার করে দিলাম।

"তাকে কি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না?" সিএম জিজ্ঞেস করল। "তুমি মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ না, কলেজ চালাচ্ছ কিভাবে?"

সে নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারলাম।

"তাকে কেনা সম্ভব না স্যার," এক সেকেন্ডের জন্য আমি রাঘবের জন্য গর্ব অনুভব করলাম। তার বন্ধু হতে পেরে ভাল লাগল–যাকে কেনা সম্ভব না।

"সম্ভব না বলতে কি বোঝাচ্ছ তুমি? সবারই একটা মূল্য আছে," সিএম বলল।

"তার নেই," আমি বললাম। "আমি তাকে অনেক বছর ধরে চিনি। সে একরকম পাগল।"

"আচ্ছা, সে বাঁচতে চায় তো, তাই না?" শুকলাজি বলল। তার লাল হয়ে যাওয়া চোখ আমি দেখতে পেলাম।

আমি সিএম-এর দিকে তাকালাম। সে তার মাথা দোলাল।

"শুকলাজি'র মনের অবস্থা ঠিক নেই," সে বলল।

"না, সিএম স্যার, আমি কখনোই..." শুকলাজি শুরু করল।

"ঠান্ডা হোন শুকলাজি," সিএম জোরে বলে উঠল। "আপনার কোন ধারণা আছে কি ঘটছে এখানে?"

এমএলএ নিচের দিকে তাকাল।

"আপনি কোন প্লান্টই বানান নি? দশ পার্সেন্ট এদিক সেদিক করা তেমন বিষয় না। কিন্তু দূষিত পানি আবার বরুণায় ফেলার চিন্তা আপনি কিভাবে করলেন? এটা গঙ্গামা। মানুষ আমাদের মেরেই ফেলবে," সিএম বলল।

আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু সিএম আমাকে ঠিক এখানেই বসে থাকতে বলল।

"সামনের বছর নির্বাচন। রামন, আমি সবসময় আপনার জায়গাকে সম্মান করেছি আর কখনোই হস্তক্ষেপ করি নি। কিন্তু এটা আমাদের হেরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

"আমি সবকিছু ঠিক করে ফেলব সিএম স্যার," শুকলাজি বলল। "আমি অবশ্যই করব। শপথ করে বলছি।"

"কিভাবে? সাংবাদিককে মেরে ফেলে?"

"আমি রাগের বশে বলে ফেলেছি," শুকলাজি বলল, তার কণ্ঠে অনুশোচনা।

"রাগ মানুষকে এমন কাজ করিয়ে ফেলতে পারে যার সম্পর্কে কারও কোন ধারণাই নেই। রাগের কারণে ভোটাররা সরকারকে ছুড়ে ফেলতে পারে। আমি জানি কোন দুর্নীতির রিপোর্টের দাঁত আছে আর কোনটার নেই। এটার দাঁত আছে।"

"আমাকে কি করতে হবে বলুন স্যার," শুকলাজি বলল। "আমি সেটাই করব।"

"পদত্যাগ," বলে সিএম চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

"কি?" শুকলাজি বলল, তার মুখ সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে।

"এটা পার্সনাল কোন বিষয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে পদত্যাগ করুন, তাহলে সম্ভবত আবার এখানে চলে আসতে পারবেন।"

"আর কিছুই কি করার নেই?" একটু থেমে এমএলএ বলল।

"আমি আপনাকে বহিষ্কার করতে চাই না, শুকলা। আপনি আমার বন্ধু," সিএম বলল। "কিন্তু পার্টি বন্ধুত্বের ঊর্ধ্বে।"

ধীরে ধীরে শুকলাজি বাস্তবতা বুঝতে পারলো। সে রাগে তার হাত মুঠো করে ফেললো।

"এটা হয়। আপনি আবার চলে আসবেন," সিএম বলল।

তারপর তার কর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে প্রেস সিএম-এর সাথে কথা বলতে অপেক্ষা করে বসে আছে। আমি তাদের সাথে গেট পর্যন্ত চলে গেলাম।

"আমি রুটিনমাফিক পরিদর্শনের জন্য এসেছি," সিএম সাংবাদিকদের বলল।

"দিমনাপুর প্লান্ট দুর্নীতি নিয়ে আপনার বক্তব্য কি?" একজন সাংবাদিক কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"আমি বিষয়টা নিয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নই। এটা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার একটা ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে। আমাদের পার্টি দুর্নীতির ব্যাপারে স্বচ্ছ। তারপরেও যদি কোন অভিযোগ থাকে, আমরা আমাদের নেতাদের বলব পদত্যাগের জন্য।"

সিএম রিপোর্টারদের সাথে ধ্বস্তাধস্তি করে তার গাড়িতে গিয়ে বসল।

"তো এমএলএ শুকলা কি পদত্যাগ করবে?" একজন সাংবাদিক তার মাইক সিএম-এর মুখের কাছে ধরতে পারল।

"এটা তার সিদ্ধান্তের ব্যাপার," সিএম ঘটনার অনিবার্যতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

তার গাড়ি চলে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম আমার গঙ্গাটেকের কি হবে। আমি শুকলাজি'র রুমে ফিরে গেলাম।

"আমরা পত্রিকার অফিস গুড়িয়ে ফেলব," একজন কর্মী শুকলাজিকে বলছে।

শুকলাজি কোন উত্তর দিল না।

"আমাদের বলুন কি করতে হবে, শুকলাজি। সিএম স্যার কি বলে গেলেন?" আরেকজন বলল।

"আমাকে একা থাকতে দাও," শুকলাজি বলল। পার্টির কর্মীরা তার মনের ভাব বুঝতে পারল। মুহূর্তের মধ্যেই রুম ছেড়ে চলে গেল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল বাড়িতে সে আর আমি রইলাম শুধু।

"স্যার, আমি বললাম। "আমাকে কি আপনার দরকার হবে?"

শুকলাজি আমার দিকে তাকাল। সবসময়ের মত গাম্ভীর্য তার মুখে নেই এখন। কনুঁই চেয়ারের হাতলে রেখে মুখ হাতের উপর নিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে সোফায় বসে রইলো সে।

"সিএম একটা বানচোত," সে বলল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"নির্বাচনের ফান্ডিংয়ের সময় সে আমার কাছেই এসেছিল। আমি তার সব জঘন্য

কাজগুলো করে দিয়েছি, সারা স্টেটে মদ বিলি করেছি। এখন সে আমার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে।"

"আপনি এসব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন, শুকলাজি। আপনি সবসময় সেটা পারেন।"

"গঙ্গার পরিশোধন নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। সবাই এই প্ল্যান থেকে টাকা কামিয়েছে। তো শুধুমাত্র আমি কেন?"

আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই। আমি কিছুটা অপরাধবোধ অনুভব করলাম। হয়তো রাঘব আমার উপর তার রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে শুকলাজি'র সাথে এসব করেছে। আবার হয়তো এটা আমার নিছক কল্পনা। রাঘব চাইলে যেকোন কারো মুখোশ খুলে দিতে পারে।

"তুমি গঙ্গাটেক ভালভাবে চালাবে, ঠিক আছে? আমি চাই না এখানের কোন কালি ওটার উপর গিয়ে পড়ুক," সে বলল।

"অবশ্যই স্যার," আমি বললাম। "আর আপনি তো এখানেই আছেন। আমাদের আরও বড় বড় পরিকল্পনা আছে।"

"তারা আমাকে জেলে আটকাবে," সে শান্ত কণ্ঠে বলল। কয়েক দশক রাজনীতি করে ভবিষ্যতের কথা সহজে বলার মতই সে জ্ঞানী হয়ে উঠেছে।

"কি?" আমি যেন শক খেলাম।

"একবার পদত্যাগ করলে আমার কোন ক্ষমতাই থাকবে না। অনেক এমএলএ জিএপি সিস্টেমে টাকা কামিয়েছে। তাদের নাম ছড়ানোর আগেই তারা আমাকে জেলে পুরবে যাতে তারা দেখাতে পারে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে।

"আপনি এমএলএ, শুকলাজি। পুলিশ আপনাকে স্পর্শই করতে পারবে না," আমি বললাম।

"যদি সিএম তাদের বলে তাহলে তারা করতে বাধ্য। আমাকে কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হবে। আর বের হয়ে আসতে হলে ঐ টাকা পরিশোধ করতে হবে।"

আমার পিতৃতুল্য মেন্টর জেলে চলে যাচ্ছে এ চিন্তা আমাকে ভারসাম্যহীন করে ফেলল। আমার জীবনে অল্প কিছু লোক আছে যাদের আমি নিজের বলে মনে করতে পারি, শুকলাজি তাদের মধ্যে একজন।

"এখানে দাঁড়াও," বলে শুকলাজি উঠে দাঁড়াল। সে তার বেডরুমে গিয়ে একতোড়া চাবি নিয়ে এল।

"এটা রাখ," সে বলল। "আমি এরকম দামি জিনিস নিয়ে ধরা পরতে চাই না।"

আমি চাবিগুলো তুলে নিলাম। এগুলো কালো মার্সিডিজের।

"আপনার নতুন গাড়ি? আমি পারব না," চাবিগুলো টেবিলের উপর রেখে দিলাম আমি।

"এটা আমার জন্য রাখ। তুমি আমার ছেলের মত। আমি কিছু টাকাও ট্রাস্টে

সরিয়ে রাখব। কলেজ বড় কর।"

"একা? আমি একা কিভাবে করব?" আমার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। "আপনি এখনো আমার বাড়িতেও যান নি।"

"আমি এখান থেকে এক পা বাইরে বেরোতে পারব না। আমার বড় কুটুমরা বাইরে ক্যামেরা হাতে অপেক্ষা করছে।"

শুকলাজি পরবর্তি একঘণ্টায় তার নানা ব্যাংক একাউন্ট আর ব্যবসা সম্পর্কে বলল। এসব চালানোর লোকজন তার আছে, কিন্তু ইমার্জেন্সির জন্য এসব আমাকে বলে রাখছে। "গঙ্গাটেক আমার সবচেয়ে পরিষ্কার ব্যবসা, আর এটাই আমার বেরিয়ে আসার সহায়ক হতে পারে।"

সে আমার সামনে বসেই তার পদত্যাগপত্র লিখল আর আমাকেই লক্ষ্ণৌতে ফ্যাক্স করার জন্য বলল।

ফ্যাক্স পাঠানো শুরু হতেই ফ্যাক্স মেশিন বিপ দিতে শুরু করল। "সে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিল, না?" শুকলাজি বলল।

"কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার বন্ধু। আমি তাকে বরখাস্ত করিয়েছি, সে আমাকে বরখাস্ত করাল।"

"সে আমার জীবন ধ্বংশ করে দিয়েছে। আমি তার জীবন ধ্বংশ করে দিব," আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

অধ্যায় ৩৩

পরদিন সকালে বারানশি শহরের সবগুলো সংবাদপত্রে দিমনাপুরা প্ল্যান্ট দুর্নীতি প্রথম পাতায় বড় করে ছাপল। শুকলাজি, যার পদত্যাগ প্রচার হয়ে গিয়েছে, তিনি শহরের ভিলেন হয়ে গেলন আর রাঘব কাশ্যপ হয়ে গেল নায়ক। সবাই ফালতু গোলাপি কাগজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিষয়টা কয়েক ঘণ্টা সম্প্রচার করল।

আমি আমার নতুন চল্লিশ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশনে চ্যানেল পাল্টাতে লাগলাম। রাঘবের ইন্টারভিউ চোখে পড়লে আমি থামলাম।

"দুর্নীতির বিষয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের দু-মাস গোপনে কাজ করতে হয়েছে। সবাই জানত এমএলএ সন্দেহজনক কিন্তু শুধুমাত্র প্রমাণের অভাব ছিল। আমাদের টিম সেই প্রমাণটাই সংগ্রহ করেছে," রাঘব আত্মতৃপ্ত কণ্ঠে বলল। তার ওজন কমেছে, শেভ না করা মুখ আর এলোমেলো চুল দেখে মনে হচ্ছে রাতে ঠিকভাবে ঘুমুতে পারে নি। তবুও তার চোখে একধরনের দীপ্তি দেখা যাচ্ছে।

"আপনার টিমে কারা আছে?" সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করল।

"আসলে আমরা একটা ছোট সংবাদপত্র চালাই যার নাম *রেভুল্যুশন ২০২০*। আমিসহ এখানে মোট চারজন। আমাদের অভিজ্ঞতা যদিও কম কিন্তু আমরা প্যাশনেট হয়ে আমাদের কাজগুলো করি।"

"আপনারা আসলে কিসের প্রতি প্যাশনেট?"

"পরিবর্তন নিয়ে আসা। ইন্ডিয়াকে ভালর দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্যই আমাদের বেঁচে থাকা," রাঘব বলল।

"এটা কি সত্যি যে আপনারা মনে করছেন ২০২০ সালে ইন্ডিয়ায় একটা রেভুল্যুশন হবে?"

"হ্যা, কিন্তু এটার জন্য আমাদের সবার কাজ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।"

"রেভুল্যুশনটা আসলে কিসের জন্য হবে?"

"একটা সমাজের জন্য, যেখানে ক্ষমতার চেয়ে সত্য, ন্যায়বিচার এবং সমতা বেশি সম্মানিত হবে। এরকম সমাজই সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।"

"আপনি কি বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলবেন?"

"ক্ষমতা-চালিত সমাজ আসলে পশুদের সমাজের সাথে তুলনীয়। 'শক্তিই সঠিক' এরকম নিয়ম জঙ্গলের জন্য এবং সেটা পশুদের সাথেই খাপ খায়। আর পশুরা উন্নতি করতে পারে না, যেটা মানুষ পারে।"

আমি টিভি বন্ধ করে দিলাম। এসব বুলশিট আমি আর নিতে পারছি না।

শুকলা'র লোকেরাও পারছে না।

নিতেশ, পার্টির একজন কর্মী আমাকে কল করল।

"কি গুড়িয়ে দিয়েছ?" আমি ফোনে বললাম।

"তার একমাত্র কম্পিউটার টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আমরা হ্যামার দিয়ে প্রিন্টিং প্রেসও গুড়িয়ে দিয়েছি।"

"কেউ দেখতে পায় নি তো?"

"আমরা রাতে গিয়েছি। অফিস লন্ডভন্ড করে দিয়েছি। বাস্টার্ড। সে শেষ।"

আমি কাজের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। বাইরে পার্ক করা মার্সিডিজের দিকে আমার চোখ গেল। অফিস থেকে আমার দূরত্ব তিনশ' গজেরও কম। তবুও আমার নতুন গাড়িতে যেতে মন চাইছে।

আমি রাঘবের কথা ভাবলাম। গতকালের এত সাহস দেখানো আর মনযোগ আকর্ষণের পরে আজ তার একটা লন্ডভন্ড অফিস ছাড়া আর কিছুই নেই।

তার নেই কোন চাকরি, কোন ব্যবসা আর এ ঘটনা শেষ হয়ে যাবার পরে কেউই তার কাগজ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না।

"কোথায় স্যার?" ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

"অফিসে," বললাম আমি ।

রাঘবকে বলার জন্য আমি মনে মনে কিছু ডায়ালগ তৈরি করে নিচ্ছি।

"খুব সাধারণ দেখতে ফালতু গোপাল মিশ্রা, যে ছেলেটিকে তুই উপদেশ দিয়েছিলি, 'তুই আগামি বছর আবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস,' একটা মার্সিডিজে বসে আছে। তোর আছে একটা ভাঙা প্রিন্টিং প্রেস। তবুও তোর ধারণা তুই হ্যান্ডসাম, তাই না? আচ্ছা, খুব তাড়াতাড়ি আমি তোর গার্লফ্রেন্ডকে আমার করে নিব। যে মেয়েটিকে তুই আমার কাছ থেকে চুরি করেছিস।"

"স্যার," ড্রাইভার বলল। অফিসে পৌছে গিয়েছি।

আমি আমার অফিসে ঢুকলাম। আমার লেদারের চেয়ারে ডুবে গিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। "আরতি এখন আমার সাথে," এ কথা বলার পরে তার চেহারা কেমন হবে তা অবলোকন করতে লাগলাম। চমৎকার হবে সেটা। আমি পরিকল্পনা করে ফেললাম। আমি তার অফিসে যাব। মার্সিডিজের চাবি ঠাস করে তার টেবিলে রাখব। বলার মত কিছু বাক্যও তৈরি করে ফেললাম।

"কখনো কখনো লুজাররাই জীবনে এগিয়ে থাকে। এটা ভুলে যাস না," আমি জোরে বললাম, ঐ দিনের অনুশীলন হিসেবে।

আরতির আমার হওয়ার খবরটা কোন বাক্য দিয়ে প্রকাশ করব তা এখনো ঠিক করতে পারছি না। কয়েকটা বাক্য চেষ্টা করে দেখলাম।

"দোস্ত, আমি আসলে দুঃখিত কিন্তু আরতি এখন আমার," আমি মিনমিন করে বললাম।

এটার তেজ তেমন বেশি মনে হল না।

"আরতি আর আমি এখন কাপল। এটা তোকে জানাতে এলাম," আমি ক্যাজুয়াল একটা বাক্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না।

কয়েক বছর ধরে যে কথা বলার চেষ্টায় আছি তা একটা বাক্যে কিভাবে বলা সম্ভব? আমি চাই আমার কথার বোমা মেরে তাকে উড়িয়ে দিতে, মারণাস্ত্রের মত তা দিয়ে আঘাত করতে। আমি তাকে জানাতে চাই তার কারণে আমার সারা জীবন নিজেকে ছোট মনে হয়েছে। আমি চাই আমার গাড়ি দেখে, আমার জীবন দেখে সে ঈর্ষায় জ্বলে যাক, জাহান্নামের কষ্ট পাক তার গার্লফ্রেন্ডকে, যাকে সে আমার কাছ থেকে চুরি করেছে, আমি নিয়ে গিয়েছি তা দেখে। আমি তাকে বলতে চাই 'আমি তোর থেকে ভাল, গাধা,' যদিও বাস্তবে তা বললাম না।

আরতি আমার ভাবনায় বিচ্ছেদ ঘটাল।

"ওরা তার অফিসে আক্রমণ করেছে," সে ভগ্ন কণ্ঠে বলল।

"ওহ, তাই নাকি?" আমি বিস্ময়ের ভান করলাম।

"*রেভুল্যুশন ২০২০* আর প্রকাশিত হতে পারবে না। প্রেস ভেঙে ফেলেছে," সে বলল।

আমি আমার ডেস্কের ফাইলগুলোতে চোখ বোলালাম। এই ফালতু কাগজ বের হবে কি না হবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

"তুমি শুনছো?" আরতি বলল।

"এমএল্এ শুকলা'র জেল হতে পারে," আমি বললাম।

"তার জেল হওয়া দরকার, তাই না? সে টাকা চুরি করে নদী দূষিত করেছে।"

"তুমি কি তার পক্ষে, নাকি আমার পক্ষে?" আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম।

"কি? এখানে পক্ষের বিষয় আসছে কোথা থেকে?"

"তুমি কি আমার সাথে আছ?"

"হাহ?" সে বলল।

"আছ কি?"

"হ্যা। কিন্তু সে ঠিক-ঠাক হয়ে যাওয়ার পরে তাকে বলা উচিত হবে না?"

"সে কি কখনো ঠিক হতে পারবে?" আমি বললাম।

আরতি চুপ করে থাকল।

"বাড়িতে এসো," আমি বললাম।

"তোমার বাড়িতে?" সে বলল। "অবশেষে তুমি আমাকে তোমার নতুন বাড়ি দেখাচ্ছ?"

"হ্যা।"

"কাল? কাল আমার মর্নিংশিফট্, তিনটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।"

"আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিব," বললাম তাকে।

আমি একটা চোখ টিভির দিকে আরেকটা প্রবেশপথের দিকে রাখলাম যেদিক দিয়ে মার্সিডিজটা আরতিকে নিয়ে আসবে। বিকেলের বৃষ্টি রাস্তায় জ্যাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই গাড়ি আসতে দেরি করছে। শুকলাজি'র অ্যারেস্ট হওয়ার ছবি সবগুলো চ্যানেলে দেখাচ্ছে।

"আমি কোন দুর্নীতি করি নি। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসব," সে একটা চ্যানেলে দাবি করছে। সে স্বেচ্ছায় নিজেই অ্যারেস্ট হয়েছে যাতে জনগনের কিছুটা সহমর্মিতা পেতে পারে। জেলে যাবার আগে সে আমাকে কল করেছে। তাকে শান্তই মনে হল। হয়তো সে পার্টির সাথে কোন বোঝাপড়া করে নিয়েছে। অথবা হয়তো সে বুঝতেই পারছে না পার্টি তার সাথে কিরকম প্রতারণা করেছে।

"এটা তেমন খারপ না। টাকা দিলে জেল হোটেলের মতই," সে আমাকে বলেছে।

আমি কালো গাড়িটা পৌছাতে দেখলাম। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল, দৌড়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

অধ্যায় ৩৪

সে গাড়ি থেকে নেমে এল। তার কাজের শাড়ি পরে এসেছে।

"ওয়াও, তোমার একটা বাংলো আছে?" সে বলল।

'এটা আমার না, আমাদের' বলতে গিয়েও বললাম না আমি।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তাকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে।

"সব ঠিক আছে?" আমি বললাম।

"রাঘবের রিপোর্ট পুরো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে। এমনকি আমার পরিবারও এতে আক্রান্ত হয়েছে।"

"কি হয়েছে?" আমি বললাম। "আগে ভেতরে এসো!"

সে ভেতরে এসে নতুন সিল্কের কার্পেটে দাঁড়াল যেটা আমি তার সম্মানস্বরূপ বিছিয়ে দিয়েছি। বিশাল টিভি, ভেলভেটের সোফা আর আটজনের ডায়নিং টেবিল দেখল সে। এক মুহূর্তের জন্য রাঘবের কথা ভুলে গেল।

"তোমার কলেজ এত ভাল করছে?" সে বলল, তার চোখ বড়বড়।

"এটা মাত্র শুরু," বলে আমি তাকে ধরার জন্য এগিয়ে এলাম। "তোমাকে পাশে নিয়ে এটা আমি কোথায় নিয়ে যাই দেখো। তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা।"

"বড় মানুষ গোপাল। তুমি বড় মানুষ হয়ে গিয়েছ," সে বলল।

আমি মাথা দোলালাম। "তোমার জন্য আমি সবসময় একই রকম," বলে তার কপালে চুমু দিলাম।

আমি তাকে আমার বাড়ি দেখানোর অফার করলাম। আমরা উপরের তলায় গিয়ে তিনটা বেডরুমের সবগুলো দেখলাম। আমার রুমের বিছানাটা রাজাদের সাইজের, আর ম্যাট্রেসটা বার ইঞ্চি পুরু। বিছানার পাশে আমি বাবার মত একটা রকিং চেয়ার রেখেছি।

আমার গাইড করা ট্যুরের পুরো সময় সে চুপ করে থাকল। যতবার আমি তাকে কিছু দেখালাম, যেমন মার্বেলের টাইলস্, এয়ার-কন্ডিশনার, সে প্রতিবারই যতটা উচ্ছ্বাসিত হওয়া দরকার হল। কিন্তু সে এসব দেখার চেয়ে আমার মধ্যের আনন্দ দেখেই বেশি খুশি হচ্ছে।

আমি নিজেকে বিছানায় ছুড়ে দিলাম। সে রকিং চেয়ারে বসল। আমরা জানালার দিকে তাকালাম যেখানে বৃষ্টি জানালার কাঁচকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

"বৃষ্টি হচ্ছে," সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

"এটা একটা শুভলক্ষণ। তুমি প্রথমবার আমাদের বাড়িতে এলে।" সে একটা ভ্রু উপরে তুলল।

"এটা আমাদের, আমার না। আমি এটা আমাদের জন্য বানিয়েছি," বললাম তাকে।

"চুপ কর। কন্সট্রাকশন যখন শুরু হয়েছে তখন তুমি জানতে না আমরা এক হব," বলে সে হাসলো।

আমিও হাসলাম। "কিন্তু পরে আমি এটা আমাদের জন্যই করেছি। নয়তো আমার এত বড় বাড়ির কি দরকার?"

"তুমি হলে ডিরেক্টর। এটা কোন হাসির বিষয় না," সে বলল।

"তুমি রাঘবের বিষয়ে কথা বলতে চাও?" বললাম তাকে। আমার মনে হচ্ছে সে বলতে চাচ্ছে।

"আমাদের বলার দরকার নেই," সে একটা সাহসী হাসি দিয়ে মাথা দোলাল।

"এখানে এসো," আমি বিছানায় ইশারা করলাম।

সে ইতস্তত করতে লাগলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাত ধরলে আমি তাকে ধীরে ধীরে বসালাম, তাকে চুমু খেলাম, সে-ও চোখ বন্ধ করে আমাকে চুমু খেল। এটা আসলে উন্মত্ততা বা সেক্সুয়াল কিছু নয়। সত্যি বলতে এটা আসলে, এককথায় নিষ্পাপ আর পবিত্র। যাহোক, আমরা অনেকক্ষণ চুমু খেতেই থাকলাম, আমাদের গতি জানালায় বৃষ্টির মতই ধীর। আমি আমার গালে তার চোখের জল অনুভব করলাম। থেমে আমি তার কাঁধ ধরলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে তার মুখ লুকাল। এটা আরতি সবসময়ই করে, আর যখন সে এটা করে আমার কাছে প্রচন্ড ভাল লাগে। আমার নিজেকে তার আশ্রয় বলে মনে হয়।

"কি হয়েছে, আমার ভালবাসা?" আমি তাকে বললাম।

"আমি তোমার জন্য সুখি গোপাল। আমি সত্যি অনেক সুখি।"

"আমাদের জন্য। বল আমাদের জন্য," আমি বললাম।

সে মাথা ঝাঁকাল, যদিও সে কান্নার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

"আমি আমাদের জন্য সুখি। আর তোমার বাড়ি দেখানোর এ সুন্দর সময়টা আমি নষ্ট করতে চাই না।"

"এটা ঠিক আছে," আমি বললাম।

"তুমি এটার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছ। তুমি এটার যোগ্য," সে বলল।

"তুমি কি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছ?" বললাম তাকে।

সে মাথা দুলিয়ে নিজেকে সামলে নিল। আমি তার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করলাম।

"আমি ঠিক আছি। মেয়েরা আসলে আবেগপ্রবণ। তুমি আমার এসব নাটকের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে," সে বলল।

"আমি তোমার নাটকের জন্যই বেঁচে আছি," বললাম আমি।

সে হাসলো।

"রাঘবের কি খবর?"

"ওরা তার অফিস ধ্বংশ করে দিয়েছে।"

"রাজনীতিবিদরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। তার কি আঘাত লেগেছে?" আমি বললাম।

"না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কম্পিউটার আর মেশিনগুলো ভেঙে ফেলেছে। সে বিষয়টা তুলে আনতে চাচ্ছে কিন্তু কোন টাকাই নেই তার কাছে।"

"তার টাকার দরকার? সে আমাকে বলতে পারে," আমি বললাম। সে যদি আমার কাছে এসে হাঁটু ভেঙে টাকা চাইত!

"তুমি জান সে কখনোই এটা করবে না। সে এমনকি আমার কাছ থেকেও টাকা নিবে না।"

"তো?"

"সে ওসব ঠিক করার চিন্তা করছে।"

"তুমি কি এখনো আমার সাথে আছো?" আমি বললাম।

"গোপাল!" সে বলল।

"কি?"

"তা না হলে আমি তোমার বিছানায় বসতাম না। তা না হলে আমি, তুমি জান..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," আমি বললাম। একটা বালিশ নিয়ে হেডরেস্টে হেলান দিয়ে বসলাম। সে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে।

"আমাকে এত প্রশ্ন করা বন্ধ করতে হবে তোমার। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর এটা আমার জন্য কঠিন," সে বলল।

"কি?"

"তার সাথে বিচ্ছেদ করা, বিশেষ করে এমন একটি সময়ে। আর খবরটা তুমি তাকে বলতে চাচ্ছ।"

"এটাই জীবন, আরতি।" আমি পরের সপ্তাহেই রাঘবের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করেছি।

"সহমর্মী হওয়া উচিৎ..." সে বলল।

"আমার প্রতি কেউ সহমর্মী হয় নি যখন আমি টানা দু-বছর ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাই নি। কেউ সহমর্মী হয় নি বাবা যখন মারা গেলেন। আমি এসব নিয়েই বেঁচে থেকেছি। আরতি, সে-ও এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখে যাবে।"

"তোমরা ছেলেরা...সবাইকে এতটা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব কেন?" সে বলল।

"আমি? রাঘব এখন মোটেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আমি কেন তার সাথে প্রতিযোগিতা করব?"

"তারপরেও তুমি কয়েকমাস অপেক্ষা করতে পার..."

বলতেই আমি তাকে বাধা দিলাম। "তুমি অন্য কারও গার্লফ্রেন্ড এটা আমি আর মেনে নিতে পারছি না," উচ্চস্বরে বললাম।

"সতি?" বলে সে আমার গাল টিপে দিল।

"আর এক সেকেন্ডও না," আমি বললাম।

আমি তার রামাদা শাড়ির আঁচল ধরে টান দিলাম, তাকে কাছে নিয়ে এলাম। আমরা চুমু খেলাম। বৃষ্টি বেড়ে গেল, জানালায় ছন্দে ছন্দে আঘাত করতে লাগল। আমরা চুমু খেতে থাকলাম আর স্বাভাবিকভাবেই আমার হাত তার ব্লাউজে চলে গেল।

"মিঃ ডিরেক্টর," সে হেসে বলল, "আমি ভেবেছিলাম সে আমার সিস্টেম থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে চাও না।"

"সে কি বের হয় নি?" আমি বললাম।

"প্রায় সম্পূর্ণ," চোখ বন্ধ করে বলল সে।

"আচ্ছা, এটা হয়তো বাকিটুকু বের করে দিতে সাহায্য করবে," বলে আমি তার ঠোঁট আমার কাছে নিয়ে এলাম।

তার ঘাড় দখল করে নিলাম, জানালায় বৃষ্টিফোঁটার সমপরিমাণ চুমু সেখানে বসিয়ে দিয়ে। আগেরবারের তুলনায় অনেক সচেতনভাবে আমরা আমাদের পোশাক থেকে নিজেদের মুক্ত করলাম।

"এটা আমার কাজের পোশাক, প্লিজ একটু সাবধানে রাখ," সে বলল যখন আমি শাড়ি ভাঁজ করছি যেটা আজীবনেও শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ঠান্ডা আবহাওয়ায় আমাদের নগ্ন শরীরে শীত অনুভব করলাম। আমরা লেপের নিচে জড়াজড়ি করে একজন আরেকজনকে নিয়ে গবেষণা করতে থাকলাম। বৃষ্টি থেমে গেল, আবার শুরু হল, আবারো থেমে গেল। সে আমার আরও কাছে আসতে চাইল, এটা হয়তো রাঘবের থেকে দূরে সরে যাবার প্রমাণ। আমি তাকে দেখাতে চাই তার মূল্য আমার কাছে কতটা। আমি তার জন্য এ বিশাল বাড়ি, কালো গাড়ি, এমনকি পুরো কলেজটা ছেড়ে দিতে পারি।

এবার সে আমার দিকে আত্মসমর্পনের চোখে তাকাল।

আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

"এখন ছয়টা বাজে," সে সাইড-টেবিলে তার মোবাইল ফোনের দিকে অর্ধনির্মীলিত চোখে তাকিয়ে বলল।

"আর দশ মিনিট," আমি তার কাঁধে নাক-মুখ গুঁজে রেখেই বললাম।

"এই আলসে, ওঠো," সে বলল। "আর আমার ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে। এত বড় বাড়ি অথচ কোন খাবার নেই!"

আমি উঠে বসলাম। এখনো ঘুমে কাতর। বললাম, "খাবার আছে। বাবুর্চি তোমার জন্য অনেক খাবার রান্না করেছে। চল নিচে যাই।"

অধ্যায় ৩৫

খাবারের মেনুতে আছে গরম সমুচা, জিলাপি, মসলাসহ পনির টোস্ট আর হট চা।

"এগুলো তো স্বাস্থ্যকর না," আরতি বলল। আমরা ডায়নিং টেবিলে মুখোমুখি বসে আছি।

"বৃষ্টির দিনের জন্য অবশ্য চমৎকার," আমি বললাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসাতে আমি লাইট জ্বেলে দিলাম। সে চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে, খাবারের সাথেসাথে এইমাত্র যা হয়েছে তা-ও হজম করছে। আমার বিকেলের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু বোকার মত এসব কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। মেয়েরা আবেগঘন মুহূর্ত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না, বিশেষ করে কেউ যদি তাদের কাছে এসব শুনতে চায়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ পুরোপুরি ভুলে থাকলেও তারা আবার মন খারাপ করে বসে থাকে।

"চমৎকার," আমি বললাম।

"সমুচা?" সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল।

"না, জিলাপি," আমি বললাম।

সে আমার দিকে এই প্যাচানো হলুদ মিষ্টান্ন ছুড়ে মারল।

"আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকেল," আমাদের হাসি থেমে যাবার পরে বললাম।

"সব ছেলেরা এটাই চায়," সে বলল।

আমি বুঝতে পারলাম এটা নিয়ে আর কথা বলা ঠিক হবে না, আবার সে হয়তো আত্মোদ্ভুত অপরাধবোধের কারণে হতাশা অনুভব করবে।

"হেই তুমি বললে রাঘবের কাজে তোমার পরিবারে সমস্যা হচ্ছে?" আমি বললাম।

"তুমি জান সিএম শুকলাকে বরখাস্ত করেছে, ঠিক? সে নিজে পদত্যাগ করে স্বেচ্ছায় জেলে যায় নি যেমনটা সে টিভিতে বলেছে। পার্টি তাকে এটা করতে বলেছে," বলল সে।

"আমি জানি," আমি বললাম।

দ্বিতীয় কাপ চা ঢালল সে। তাকে নিয়ে একসাথে থাকার কথা আমার কল্পনায় চলে এল। কিভাবে আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে বিছানায় চা খাব। হয়তো বারান্দায় গিয়েও খাব, অথবা লনে বসে। তার সাথে বেতের চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলার দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল। আমি তাকে গঙ্গাটেক হসপিটালিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কল্পনা করলাম। সে যেহেতু ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দরী প্রিন্সিপাল হবে, স্টুডেন্টরা তাকে উত্যক্ত করতে ছাড়বে না নিশ্চয়ই।

আমি তাদের সোজা বহিষ্কার করে দিব যদি তারা চেষ্টা করে...

"তুমি কি আমার কথা শুনছো?" সে চামচ দিয়ে কাপে আঘাত করল।

"হাহ?" আমি বললাম। "সরি, হ্যা, পার্টি শুকলাজিকে বের করে দিয়েছে, তো?"

"আগামি বছরের জন্য পার্টির হাতে তত শক্তিশালী প্রার্থী নেই," আরতি বলল।

"তারা কাউকে বের করে নিবে।" আমার কাপটা শেষ করে করে টেবিলে খালি কাপ রাখলাম আমি। সে আমাকে আরও ঢেলে দিল। আমি আবার প্রায় দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করে দিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আরতির কথায় মনযোগ দিলাম।

"তাদের এমন প্রার্থী দরকার যে জিততে পারবে। তারা এ শহরটাকে হারাতে পারে না। এটা পার্টির সম্মানের একটা জায়গা," সে বলল।

"এতে তোমাদের কি সমস্যা হচ্ছে?"

"তারা আব্বুকে চাচ্ছে," আরতি বলল।

"ওহ!" বললাম আমি। আরতির দাদার পার্টির সাথে ঘনিষ্ঠতার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সে ত্রিশ বছর ধরে পার্টিতে তার আসন ধরে রেখেছিল।

"হ্যা। এখন ডজন ডজন রাজনীতিবীদ প্রতিদিন বাড়িতে আসে। তাকে জোরাজোরি করে–প্রধানজি, দয়া করে নির্বাচনে অংশ নিন।"

"সে নিতে চাচ্ছে না?"

আরতি মাথা দোলাল।

"কেন?" আমি বললাম।

"তার কাছে রাজনীতি ভাল লাগে না। তাছাড়া তার শরীরটাও একটা বিষয়। সে তার হাঁটুর জন্য বেশি সময় হাঁটতে এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে ক্যাম্পেইন বা ওসব র‍্যালি কিভাবে করবে?" আরতি বলল।

"তা ঠিক।"

"এখানেই শেষ না। তুমি সবচেয়ে মজার প্রস্তাবতো শুনোই নি।"

"কি?"

"আমি যেন প্রতিযোগিতা করি," আরতি বলল। সে জোরে হেসে দিল, যেন একটা মজার কৌতুক করেছে। আমি এখানে মজার কিছু পেলাম না।

"সেটা," আমি বললাম, "ভেবে দেখার মত একটা বিষয়।"

"তুমি পাগল হয়েছ?" আরতি বলল। "আমি আর রাজনীতি? এই? আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে জান। তারা আমার ডানা কেটে এয়ার হোস্টেস থেকে গেস্ট রিলেশন্সে বসিয়েছে। এখন তারা আমাকে হাজার হাজার গ্রাম পরিদর্শন আর সত্তর বছর বয়স্কদের সাথে সারা দিন বসিয়ে রাখতে চাচ্ছে?"

"এটাই ক্ষমতা আরতি," আমি বললাম। "এদেশে ক্ষমতা মানেই সবকিছু।"

"ক্ষমতা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার এসবের কোন দরকার নেই। আমি এমনিতেই সুখি," আরতি বলল।

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। তাকে খুবই আন্তরিক মনে হচ্ছে।

"তুমি আমার সাথে সুখি?"

"আমি হব। প্রথমে আমাদের কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিন্তু আমি জানি আমি তা হব," সে বলল, আমার থেকে তাকেই বেশি শোনাল যেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই চলে যেতে চাইল সে। তার বাবার কাছে অনেকে আসছে, বেশিরভাগ পার্টির লোকেরা, যারা আরতির সাথেও দেখা করতে চাচ্ছে। আমি তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিতে গেলাম, যাতে তার সাথে আরও কিছুক্ষণ সময় থাকতে পারি।

"যাওয়ার সময় কিন্তু তুমি একা হয়ে যাবে," আরতি বলল।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"একটা সুন্দর দিন উপহার দেয়ার জন্য ধন্যবাদ," আমরা বাড়িতে পৌছালে সে বলল।

"মাই প্লেজার," বললাম আমি। "রাজনীতিবিদদের সাথে তোমার ডিনার চমৎকার হোক।"

"ওহ, দয়া করে আমার মাথায় একটা গুলি কর," সে বলল। আমরা দুজন গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলাম।

"তুমি সত্যিই এমএলএ হতে চাও না?" পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

সে ঘুরে আমার দিকে তাকাল। "কোনভাবেই না," সে বলল। "হয়তো আমার স্বামী হতে পারে, যদি সে হতে চায়।"

বাড়ির দিকে যাবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

আমি বিস্মিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে কি কিছু বোঝাতে চাইছে? সে কি চায় আমি এমএলএ হই? আরও খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, সে কি চায় আমি তার স্বামী হই?

"আরতি, তুমি কি বললে?" আমি বললাম।

কিন্তু ততক্ষণে সে বাড়িতে চলে গিয়েছে।

আমি জানতাম না বারানশি সেন্ট্রাল জেলে প্রাইভেট-রুম আছে। আমি শুকলাজি'র সেলে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তার ইচ্ছে অনুযায়ী আমি তার জন্য তিন বাক্স ফল, দু বোতল জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল আর এক কেজি করে কাজুবাদাম আর কাঠবাদাম কিনে নিয়ে গেলাম। যে পুলিশ আমার শরীর হাতড়ে পরীক্ষা করল সে পার্সেলগুলো আমার থেকে নিয়ে নিল আর পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করল। আমি ভেবেছিলাম এমএলএ আমার সাথে ওয়েটিং এরিয়ায় দেখা করবে কিন্তু আমি তার সেল পর্যন্ত যেতে পারলাম।

সে তার রুমে বসে আছে, চোখ একটা ছোট্ট রঙিন টিভির দিকে আর স্ট্র দিয়ে কোলায় চুমুক দিচ্ছে।

"তত খারাপ না, তাই না?" সে বলল। হাত নেড়ে আমাকে পনের-বাই-দশ-ফিট সেল দেখাল। এটাতে পরিষ্কার বিছানাসহ একটা খাট, ডেস্ক আর একটা চেয়ার, আলমারি আর একটা টিভি আছে। হ্যা, এটা তত খারাপ দেখাচ্ছে না। জেল মনে না হয়ে এ জায়গাটাকে সরকারি রেস্ট হাউজের মতই মনে হচ্ছে। তবে শুকলাজি'র বাড়ির সাথে এটা নিশ্চয়ই তুলনা করা যায় না।

"এটা তো জঘন্য," আমি বললাম।

সে হাসলো।

"রাজনীতির শুরুর দিকে আমার সাথে তোমার দেখা হওয়ার দরকার ছিল," সে বলল। "আমি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মেও ঘুমিয়েছি।"

"আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছে।" কাঠের চেয়ারটায় বসলাম আমি।

"সর্বোচ্চ ছয় মাস," সে বলল। "তাছাড়া, এরা আমাকে সবকিছুই দিচ্ছে। তুমি তাজ গঙ্গা থেকে খেতে চাও?"

আমি মাথা দোলালাম।

"গাড়ির কি অবস্থা?" সে জানতে চাইল।

"চমৎকার।"

"কলেজ?"

"ভালই চলছে। আমাদের গতি একটু ধীর হয়ে গিয়েছে। মূলধন প্রায় শেষ," আমি বললাম।

"আমি টাকার ব্যবস্থা করে দিব," শুকলাজি প্রতিজ্ঞা করলেন।

"এসব সহজভাবে নিন শুকলাজি। এখন এসব না করলেও হবে," আমি বললাম।

সে টিভি চালু করে দিল। "তোমার বন্ধু আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিল, না?"

"সে আমার বন্ধু না। আর সে এখন শেষ। আর আপনিও বেরিয়ে আসবেন," আমি বললাম।

"তারা আমাকে আগামিবার মনোনয়ন দেবে না," চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সে।

"আমি শুনেছি।"

"কার কাছ থেকে?" শুকলাজি বিস্মিত হল।

আমি তাকে ডিএম-এর মেয়ে আরতির সাথে আমার বন্ধুত্বের কথা বললাম। আমি রাঘবের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টা বললাম না, আর আমার আর তার বিষয়টাও এড়িয়ে গেলাম।

"ওহ আচ্ছা, তুমি তাকে অনেকদিন ধরে চেন, তাই না?" সে বলল।

"স্কুলের বন্ধু," আমি বললাম।

"তো তার বাবা প্রতিযোগিতা করবে না?" শুকলাজি বলল।

মাথা দোলালাম। "মেয়েও করবে না। সে রাজনীতি পছন্দ করে না। তাই আপনার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়।"

"এবার না," শুকলাজি বলল। "আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। জেলের পরপরই না।"

"তাহলে কি তারা অন্য কাউকে পেয়ে যাবে?"

"ডিএম-এর পরিবার অবশ্য নিশ্চিত জিতে যেত," সে বলল। "জনগন তাদের ভালবাসে।"

"তারা একদমই আগ্রহী না," আমি বললাম।

"তুমি তার সাথে কতটা ঘনিষ্ঠ?" তার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আমাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে ফেলল।

আমি কখনো শুকলাজি'র সাথে মিথ্যে বলি নি। কিন্তু আমি আরতি আর আমার ব্যাপারে সবকিছু বলে দিতে চাইছি না।

আমি চুপ করে থাকলাম।

"তুমি তাকে পছন্দ কর?"

"বাদ দিন শুকলাজি। আপনি জানেন আমি আমার কাজ নিয়েই ডুবে আছি," কৌশলে বিষয়টা এড়াতে চাচ্ছি আমি।

"আমি কাজের কথাই বলছি, বোকা ছেলে," শুকলাজি বলল।

"কি?" আমি বললাম। অবাক হয়ে গেলাম এমএলএ কিভাবে জেলে বসেও রাজনীতিতে প্রবল উৎসাহ বজায় রেখে চলছে।

"তুমি তাকে বিয়ে কর। যদি পা-ভাঙ্গা ডিএম আর তার মেয়ে প্রতিযোগিতা না করে, তার মেয়ের জামাই করবে।"

"কি? এ কথা আপনি কিভাবে বললেন?"

"আমি ইন্ডিয়ার রাজনীতিতে পঁচিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময় তারা এটাই করবে। তুমি দেখো, তারা তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিবে।"

"তার বাবা-মা তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে।"

"তাকে বিয়ে কর। নির্বাচনে প্রতিযোগিতা কর আর সহজে এটা জিতে নাও।"

আমি চুপ করে থাকলাম।

"তুমি কি ভাবতে পার তুমি এমএলএ হলে তোমার গঙ্গাটেক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমি একদিন বাইরে চলে আসব, হয়তো অন্যকোন পদ নিয়ে। আর আমরা দুজন যদি ক্ষমতায় থাকি, আমরাই শহর চালাব, হয়তো পুরো স্টেট চালাব। এমন কি তার দাদা কিছুদিন সিএম ছিল!"

"আমি তাকে বিয়ের কথা এখনো ভাবি নি," মিথ্যে বললাম।

"ভাবাভাবির কিছু নেই। করে ফেল। তোমার কি ধারণা, সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"তার মা-কে তোমার টাকা আর গাড়ি দেখাও। কোন যৌতুক নিবে না। মেয়ে রাজি না হলেও তার মা হবে।"

"শুকলাজি, আমি? রাজনীতিবিদ?"

"হ্যা। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী আর শিক্ষাবিদ–ক্ষমতা, টাকা আর সম্মানের সমন্বয়। তুমি বড় হবার জন্যই জন্মেছ গোপাল। আমি এটা জানি যেদিন তুমি আমার অফিসে প্রথম এসেছ সেদিন থেকেই," সে বলল।

শুকলাজি দুটো গ্লাসে ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি ঢালল। গার্ডকে বরফ আনতে বলল। সে ড্রিংক তৈরি করতে থাকলে আমি চিন্তিত ভঙ্গীতে চুপ করে বসে থাকলাম। এটা ঠিক যে ইন্ডিয়াতে ক্ষমতা খারাপ কোন জিনিস নয়। যেকোন কিছু করতে হলেই ক্ষমতার দরকার। ক্ষমতা মানে জনগন আমাকে টাকা দিবে, কোন কিছু করতে আমার টাকা দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। গঙ্গাটেক এখনকার চেয়ে দশগুণ হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমি আরতিকে ভালবাসি। আমি তো তাকে বিয়ে করবই, তো এখন কেন না? তাছাড়া সেও কিছু একটা ইঙ্গিত করেছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আমি আমার আত্মবিশ্বাসের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিলাম। *এটা কোন ব্যাপার না গোপাল,* আমি নিজেকে বললাম। *তুই বড় হবার জন্যই জন্মেছিস। শুধুমাত্র এআইইইই-তে চান্স না পাওয়া, শুধুমাত্র মলিকুলার ফর্মুলা ভুলে যাওয়াই প্রমাণ করে না তুই বড় কিছু করতে পারবি না।* শত হোক, আমি একটা কলেজ চালু করেছি, একটা বিশাল বাড়িতে থাকছি আর দামি একটা গাড়িতে করে ঘুরছি।

শুকলাজি আমার হাতে ড্রিংক তুলে দিলো।

"আমি মেয়েটাকে পেতে পারি," আমি বললাম।

"সে জন্য চিয়ার্স, মিঃ জামাই!" শুকলাজি তার গ্লাস উপরে তুলে ধরলেন।

অধ্যায় ৩৬

"ব্যস্ত?" আমি বললাম।

আরতিকে কাজের সময় কল করেছি। রুমের পানি ততটা গরম না হওয়াতে একজন টুরিস্ট তার সাথে চেঁচাচ্ছে। লোকটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় চেঁচামেচি করতে থাকলে আরতি কিছুক্ষণের জন্য আমার কল হোল্ড করে রাখল।

"আমি পরে কল করতে পারি," বললাম তাকে।

"না, ঠিক আছে। হাউজকিপিং এসব দেখবে। আমার কান ব্যথা হয়ে গিয়েছে!" আরতি হড়বড় করে বলল।

"একদিন তুমি একটা কলেজের মালিক হবে। তখন তোমাকে এসব করতে হবে না।"

"এটা ঠিক আছে গোপাল। আমি সত্যিই আমার কাজকে ভালবাসি। মাঝেমধ্যে এরকম কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক থাকে। যাহোক, তোমার কি খবর?"

"ডিনার কেমন হল?"

"বিরক্তিকর। যখন পঞ্চম লোকটা আমাকে পার্টির প্রতি প্রধান-পরিবারের কর্তব্য ব্যাখ্যা করছিল আমি প্রায় ঘুমিয়েই যাচ্ছিলাম।"

"মনোনয়নের বিষয়ে কোন সমাধান হয়েছে?"

"এটা রাজনীতি, ডিরেক্টর স্যার, এখানে সমাধান এত সহজে হয় না। যাহোক, সামনের বছর নির্বাচন।"

"তুমি বিদায় নেবার সময় কি যেন বলেছিলে," আমি বললাম।

আমি যেন তার হাসি দেখতে পেলাম। "কিছু বলেছিলাম?" সে বলল।

"তোমার স্বামীর এমএলএ হওয়ার বিষয়ে কিছু একটা?"

"হতে পারে, কেন?" সে বলল, তার কণ্ঠ শিশুদের মত।

"আমি ভাবলাম আমি কি আবেদন করতে পারি?"

"স্বামী হবার জন্য নাকি এমএলএ হবার জন্য?"

"আমি জানি না। যেটার ওয়েটিং-লিস্ট সবচেয়ে ছোট," বললাম আমি।

আরতি হেসে উঠল।

"স্বামী হবার জন্য লাইন তুলনামূলক দীর্ঘ," সে বলল।

"আমি মোটামুটি লাফিয়ে লাইনের প্রথমে চলে যেতে পারি।"

"তা অবশ্য ঠিক," সে বলল। "আচ্ছা, আরেকজন গেস্ট আসছে। পরে কথা বলি?"

"আমি তাড়াতাড়ি রাঘবের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"আমি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।" সে আমার রাঘবের সাথে দেখা করার প্রস্তাবে না করে নি। এটাকে আমি তার সম্মতি হিসেবে ধরে নিলাম।

"ইচ্ছাকৃতভাবে?" আমি বললাম।

"হ্যা, আমাদের একটু রাগারাগি হয়েছিল। সবসময় আমি এসবের সমাধান করি, এবার আমি কিছুই করি নি।"

"ভাল," আমি বললাম। "তো টুরিস্ট কি বলছে?"

"সে জাপানিজ। তারা ভদ্র। আমার কল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"

"তাকে বল তুমি তোমার স্বামীর সাথে ফোনে কথা বলছ।"

"চুপ কর। বাই।"

"বাই," বলে আমি ফোনটাকে চুমু খেলাম। আমার ডেস্কের ক্যালেন্ডারটা নিয়ে পরবর্তি শুক্রবারকে চিহ্নিত করলাম রাঘবের সাথে দেখা করার দিন হিসেবে।

আমি গুচি পারফিউমের মুখ পাঁচবার আমার ঘাড়ে, বগলে আর কনুঁইয়ে চেপে ধরলাম। এ উপলক্ষে একটা নতুন কালো শার্ট আর মাপ দিয়ে বানানো নতুন স্যুট পরলাম। আমি আমার রে-বন সানগ্লাস পরে আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। সানগ্লাসটা একটু বেশি বেশি মনে হল, তাই সেটা শার্টের পকেটে রেখে দিলাম।

শুক্রবারে ছুটি নিলাম। ডিন স্যার আমাকে ফার্স্ট-টার্মে স্টুডেন্টদের একাডেমিক পারফরমেন্স বিষয়ে একটা রিপোর্ট নিয়ে বিরক্ত করতে শুরু করেছিল। একটা অজুহাত দেখিয়ে আমাকে বের হয়ে আসতে হয়েছে।

"অল দ্য বেস্ট। যত কম সম্ভব আঘাত দিয়ে পার," আরতি আমাকে মেসেজ দিয়েছে।

আমি তাকে নিশ্চিত করলাম আমি পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামাল দিব। আরতির দিক থেকে সে রাঘবকে মেসেজ পাঠিয়েছে 'আমাদের কথা বলা দরকার' এরকম কিছু আর রাঘব সেখানে 'কথা বলার জন্য এটা ভাল সময় নয়' এরকম মেসেজ পাঠিয়েছে–প্রথমত এটা আরতিকে বিরক্ত করেছে।

আমি আমার ড্রাইভারকে নাদেশার রোডে যেতে বললাম, রাঘবের কর্মস্থল যেখানে।

এতসব অটো মেরামতের দোকানের ভীড়ে সহজেই যে কেউ *রেভুল্যুশন-২০২০* অফিস হারিয়ে ফেলবে। রাঘব একটা গ্যারেজ ভাড়া করেছে। অফিসে তিনটা জায়গা আছে–ভেতরে একটা প্রিন্টিংয়ের জায়গা, মাঝখানে তার বসার একটা কেবিন আর স্টাফ ও ভিজিটরদের জন্য প্রবেশপথে একটা জায়গা।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" একটা টিনএজার ছেলে বলল।

"আমি রাঘবের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

"মিঃ রাঘব লোকজনের সাথে কথা বলছে," ছেলেটা বলল। "এটা কি বিষয়ে?"

আমি গ্যারেজের ভেতরে তাকালাম। রাঘবের অফিসে একদিকে কাঁচের পার্টিশন

দেয়া আছে। সে তার ডেস্কে বসে আছে। রাঘবের বিপরীতে একজন কৃষক কর্দমাক্ত পাগড়ি আর একটা দুর্বল শিশু নিয়ে বসে আছে। বাবা-ছেলে দুজনকেই গরীব আর অগোছালো লাগল। রাঘব টেবিলে কনুঁই রেখে গম্ভীর মুখে তাদের কথা শুনছে।

"এটা আসলে পার্সনাল," আমি আমার সামনের টিনেজার ছেলেটাকে বললাম।

"সে কি জানে আপনি আসবেন?"

"না, কিন্তু সে আমাকে ভালভাবেই চিনে," আমি বললাম।

রাঘব আমাকে দেখতে পেয়ে তার কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

"গোপাল?" রাঘব বিস্মিত হয়ে বলল। সে যদি আমার উপর রাগ করে থাকত তাহলে সে এটা করত না।

রাঘব তার পত্রিকার লোগো সম্বলিত একটা টি-শার্ট আর পুরনো একটা জিন্স পরেছে। সঙ্কটে থাকা একজন মানুষের তুলনায় তাকে যথেষ্ট ভাল দেখাচ্ছে।

"আমরা কি কথা বলতে পারি?" বললাম তাকে।

"এমএলএ শুকলা তোকে পাঠিয়েছে?"

"না," আমি বললাম। "এটা আসলে পার্সোনাল।"

"তুই কি আমাকে দশ মিনিট সময় দিতে পারবি?" সে বলল।

"আমি বেশিক্ষণ থাকব না।"

"আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এই লোকগুলো একশ' কিলোমিটার দূর থেকে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। তাদের একটা ট্র্যাজেডি আছে। এটা এখনি শেষ হয়ে যাবে।"

আমি তার অফিসের দিকে ফিরে তাকালাম। ছেলেটা এখন তার বাবার কোলে শুয়ে আছে। তাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

"ঠিক আছে," বলে আমি ঘড়ি দেখলাম।

"থ্যাঙ্কস। অঙ্কিত এখানে তোকে সাহায্য করবে," সে বলল।

রাঘব ভেতরে চলে গেলে টিনএজার ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"দয়া করে বসুন," অঙ্কিত অতিথিদের চেয়ারের দিকে দেখিয়ে বলল। আমি রাঘবের অফিসের ঠিক পাশের চেয়ারে বসলাম।

অঙ্কিতের সাথে সময় কাটাতে কথা বলতে লাগলাম।

"এখানে আর কেউ নেই?"

"আমাদের আরও দুজন স্টাফ মেম্বার ছিল," অঙ্কিত বলল। "অফিসে ভাংচুরের পরে তার চলে গিয়েছে। তাদের বাবা-মা এটাকে আর নিরাপদ বলে মনে করে নি। এজন্য বেতনও দেরিতে হচ্ছিল।"

"তুমি যাও নি কেন?" আমি বললাম।

অঙ্কিত মাথা দোলাল। "আমি এখানে রাঘব স্যারের জন্য থাকতে চাই।"

"কেন?"

"সে একজন ভাল মানুষ," অঙ্কিত বলল।

কথাগুলো আমাকে ছুরির মত আঘাত করলেও আমি হাসলাম।

"অফিস তো তত খারাপ দেখাচ্ছে না," আমি বললাম।

"আমরা এটা পরিষ্কার করেছি। যদিও প্রেস ভাঙা। আমাদের কম্পিউটারও নেই।"

"তোমরা একটা বড় খবর ছেপেছ," আমি বললাম। "তারা তোমাদের কারণে একজন এমএলএ-কে বরখাস্ত করেছে।"

অঙ্কিত আমার দিকে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে তাকাল। "মিডিয়া তাদের স্বার্থে এ খবর নিয়ে দৌড়ঝাপ করেছে। কিন্তু আমাদের খবর কে নিচ্ছে?"

"তোমরা এখন কি করছ?"

অঙ্কিত ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে হাতে লেখা একটা বড় কাগজ বের করল সে।

"স্যার আর্টিকেলগুলো লিখেন, আমি পাত্র-পাত্রি চাই এসব লিখি। আমরা ফটোকপি করে যত কপি সম্ভব বিলি করি।"

"কয় কপি হয়?" আমি বললাম।

"চারশ' কপি। এটা হাতে লিখে ফটোকপি করা; অবশ্যই বেশি মানুষ এটা পছন্দ করে না।"

আমি এ-থ্রি সাইজের কাগজটা পরীক্ষা করে দেখলাম। রাঘব বারানশিতে অবৈধ রেশনের দোকানের উপরে আর্টিকেল লিখেছে। সে হাতে একটা টেবিল এঁকে অফিসিয়াল দাম, কালোবাজারের দাম আর বিভিন্ন পণ্যের জন্য দোকানমালিকেরা যে টাকা উপার্জন করছে তা দেখিয়েছে। আমি কাগজটা উল্টালাম, এখানে প্রায় পঞ্চাশটা বিয়ের বিজ্ঞাপন সতর্কতার সাথে লিখা হয়েছে।

"চারশ" কপি?" এত কম ছাপালে তোমরা বিজ্ঞাপন পাবে কিভাবে?"

অঙ্কিত কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোন উত্তর দিল না। "আমাকে ফটোকপির দোকানে যেতে হবে," সে বলল। "একা থাকতে আপনার কোন সমস্যা হবে?"

"কোন সমস্যা নেই, আমি ভাল থাকব," বসে থেকে বললাম। আমি আমার ফোন চেক করলাম। আরতি মেসেজ পাঠিয়েছে: "তুমি যা-ই কর না কেন, মানবিক থেক।"

আমি ফোনটা পকেটে রেখে দিলাম। স্যুটের ভেতর গরম অনুভব করলাম আমি। বুঝতে পারলাম কেউ ফ্যান ছাড়ে নি।

"সুইচ কোথায়?" অঙ্কিতকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"বিদ্যুৎ নেই, দুঃখিত। তারা বিদ্যুৎ সংযোগ কেঁটে দিয়েছে।" অঙ্কিত অফিস থেকে বাইরে চলে গেল।

আমি জ্যাকেট খুলে শার্টের উপরের দুটো বোতাম খুলে ফেললাম। এ ঘিঞ্জি জায়গায় অপেক্ষা করার চাইতে আমার গাড়িতে বসে থাকলে ভাল হত। যাহোক, ড্রাইভারকে কল করা আবার আরেক ঝামেলা হবে। আমি এয়ার কন্ডিশন্ড পরিবেশে

থাকতে থাকতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। গরম রুমটা আমাকে বাবার সাথে আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিল। কোন কারণে ঐ রুমে বাবার কোলে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটার কথাও মনে পড়ে গেল।

আমি আবার চোখের কোণা দিয়ে তাদের দিকে তাকালাম। কৃষকের চোখে পানি দেখতে পেলাম। তার কথা শোনার জন্য সামনের দিকে একটু ঝুঁকলাম।

"আমি আমার স্ত্রী আর একটা সন্তান হারিয়েছি। আমি আমার পরিবারের আর কোন সদস্যকে হারাতে চাই না। এখন শুধুমাত্র এই ছেলেটি আমার আছে," কৃষক লোকটি জোরহাতে বলল।

"বিষ্ণুজি, আমি বুঝতে পারছি," রাঘব বলল। "আমার পত্রিকা দিমনাপুরা প্ল্যান্ট দুর্নীতি নিয়ে বড় একটা খবর ছেপেছি। এটার কারণে তারা আমার অফিস ভেঙে ফেলেছে।"

"কিন্তু আপনি রোশনপুর এসে অবস্থাটা দেখে যান। স্যুয়েজের পানিতে সবজায়গা একাকার। গ্রামের অর্ধেক শিশু অসুস্থ। ছয়জন এরমধ্যে মারা গিয়েছে।"

"রোশনপুরে আরেকটা প্ল্যান্ট আছে। কেউ হয়তো সেখানেও সরকারের সাথে ধোঁকাবাজি করেছে," রাঘব বলল।

"কিন্তু কেউ এসব নিয়ে কিছু লিখছে না। কর্তৃপক্ষ কিছুই করছে না। আপনি আমাদের একমাত্র আশা," কৃষক বলল। পাগড়ী খুলে রাঘবের ডেস্কে রাখল সে।

"কি করছেন আপনি বিষ্ণুজি?" নিঃস্ব মানুষটিকে তার পাগড়ী ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল রাঘব। "আমি কেউই না। আমার পত্রিকা বন্ধ হবার দোরগোড়ায়। আমরা হাতে লিখে যত কপি পারি বিলি করি, যার বেশিরভাগই ডাস্টবিনে চলে যায়।"

"আমি আমার ছেলেকে বলেছি আপনি এ শহরের সবচেয়ে সাহসী আর সৎ মানুষ," বিষ্ণু বলল, তার কণ্ঠ আবেগে কম্পিত।

রাঘব নিরাশার একটা হাসি হাসলো। "এটার আসলে মানে কি?"

"সরকার যদি আমাদের শিশুদের জন্য কিছু ডাক্তার অন্তত পাঠাত, এর জন্য দায়ি লোকেরা শাস্তি পেল কি পেল না তা নিয়ে আমরা মোটেও ভাবতাম না," লোকটা বলল।

রাঘব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে আবার কথা বলার আগে তার ঘাড়ের পেছন দিকটা চুলকালো। "ঠিক আছে, আমি আপনাদের গ্রামে গিয়ে এটা নিয়ে একটা রিপোর্ট করব। এখন এ খবর খুব কম ছড়াবে। আমার পত্রিকা যদি টিকে থাকে, আমরা একদিন বড় করে এটা ছাপব। যদি না থাকে, তাহলে কোন কথা নেই। ঠিক আছে?"

"ধন্যবাদ রাঘবজি!" তার চেখে আশার কিছু একটা ছিল, আমি খেয়াল না করে পারলাম না।

"আর আমার এক বন্ধুর বাবা ডাক্তার। আমি দেখব সে আপনাদের গ্রামে যেতে পারে কি না।"

রাঘব আলোচনা শেষ করার জন্য উঠে দাঁড়ালে লোকটাও উঠে দাঁড়াল, এতে তার ছেলে জেগে উঠে নিচু হয়ে রাঘবের পা ছুতে চাইল এবার।

"না, না, কি করছ," রাঘব বলল। "এখন আমার একটা মিটিং আছে। এটার পরে, চলুন আজই আপনার গ্রামে যাই। কত দূরে এটা?"

"একশ' বিশ কিলোমিটার। তিনটা বাস পাল্টাতে হয়," কৃষক লোকটা বলল। "সর্বোচ্চ পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন।"

লোকটা আর তার দুর্বল ঘুমকাতুরে ছেলেকে অফিসের বাইরে নিয়ে এল রাঘব ।

"এখানে বসুন বিষ্ণুজি," রাঘব বলে আমার দিকে তাকাল। "দু মিনিট গোপাল? অফিসটা একটু পরিষ্কার করি।"

রাঘব ভেতরে গিয়ে তার ডেস্কের কাগজগুলো বাছাই করতে লাগল।

লোকাটা আমার দিকে মুখ করে অঙ্কিতের চেয়ারে বসে রইল। আমরা সংক্ষিপ্ত হাসি বিনিময় করলাম।

"ওর নাম কি?" লোকটার কোলে আবার ঘুমিয়ে পড়া ছেলেটার দিকে দেখিয়ে বললাম।

"কেশব," কৃষক লোকটি বলল, তার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে।

আমি মাথা নেড়ে চুপ করে থাকলাম। ফোন নিয়ে খেলা করতে লাগলাম, উপরে আর নিচে ছুড়ে মেরে, উপর আর নিচ। আমি প্যান্টের পকেটে মার্সিডিজের ডুপ্লিকেট চাবিগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করলাম।

"বাবা, আমি কি মরে যাব?" কেশব বলল, তার কণ্ঠ কিছুটা ঘোরলাগা।

"বোকা ছেলে। কিসব বকছিস?" কৃষক লোকটি বলল।

ছেলেটার জন্য আমার খারাপ লাগল। সে যখন বড় হবে তখন তার মায়ের কথা মনে করতে পারবে না, ঠিক আমার মত। আমি আমার পকেটের চাবিগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম, আশা করলাম এতে আমার কাছে ভাল লাগবে।

রাঘব তার ডেস্ক আর চেয়ার থেকে ধুলো ঝাড়ছে। তার পত্রিকা হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে আর তার কাছে কোন টাকা নেই। তবুও সে দূরের একটা গ্রামে গিয়ে অপরিচিত কিছু মানুষদের সাহায্য করতে চাচ্ছে। তার অফিস ভেঙে ফেলেছে, তার উদ্যম ভাঙতে পারে নি।

আমি চাবিগুলো আরও শক্ত করে ধরে রইলাম, নিজেকে তার চেয়ে ভাল প্রমাণের জন্য। বুঝতে পারলাম ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি বিরক্ত অনুভব করছি, যেন সে আমাকে প্রশ্ন করছে আর আমার কাছে কোন উত্তর নেই।

তুই কি হয়ে গিয়েছিস গোপাল? আমার মাথার মধ্যে একটা কণ্ঠ বেজে উঠল।

আমি তাড়াহুড়া করে আমার পকেট থেকে সানগ্লাসটা বের করে হাতে ঘুরাতে

লাগলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কেশব ছেলেটার চোখও সানগাসের সাথে সাথে ঘুরছে। আমি ওটা ডানে ঘুরালাম, তার চোখ সেদিকে গেল। আমি ওটা বায়ে ঘুরাতেই আবার তার চোখ ওটাকে অনুসরণ করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

"কি হল?" আমি আমার দামি সানগ্লাসের দিকে দেখিয়ে বললাম। "তুমি এটা নিবে?"

কেশব উঠে বসল, দুর্বল কিন্তু আগ্রহী। তার বাবার বারবার না বলা সত্ত্বেও আমি তাকে সানগ্লাসটা দিয়ে একরকম স্বস্তি অনুভব করলাম।

"এটা আমার বড় হয়," ছেলেটা সানগ্লাস পরতে পরতে বলল। বিশাল আকারের সানগাসে তাকে আরও রোগা দেখাচ্ছে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। রুমের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেশি। আমার অসুস্থ লাগছে। রাঘব এখন ফোনে কথা বলছে।

আমার মন কথা বলতেই থাকল। *তুই এখানে কি করতে এসেছিস? তুই কি তাকে এসব দেখাতে এসেছিস যে তুই সবকিছু করে ফেলেছিস আর সে ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে? এটাই কি তোর জীবনের বড় অর্জন? তুই কি তোর গাড়ি আর স্যুটের কারণে নিজেকে তার থেকে বড় মনে করছিস?*

"গোপাল!" রাঘব ডাক দিল।

"হাহ?" আমি চোখ খুলে বললাম। "কি?"

"ভেতরে আয়," রাঘব বলল।

আমি তার অফিসের ভেতরে গেলাম। আমার পকেটের ভেতরে হাত রাখলাম চাবির উপরে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি বসার আগেই চাবি বের করে তার টেবিলের উপরে ঠাস করে রাখার কথা কিন্তু আমি তা পারলাম না।

"পকেটে কি?" রাঘব আমার হাত পকেট থেকে বের হচ্ছে না দেখে জানতে চাইল।

"ওহ কিছু না," বলে আমি চাবি ছেড়ে দিয়ে তার মুখোমুখি বসলাম।

"তোকে *রেভুল্যুশন ২০২০*-তে কোন জিনিসটা নিয়ে এল? আমরা কি তোর বসদের আবারো বিরক্ত করেছি?" রাঘব হেসে উঠল। "ওহ, আচ্ছা, তুই বলেছিলি এটা পার্সোনাল বিষয়।"

"হ্যা," আমি বললাম।

"কি?" রাঘব বলল।

আমি জানি না কি বলব। আমার সমগ্র কথার পরিকল্পনা করা আছে। কিভাবে আরতি তার থেকে ভাল ছেলে পাবার যোগ্যতা রাখে, আর সেই ভাল ছেলেটি আমি। কিভাবে আমি জীবনে এতকিছু করে ফেলেছি আর তার কোন অস্তিত্বই নেই। কিভাবে সে একজন পরাজিত, কিন্তু আমি সফল। আর এখন এসব বলার চিন্তা করাতে নিজেকেই পরাজিত বলে মনে হচ্ছে।

"পত্রিকা কেমন চলছে?" এ বিরক্তিকর নিরবতা ভাঙার জন্য আমি বললাম।

সে শূন্যে তার হাত নাড়ল। "তুই নিজেই তা দেখতে পাচ্ছিস।"

"এটা বন্ধ হয়ে গেলে তুই কি করবি?"

রাঘব হাসলো না। "এখনো ভাবি নি। প্রথম দশার সমাপ্তি হবে আমার ধারণা।"

আমি চুপ করে থাকলাম।

"আশা করছি আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে চাকরি নিতে হবে না। হয়তো আমাকে আবেদন করতে হবে..." রাঘবের কণ্ঠ থেমে গেল।

আমি বলতে পারি রাঘব তা জানে না। সে এখনো তা ভাবে নি।

"আমি দুঃখিত গোপাল," রাঘব বলল। "আমি যদি আগে তোকে দুঃখ দিয়ে থাকি। তুই যা ভাবিস না কেন, এটা মোটেও পার্সোনাল ছিল না।"

"তুই এসব কেন করছিস রাঘব? তুই যথেষ্ট স্মার্ট। তুই কেন আমাদের সবার মত শুধুমাত্র টাকা উপার্জন করছিস না?"

"কাউকে এসব করতে হবে গোপাল। না হলে এসব পরিবর্তন হবে কি করে?"

"পুরো সিস্টেমই দূষিত। একজন লোক তা পরিবর্তন করতে পারে না।"

"আমি জানি।"

"তো?"

"আমাদের সবার নিজের অংশটুকু করা উচিত। পরিবর্তনের জন্য একটা রেভুল্যুশন দরকার। একটা যথার্থ রেভুল্যুশন তখনই হবে যখন সবাই নিজেকে জিজ্ঞেস করবে–আমি কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছি?"

"তোর পত্রিকার ট্যাগলাইনের মতই শোনাচ্ছে," আমি উপহাস করে বললাম।

সে কোন উত্তর দিল না। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি। সে আমাকে বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। আমি গাড়ি না ডাকার সিদ্ধান্ত নিলাম, লেন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে নিজেই খুঁজে বের করব বলে ভাবলাম।

"তুই এখানে কেন এসেছিস?" রাঘব বলল। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুই আমার সাথে শুধুমাত্র দেখা করতেই এসেছিস।"

"এখানে আমার কাজ ছিল। গাড়ি মেরামত করতে হয়েছে। ভাবলাম এটা ঠিক হতে হতে তোর সাথে দেখা করি," বললাম আমি।

"তুই এসেছিস খুব ভাল লাগল। মাঝেমধ্যে আরতির সাথে দেখা করলেও ভাল হয়," সে বলল।

তার নাম উচ্চারণ করাতে আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম।

"হ্যা। তার কি খবর এখন?" আমি বললাম।

"অনেকদিন হয়ে গিয়েছে দেখা হয় না, কিন্তু তার মন ভাল নেই মনে হচ্ছে। আসলে আমার কারণেই হয়তো। তুই তাকে কল করলে সে খুশি হবে," রাঘব বলল।

আমি মাথা নেড়ে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

অধ্যায় ৩৭

রাতে আমি আমার আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে আছি। কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতে পারছি না। আরতির তিনটা মিসড্ কল দেখাচ্ছে ফোনে। আমি কল ব্যাক করছি না। করতে পারছি না। আমি জানি না তাকে কি বলব।

"এটা কেমন হল?" সে আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে।

আমি বুঝতে পারলাম আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সে আমাকে জিজ্ঞেস করতেই থাকবে। আমি তাকে কল করলাম।

"তুমি ফোন ধরছ না কেন?"

"সরি, ডিন স্যার বাড়িতে এসেছিল। এইমাত্র চলে গেল সে।"

"তুমি রাঘবের সাথে দেখা করেছিলে?" সে অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা," দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

"তো?"

"তার অফিসে লোকজন ছিল। আমি এই প্রসঙ্গ তুলতে পারি নি।"

"গোপাল, আমি আশা করছি তুমি বুঝতে পারছ যতক্ষণ তার সাথে আমার ব্রেক-আপ না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার কারণে তার সাথে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। আমি কি তার সাথে কথা বলব?"

"না, না, দাঁড়াও। আমি প্রাইভেটলি তার সাথে দেখা করব।"

"আর আমার আব্বু-আম্মুর সাথেও কথা বলতে হবে আমাকে," সে বলল।

"কি বিষয়ে?"

"সামনের সপ্তাহে তিনটা পাত্রপক্ষ দেখা করেতে আসবে। সবাই রাজনীতিবিদ পরিবারের।"

"তোমার বাবা-মা কি পাগল হয়ে গিয়েছে?" আমি ফেটে পড়লাম যেন।

"এটা যখন তাদের মেয়েদের বিষয়, ইন্ডিয়ার বাবা-মা'রা পাগল হয়েই যায়," সে বলল। "আমি তাদের থামিয়ে রাখতে পারব, কিন্তু সেটা বেশি দিন না।"

"ঠিক আছে, আমি এটা ঠিক করে ফেলব।"

আমি আমার কাছে দুটো বালিশ টেনে নিলাম।

"দেখ, সেক্সের পরে এটাই হয়। নাটকের পাট পাল্টে যায়। মেয়েদের তখন পিছে পিছে ঘুরতে হয়।"

"এরকম কিছুই না আরতি। আমাকে দুটো দিন সময় দাও।"

"ঠিক আছে। অন্যথায় আমি নিজেই রাঘবের সাথে কথা বলব। আর যদি সে জিজ্ঞেস করে, আমাদের মধ্যে কখনোই কিছু হয় নি।"

"তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?" আমি বললাম।

"আমি কখনোই তার সাথে প্রতারণা করি নি। আমরা একত্র হতে চেয়েছি, কিন্তু তা শুধুমাত্র ব্রেক-আপের পরেই আমরা দুজন এক হয়েছি। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম।

কখনো কখনো আমার মনে হয় মেয়েরা তাদের জীবনটাকে জটিল করে তুলতে ভালবাসে।

"নয়তো সে খুবই খুবই কষ্ট পাবে," সে শেষ করল।

আমি কল শেষ করে বিছানায় পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সবার পরে আসা অতিরিক্ত সাদা রঙের কাপড়ে আমার চোখে ব্যথা অনুভব করলাম। আমি মানুষের মুখের দিকে তাকালাম। এদের কাউকেই চিনতে পারলাম না।

"এটা কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া?" আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমরা ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। মৃতদেহটা আমি দেখতে পেলাম, ছোট। তারা এটাকে সোজা পানিতে নিয়ে যাচ্ছে।

"তারা তাকে পোড়াচ্ছে না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম কেন। এটা একটা শিশু। আমি লাশটার কাছে গিয়ে মুখ থেকে কাপড় সরালাম। এটা একটা ছোট ছেলে। সানগ্লাস পরা।

"তাকে কে মেরেছে?" আমি চিৎকার করে বলতে চাইলাম কিন্তু আমার মুখ থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না...

বাতি নিভাতে ভুলে যাওয়া আমার বেডরুমের সাদা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে করতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন তিনটা বাজে। এটা একটা দুঃস্বপ্ন, আমি নিজেকে বললাম।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম, কিন্তু ঘুমুতে পারছি না।

রাঘবের কথা আমার মাথায় এল। ছেলেটা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। তার পত্রিকা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। একটা চাকরি পাওয়া তার জন্য খুব কষ্টের হবে, কমপক্ষে বারানশিতে। আর সে যেখানেই যাক, শুকলার লোকেরা তার ক্ষতি চাইলেই করতে পারবে।

আমি আরতির কথা ভাবলাম–আমার আরতি–আমার বেঁচে থাকার কারণ। হয়তো সামনের সপ্তাহে তার সাথে এঙ্গেজমেন্ট হবে, তিন মাসের মধ্যে বিয়ে হবে। এক বছরে, আমি হয়তো এমএলএ হব। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মুহূর্তের মধ্যেই চলে আসবে। আমি এখানে মেডিসিন, এমবিএ, কোচিং, এভিয়েশন যা খুশি চালু করতে পারি। ইন্ডিয়ার জনগন শিক্ষাবিষয়ক যা কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় তার

সবই। আমার সীমানা হবে আকাশ পর্যন্ত। আরতির ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট হবার চিন্তাও করতে হবে না, আমি তাকে একটা প্লেন কিনে দিতে পারব। আমি যদি সঠিক চাল দিতে পারি, পার্টিতে নিজের অবস্থার আরও উন্নতি করা যাবে। আমি অনেকদিন নিঃসঙ্গ থেকেছি। আমি আমার পরিবার নিয়ে ভাবতে পারব, আমার আর আরতির অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে থাকবে। তারা বড় হয়ে পারিবারিক ব্যবসা আর রাজনীতি দেখবে। এভবেই ইন্ডিয়ার জনগণ বড় হয়। আমি সত্যিই বড় হতে পারি।

কিন্তু রাঘবের কি হবে? বেঁচে থেকেও মরা কেশব আমাকে জিজ্ঞেস করল। *সেটা আমার দেখার কোন বিষয় না,* আমি তাকে বললাম। *সে যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে তার জন্য তার নিজের বোকামি দায়ী। সে যদি স্মার্ট হত তাহলে সে নিজেই বুঝতে পারত এই ফালতু সাহস দেখিয়ে কোন কিছুই করা যায় না। ২০২০ সালে এ দেশে কোন রেভুল্যুশন হবে না। ২১২০ সালেও কিছু হবে না! এটা ইন্ডিয়া, কিছুই বদলায় না এখানে। তোর নিকুচি করি, রাঘব।*

কিন্তু কেশব এখানেই থামল না। *তুই কি ধরণের রাজনীতিবিদ হবি গোপাল?*

"আমি তোর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। তুই আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছিস, যা ভাগ," আমি জোরে বলে উঠলাম, যদিও রুমে কেউই নেই। সত্যি আমি সেটা জানি।

আর আরতি? আমার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠল।

আমি তাকে ভালবাসি!

সে কি তোকে ভালবাসে?

হ্যা, আরতি আমাকে ভালবাসে। সে আমাকে ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছে। সে আমাকে তার স্বামী হিসেবে চায়, আমি মাথার ভেতরে চিৎকার করে এসব বলতে লাগলাম যতক্ষণ মাথা ব্যথা না হয়ে গেল।

কিন্তু তুই আসলে কি সেটা যদি সে জানতে পারে তখন কি তোকে সে ভালবাসবে? একটা দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর জারজ?

"আমি কঠোর পরিশ্রম করি। একজন সফল মানুষ আমি," আবারো জোরে বললাম, আমার নিজের কণ্ঠ শুনেই হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু তুই কি ভাল মানুষ?

ঘড়িতে দেখাচ্ছে পাঁচটা বাজে। বাইরে দিনের আলো ফুটতে লাগল।

আমি ক্যাম্পাসে হাঁটতে বেরোলাম। শকালের তাজা বাতাসে আমার মন কিছুটা হালকা হল। শিশিরসিক্ত ডালে বসে ছোট ছোট পাখি কিচির-মিচির করছে। টাকা, মার্সিডিজ অথবা বাংলোর ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তারা গান গাচ্ছে এর একমাত্র কারণ তারা গান গাইতে চাচ্ছে। আর এটা চমৎকার। প্রথমবারের মত ক্যাম্পাসে গাছ আর পাখি থাকাতে আমার গর্ববোধ হচ্ছে।

আমি বুঝতে পারলাম কেশব কেন আমার কাছে আসছে। একসময় আমি নিজেই

কেশব ছিলাম–মিষ্টি, নিষ্পাপ আর পৃথিবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। যখন বারেবারে জীবনের কাছ থেকে চপেটাঘাত আমার ভেতরের নিষ্পাপ 'আমি'কে লাঠিপেটা করে বিদায় করল, আমি আমার কেশবকে মেরে ফেলেছি, যেহেতু পৃথিবী মিষ্টতার কোন দাম দেয় না। তাহলে কেন আমি রাঘবকে গতকাল সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলাম না? হয়তো সেই কেশব পুরোপুরি মরে যায় নি, নিজেকে বললাম আমি। হয়তো সেই নিষ্পাপ, আমাদের ভাল অংশ কখনোই মরে যায় না–আমরা কিছু সময়ের জন্য এটাকে মাড়িয়ে সামনে এগোতে চাই।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আশা করলাম সেখান থেকে কোন দিক-নির্দেশনা পাব–ঈশ্বর, মা অথবা বাবার কাছ থেকে। আমার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতেই থাকল। আমি নিঃসঙ্কোচে ফোঁপাতে থাকলাম। একটা গাছের নিচে বসে কাঁদলাম প্রায় একঘণ্টা বা এরকম কিছু সময়।

কখনো কখনো জীবন মানে আপনি কি করতে চান তা না, আপনার কি করা দরকার সেটা।

শুকলাজি জেলের বারান্দায় বসে আপেল খাচ্ছে। একজন পাহারাদার তার পাশে বসে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে পিস করে দিচ্ছে।

"গোপাল, ছেলে আমার, এসো, এসো," শুকলাজি বলল। সে একটা ধবধবে সাদা কুর্তা-পাজামা পরেছে যেটা সকালের আলোতে ঝকমক করছে।

আমি ফ্লোরে বসলাম। "একটা ছোট সাহায্য দরকার ছিল," বললাম তাকে।

"অবশ্যই," সে বলল।

আমি পাহারাদারের দিকে তাকালাম। "ওহ, সে। সে ধীরাজ, আমার গ্রামের এলাকার। ধীরাজ, আমার ছেলের সাথে একটু কথা বলতে হবে।"

পাহারাদার চলে গেল।

"তাকে আমি বলেছি আমি তাকে পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিব," বলে শুকলাজি হাসলো।

"আমি আপনার কাছে একটা অদ্ভূত আবেদন নিয়ে এসেছি," আমি বললাম।

"সব ঠিক আছে তো?"

"শুকলাজি, আপনি কি আমাকে কিছু...মেয়ে জোগার করে দিতে পারবেন? আপনি অনেকদিন আগে এসবের কথা বলেছিলেন।"

শুকলাজি এত জোরে হাসলো যে তার মুখ থেকে আপেলের রস বের হয়ে গেল।

"আমি সিরিয়াস," বললাম তাকে।

"আমার ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে। তো তোমার রমণী দরকার?"

"আমার জন্য না।"

শুকলাজি আমার হাঁটুতে চাপড় দিল আর চক্রান্তের ভঙ্গিতে চোখ টিপল। "অবশ্যই না। বল, তোমার বয়স কত হয়েছে?"

"সামনের সপ্তাহে চব্বিশ হবে," আমি বললাম।

"ওহ্, তোমার জন্মদিন সামনে?"

"হ্যা, নভেম্বরের এগার তারিখে," বললাম আমি।

"তাহলে তো চমৎকার। তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন লজ্জার কিছু নেই," সে বলল, "আমরা সবাই এসব করি।"

"স্যার, এটা একজন পরিদর্শকের জন্য। সামনের সপ্তাহে একটা পরিদর্শন আছে," আমি বললাম। "আমি আমার ফি বাড়াতে চাই। আর তারা এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে।"

সে ভ্রু তুলল। "এনভেলাপে কাজ হবে না?"

"এই পরিদর্শক রমণীদের পছন্দ করে। আমি কানপুরের আরেক প্রাইভেট কলেজ থেকে খবর পেয়েছি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে," শুকলাজি বলল। সে তার পাজামার একটা গোপন পকেট থেকে সেলফোন বের করে আমাকে একটা নাম্বার দিল।

"ওর নাম বিনোদ। ওকে কল করে আমার কথা বলবে। তোমার যেরকম দরকার তাকে বলবে। সে ব্যবস্থা করে দেবে। তোমার কখন দরকার?"

"আমি এখনো দিন নির্দিষ্ট করি নি," বলে দাঁড়াতে লাগলাম।

"দাঁড়াও," শুকলাজি আমার হাত ধরে টেনে আমাকে আবার বসাল। "তুমিও তাদের উপভোগ করবে। বিয়ের পরে এসব করা কঠিন। বিয়ের আগেই আনন্দ নিয়ে নাও।"

আমি অন্যমনস্কভাবে হাসলাম।

"ডিএম-এর মেয়ের সাথে কেমন চলছে?"

"ভাল," আমি বললাম। আমি এ বিষয়ে যত কম বলা সম্ভব বলতে চাইছি।

"তুমি তার বাবা-মায়ের সাথে সরাসরি কথা বলবে? নাকি ভালবাসা এইসব হাবিজাবি বলবে তাকে?"

"আমি এখনো ভাবি নি," বললাম তাকে। "আমাকে যেতে হবে শুকলাজি। একাউন্টস্-এর একটা মিটিং আছে আজ।"

শুকলাজি বুঝতে পারল আমি কথা বলতে আগ্রহী না। সে আমাকে জেলের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

"জীবন হয়তো তোমাকে একই সুযোগ দ্বিতীয়বার দিবে না," সে বিদায়কালে বলল।

লোহার দরজা আমাদের দু'জনের মধ্যে ঢং ঢং শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

অধ্যায় ৩৮

ক্যালেন্ডার দেখাচ্ছে আজ নভেম্বরের দশ তারিখ–আমার তেইশ বছর বয়সের শেষ দিন। আমি সকালটা আমার ডেস্কেই কাটালাম। স্টুডেন্টদের প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করতে এল। তারা কলেজে একটা অনুষ্ঠান করতে চায়। তারা স্পন্সর পেয়েছে এটা শুনে আমি তাদের অনুমতি দিলাম। স্টুডেন্টদের সাথে মিটিংয়ের পরে আমাকে একটা সঙ্কট মোকাবেলা করতে হল। দুটো ক্লাসরুমের দেয়াল দিয়ে পানি বেয়ে পড়ছে। কন্ট্রাকটের সাথে ঘণ্টাখানেক চিৎকার চেঁচামেচি করলে সে ওগুলো মেরামত করতে লোক পাঠাল।

দুপুরে বাসা থেকে আমার লাঞ্চ-বক্স এল। আমি ঢেঁড়স, ডাল আর রুটি খেলাম। খেতেখেতেই আমি আরতিকে কল করলাম। সে ফোন ধরল না। লাঞ্চের পরে একটার পর একটা মিটিং লেগেই আছে। তাই পরে তাকে কল করা যাবে না। আমি তার নাম্বারে আবারো কল করলাম।

"হ্যালো," অপরিচিত এক মেয়ের গলা শোনা গেল।

"কে বলছেন?" আমি বললাম।

"আমি বেলা, আরতির কলিগ। আপনি গোপাল, তাই না? আমি ফোনে আপনার নাম দেখেছি," সে বলল।

"হ্যা, সে কি এখানে আছে?"

"সে একজন গেস্টকে সাহায্য করতে গিয়েছে। আমি কি তাকে আপনাকে কল করতে বলব?"

"হ্যা, দয়া করে," আমি বললাম।

"ওহ, আর অগ্রিম শুভ জন্মদিন," সে বলল।

"আপনি কিভাবে জানলেন?" আমি বললাম।

"আচ্ছা, সে আপনার উপহার বানাতে অনেক কাজ করছে...উপ্‌স!"

"কি হল?"

"হয়তো এটা আপনাকে বলা ঠিক হয় নি," বেলা বলল। "আসলে এটা একটা সারপ্রাইজ। সে আপনার জন্মদিনের উপহার বানাচ্ছে। এটা খুবই চমৎকার। সে একটা কেকও অর্ডার...শুনুন, সে যদি জানতে পায় আমি এসব বলেছি তাহলে আমাকে মেরেই ফেলবে।"

"সমস্যা নেই। আমি তাকে কিছুই বলব না। কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন, আমিও তার জন্য কোন প্ল্যান তৈরি করে রাখতে পারি।"

"আপনাদের সম্পর্ক আসলে চমৎকার। ছোটবেলার বন্ধু, তাই না?" সে বলল।

"হ্যা, তো তার প্ল্যান কি?"

"আচ্ছা, সে আপনাকে বলবে যে সে জন্মদিনে আপনার সাথে দেখা করতে পারবে না। আপনি মুখ গোমড়া করে থাকবেন, সে বলবে তার কাজ আছে। কিন্তু কাজের শেষে বিকেলে সে আপনার বাসায় কেক আর উপহার নিয়ে আসবে।"

"খুব ভাল হল যে আপনি আমাকে বললেন। আমি ঐসময় বাড়িতেই থাকব, কোন মিটিং রাখব না।"

"আপনি জন্মদিনেও কাজ করেন?" সে বলল।

"আমি সবসময় কাজ করি," বললাম তাকে। "সে কি চলে এসেছে?"

"এখনও আসে নি। আমি তাকে বলব আপনাকে যেন কল করে," সে বলল। "কিন্তু কিছু বলবেন না। অভিনয় করবেন যেন কিছুই জানেন না।"

"ঠিক আছে," বলে আমি কল শেষ করলাম।

এটাই সময়। আমি বিনোদকে কল করলাম।

"বিনোদ?" আমি বললাম।

"কে বলছেন?"

"আমি গোপাল। এমএলএ শুকলার সাথে কাজ করি।"

"ওহ্, তো বলুন?" সে বলল।

"আমার মেয়ে দরকার।"

সে কল কেটে দিল। আমি তাকে আবার কল করলেও সে ধরল না। আমি আমার ফোন একপাশে সরিয়ে রাখলাম।

দশ মিনিট পরে একটা অপরিচিত ল্যান্ডলাইন নাম্বার থেকে আমি একটা কল পেলাম।

"বিনোদ বলছি। আপনি মেয়ে চেয়েছিলেন?"

"হ্যা," আমি বললাম।

"সারারাত নাকি ঘণ্টা-চুক্তি?"

"হাহ?" আমি বললাম। "বিকেল। এক বিকেল।"

"আমাদের হ্যাপি-আওয়ার রেট আছে বিকেলের জন্য। কয়জন দরকার?"

"একজন?" আমি সন্দিহান হয়ে বললাম।

"দু'জন নিন। রেট কম নেব। দ্বিতীয়জনের জন্য অর্ধেক রেট।"

"একজনই যথেষ্ট।"

"আমি দুজন পাঠাব। দুজন লাগলে রেখে দিবেন। নয়তো একজন বেছে নিবেন।"

"ঠিক আছে। কত?"

"কি ধরণের মেয়ে চান?"

আমি জানি না তার কাছে কি ধরণের মেয়ে আছে। আমি আগে কখনো মেয়ে

'অর্ডার' করি নি। তার কাছে কি মেন্যু আছে? "একজন সুন্দরী?" সম্পূর্ণ আনাড়িদের মত বললাম।

"ইংরেজিতে কথা বলতে লাগবে? জিন্স পরে এরকম?" সে অফার করল।

"হ্যা," আমি বললাম।

"ইন্ডিয়ান, নেপালি নাকি সাদা চামড়ার?" সে বলল। বারানশি অবশ্য নেপাল বর্ডার থেকে তত দূরে না।

"সাদা চামড়ার মেয়েও আছে আপনার কাছে?"

"এটা একটা টুরিস্ট শহর। কিছু মেয়ে এখানেই কাজ করতে থেকে যায়। খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু আমরা এটা করতে পারি।"

"ইন্ডিয়ান মেয়ে পাঠাবেন যারা দেখতে শোভনীয়। যারা কলেজ ক্যাম্পাসে তত দৃষ্টি আকর্ষন করবে না।"

"কলেজ?" বিনোদ অবাক হয়ে বলল। "আমরা সাধারণত হোটেলের জন্য করে থাকি।"

"এটা আমার কলেজ। কোন সমস্যা নেই।"

গঙ্গাটেক সম্পর্কে বলাতে ভিনোদ রাজি হল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম কিভাবে সে মেয়েদের ডিরেক্টরের বাংলোতে নিয়ে আসবে।

"তো আপনার কখন দরকার?"

"দুপুর দুটো থেকে সারা বিকেল, ছয়টা পর্যন্ত," আমি বললাম।

"বিশ হাজার," সে বলল।

"পাগল হয়েছেন?"

"শুকলাজি'র কথা বলাতে এটা বললাম। বিদেশীদের জন্য একজনের রেটই এটা।"

"দশ।"

"পনের।"

আমি আমার দরজায় নক শুনতে পেলাম।

"ঠিক আছে। কাল দুপুর দু-টায়। লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের গঙ্গাটেক কলেজে," আমি ফিসফিস করে বলে কল শেষ করলাম।

"ফ্যাকাল্টি মিটিং," শ্রীবাস্তব দরজা থেকে বলল।

"ওহ, অবশ্যই," আমি বললাম। "প্লিজ ভেতরে আসুন, ডিন স্যার।"

আমি আমাদের বিশজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য পিওনকে আরও চেয়ার দিতে বললাম।

"স্টুডেন্টরা বলল কাল আপনার জন্মদিন, ডিরেক্টর গোপাল," ডিন বলল। ফ্যাকাল্টিরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বস হওয়াটা আসলেই মজার। সবাই বসের সুনজরে থাকতে চায়।

"অন্য যে কোন দিনের মতই," আমি বললাম।

"স্টুডেন্টরা আপনার জন্য একটা কেক কাটতে চায়," ডিন বলল।

"প্লিজ না। আমি পারব না," বললাম আমি। দু'শ মানুষের সামনে কেক কাটার দৃশ্য কল্পনা করতেই বিব্রতবোধ করলাম।

"প্লিজ স্যার," বলল জয়ন্ত, একজন জুনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার। "স্টুডেন্টরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা তাদের জন্য একটা বড় বিষয়।"

আমি ভেবে অবাক হলাম স্টুডেন্টরা যদি বিনোদের কাছে দেয়া আমার বর্ণনা শুনতে পায় তাহলেও কি তারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে?

"তারা এর মধ্যেই দশ কেজির একটা কেক অর্ডার করে ফেলেছে, স্যার," শ্রীবাস্তব বলল।

"এটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার ব্যবস্থা করুন," আমি বললাম।

"দশ মিনিট। ক্লাসের শেষে শুরু হয়ে একটায় শেষ হয়ে যাবে," ডিন বলল।

ফ্যাকাল্টি মিটিং শুরু হল। সবাই নিজ নিজ কোর্স প্রোগ্রাম নিয়ে আমাকে সর্বশেষ খবর দিতে লাগল।

"আমাদের প্লেসমেন্টের দিকে খেয়াল করা দরকার," আমি বললাম। যদিও আমাদের প্রথম ব্যাচের বের হতে আরও দু-বছর বাকি।

"জয়ন্ত প্লেসমেন্ট সমন্বয়ক," ডিন বলল।

"স্যার, আমি ইতোমধ্যেই কর্পোরেটগুলোর সাথে মিটিং করেছি," জয়ন্ত বলল।

"তাদের কাছ থেকে কিরকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে?" বললাম তাকে।

"আমরা নতুন, তাই এটা কঠিন। কিছু এইচআর ম্যানেজার তাদের অংশ চাচ্ছে," জয়ন্ত বলল।

"ডিরেক্টর গোপাল, আপনি যেহেতু জানেন..." ডিন কথা বলা শুরু করলে আমি তাকে বাধা দিলাম।

"এইচআর ম্যানেজাররা আমাদের কলেজ থেকে নিয়োগ দিতে তাদের অংশ চাচ্ছে, ঠিক?" আমি বললাম।

"ঠিক তাই স্যার," জয়ন্ত বলল।

প্রাইভেট কলেজ চালাতে প্রতিটা কাজেই কাউকে না কাউকে ঘুষ দিতে হয়। প্লেসমেন্টের বিষয়ে এটা বাদ থাকবে কেন? কিন্তু অন্যান্য মেম্বারদের বিস্মিত হতে দেখা গেল।

"পার্সোনালি টাকা দিতে হবে?" মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রফেসর মিসেস আভাস্তি অতিকষ্টে বলল।

জয়ন্ত মাথা ঝাঁকাল।

"কিন্তু এরা তো বড়বড় কোম্পানির ম্যানেজার," সে বলল, এখনো অবাক।

"মিসেস আভাস্তি, এটা আপনার বিষয় না। আপনি বরং আপনার কোর্স,

অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স সম্পর্কে আমাকে বলুন," আমি বললাম।

বাবুর্চি তিন পদের সবজি, রুটি আর ডাল দিয়ে চমৎকার রাতের খাবারের আয়োজন করল। আমি ওসব ছুয়েও দেখলাম না। আমি বিছানায় শুয়ে আমার ফোন চেক করলাম। আরতি সারা দিনেও আমাকে কল করে নি। যাহোক, আমিও তাকে কল করলাম না।

আমি আবারো আমার প্ল্যান নিয়ে ভাবলাম।

মাঝরাতে আরতি আমাকে কল করল।

"হ্যাপি বার্থডে টু ইউ," আরতি ওপাশ থেকে গাইতে লাগল।

"হেই, আরতি," আমি বললাম কিন্তু সে যেন শুনতেই পেল না।

"হ্যাপি বার্থডে টু ইউ," সে তার সুর তারায় চড়িয়ে গাইতে থাকল, "হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, গোপাল। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আর বাচ্চা নেই," আমি বললাম।

সে তার গান গেয়েই গেল।

'Happy birthday to you. You were born in the zoo. With monkeys and elephants, who all look just like you,' সে বলল। প্রাইমারি স্কুলে এভাবে আমার জন্মদিনে গান গেয়ে উইশ করত।

এই মামুলি বিষয়টাতেই আনন্দে আমার চোখে পানি চলে এল। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি আমার প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছি।

"মানুষজন অনেক খুশি মনে হচ্ছে," আমি বললাম।

"অবশ্যই, এটা তোমার জন্মদিন। এজন্যই আমি তোমাকে সারাদিন কল বা মেসেজ করি নি।"

"ওহ," আমি বললাম।

"কি 'ওহ?' তুমি এটা খেয়ালই কর নি, করেছ?" সে বিরক্ত হওয়ার ভান করল।

"অবশ্যই, করেছি। এমনকি আমার স্টাফও অবাক হয়ে জানতে চাইল আমার ফোন সারা দিনে বেজে উঠল না কেন।"

আমি বিছানা থেকে উঠে বাতির সুইচ জ্বালিয়ে দিলাম।

"যাহোক, আমি খুব চিন্তা করলাম এ মানুষটাকে কি দিব, যার সবকিছুই আছে।"

"আর?"

"কিছুই পেলাম না।"

"ওহ, ঠিক আছে। আমার কিছুই দরকার নেই।"

"হয়তো আমরা যখন দেখা করব তখন কিছু কিনে দেব তোমাকে," সে বলল।

"আমরা কখন দেখা করছি?" বললাম আমি। যদিও বেলা আমাকে তার প্ল্যান সম্পর্কে বলেছে।

"দেখ, কাল দেখা করা একেবারেই অসম্ভব, আমার ডাবল শিফট্ কাল।"

"তুমি আমার জন্মদিনে আমার সাথে দেখা করবে না?"

"কি করব বল?" সে বলল। "ফ্রন্ট অফিস স্টাফদের অর্ধেক অনুপস্থিত। শীত আসছে আর তারা সবাই ভাইরাল জ্বরের অজুহাত দেখাচ্ছে।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। আমাকে বলতেই হবে, সে চমৎকার অভিনয় করতে পারে। আমি তাকে একরকম বিশ্বাস করে ফেলেছি।

"আবারো শুভ জন্মদিন, বাই!" সে বলল।

আমার ইনবক্সে অনেকগুলো জন্মদিনের মেসেজ উঁকি দিচ্ছে। এগুলো বিভিন্ন কন্ট্রাক্টর, পরিদর্শক সরকারি কর্মকর্তা পাঠিয়েছে যাদের আগে বিভিন্ন সময় খুশি করেছি। এছাড়া একমাত্র ব্যক্তিগত মেসেজ এসেছে শুকলাজি'র কাছ থেকে। সে আমাকে কল করল।

"তুমি হাজার বছর বেঁচে থাক, বাবা," বলল সে।

"ধন্যবাদ, আপনার মনে আছে?"

"তুমি আমার ছেলের মত," সে বলল।

"ধন্যবাদ শুকলাজি, আর শুভ রাত্রি," আমি বললাম।

আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম। সামনের বিশাল দিনটির আগে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করলাম।

•

অধ্যায় ৩৯

"যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে," দশম ছাত্রটা আমাকে কেক খাইয়ে দিতে থাকলে আমি বললাম।

আমরা মেইন ক্যাম্পাস বিল্ডিংয়ের ফয়ারে একত্রিত হয়েছি। স্টাফ আর স্টুডেন্টরা আমাকে উইশ করতে এসেছে। ফ্যাকাল্টি আমাকে উপহার হিসেবে একটা টি-সেট দিল। স্টুডেন্টরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইল।

"স্যার আমরা আশা করছি আপনা আগামি জন্মদিনে ক্যাম্পাসে মিসেস ডিরেক্টরও থাকবে," সুরেস, একটা শুকনা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে সবার সামনে ঘোষণা করল। যাতে সবাই জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। আমি হেসে ঘড়ির দিকে তাকালাম। দু'টা বাজে। সবাইকে হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানালাম আমি।

বাড়িতে যেতে মেইনবিল্ডিং থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

"শুভ জন্মদিন!" আরতির মেসেজ এল।

"তুমি কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ডাবল শিফট্ শুরু হল " সে তার প্রতিক্রিয়া জানাল।

বিনোদ আমাকে দু-টা পনের মিনিটে কল করলে আমার হৃদপিন্ড জোরে লাফাতে শুরু করল।

"হাই," আমি নার্ভাস কণ্ঠে বললাম।

"মেয়েরা একটা সাদা টাটা ইন্ডিকা গাড়িতে আসছে। তারা হাইওয়েতে আছে এখন, পাঁচ মিনিটে ক্যাম্পাসে চলে আসবে।"

"গেটে বলে রাখব," বললাম তাকে।

"আপনি কি ক্যাশ পে করবেন?"

"হ্যা, কেন, আপনারা কি ক্রেডিট কার্ডও নেন?"

"হ্যা, টুরিস্টদের জন্য। কিন্তু ক্যাশই ভালো," বিনোদ বলল।

আমি আমার কাজের লোকদের তাদের কোয়ার্টারে যেতে বললাম আর আগামি চার ঘণ্টা যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে। গার্ড পোস্টে কল করে সাদা ইন্ডিকাকে ভেতরে আসতে দিতে বললাম। অন্য কেউ আমার সাথে দেখা করতে এলেও আমি তা জানাতে বললাম।

খুব তাড়াতাড়ি বেল বেজে উঠল। সামনের দরজা খুলে গা ছমছমে একজন লোক দেখতে পেলাম। তার পেছনে দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মেয়ে সস্তা চিতাবাঘের ছবি আঁকা নাইলনের টপ আর জিন্স পরে আছে। আরেকজন বেগুনী পাড়ের কার্ডিগান আর বাদামি প্যান্ট পরেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি এরা

ওয়েস্টার্ন পোশাক পরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। হয়তো এটা তাদের বেশি টাকা কামাতে সাহায্য করে।

গা ছমছমে লোকটা উজ্জ্বল নীল শার্ট আর শাদা ট্রাউজার পরেছে।

"এদের চলবে?" লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমি মেয়েদের মুখের দিকে তাকালাম। বিকেলের শুরু হিসেবে তাদের মুখের মেক-আপ অতিরিক্ত বলা যায়। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।

"চলবে," আমি বললাম।

"পেমেন্ট?"

টাকা আমি পকেটে আগেই রেখে দিয়েছি। একটা নোটের বান্ডিল তাকে দিলাম।

"আমি গাড়িতে অপেক্ষা করব," সে বলল।

"ক্যাম্পাসের বাইরে, দয়া করে," বললাম তাকে। লোকটা চলে গেল। আমি মেয়েদুটোকে আমাকে অনুসরণ করতে ইশারা করলাম। ভেতরে এসে সোফায় বসলাম আমরা।

"আমি রশ্মি। ক্লায়েন্ট কি আপনি?" চিতাবাঘের পোশাক পরা মেয়েটা জিজ্ঞেস করল। দুজনের মধ্যে তাকেই বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হল।

"হ্যা।"

"আমাদের দুজনের জন্যই?" রশ্মি বলল।

"হ্যা," বললাম আমি।

রশ্মি আমার ঘাড়ে চাপ দিল।

"শক্তিশালী লোক," সে বলল।

"তার নাম কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পূজা," উৎকট বেগুনী পাড়ের মেয়েটা বলল।

"তোমাদের আসল নাম না, ঠিক?"

রশ্মি আর পূজা, অথবা এ নাম ধারণ করা মেয়েরা হেসে ফেলল।

"এটা ঠিক আছে," আমি বললাম।

রশ্মি এদিক-ওদিক তাকাল। "আমরা ওটা কোথায় করব?"

"উপরতলায়, বেডরুমে," আমি বললাম।

"তাহলে চলুন," রশ্মি বলল, কাজের ব্যাপরে খুবই আগ্রহী।

"তাড়াহুড়ার কি আছে?" বললাম আমি।

পূজা দুজনের মধ্যে কম কথা বলে কিন্তু পরবর্তি আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তার মুখে একটা স্থির হাসি ধরে রাখল।

"অপেক্ষা করার কি দরকার?" রশ্মি বলল।

"আমি সারা বিকেলের জন্য টাকা দিয়েছি। সময় হলে তখন আমরা উপরে যাব," আমি বললাম।

"ততক্ষণ আমরা কি করব?" রশ্মি বলল, কিঞ্চিত আক্রমণাত্মক সুরে।

"বসে থাক," আমি বললাম।

"আমরা কি টিভি দেখতে পারি?" পূজা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। সে স্ক্রিনের দিকে দেখাল। আমি তাদের হাতে রিমোট দিলাম। তারা একটা লোকাল ক্যাবল চ্যানেল দেখতে লাগল যেখানে সালমান খানের *ম্যায়নে পেয়ার কিয়া* দেখাচ্ছে। আমরা চুপচাপ বসে টিভি দেখতে লাগলাম। নায়িকা নায়ককে বলছে বন্ধুত্বে 'কোন সরি, বা কোন ধন্যবাদ নেই,' এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে কে জানে? কিছুক্ষণ পরে নায়িকা গানে ফেটে পড়ল, একটা পায়রাকে বলছে তার নায়কের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যেতে। রশ্মি গানের সাথে গুনগুন করতে লাগল।

"কোন গান হবে না, প্লিজ," আমি বললাম।

রশ্মিকে আহত মনে হল। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তাকে তার গানের দক্ষতার জন্য ভাড়া করি নি।

"আমরা কি এখানেই বসে থাকব?" রশ্মি তিনটা ত্রিশ মিনিটে বলল।

"এটাতো ভালই *দিদি*," পূজা বলল, সে নিশ্চয়ই সালমানকে অনেক পছন্দ করে। আমি বিস্মিত হলাম সহকর্মীকে পূজার বোন বলাতে, কিছুক্ষণ পরে তারা কি করবে তা ভেবে।

চারটায় মুভি শেষ হয়ে গেল।

"এখন কি করব?" রশ্মি বলল।

"চ্যানেল পাল্টে দাও," আমি প্রস্তাব দিলাম।

সাড়ে চারটায় ল্যান্ডলাইন বেজে উঠল। আমি ফোন ধরার জন্য দৌড়ে গেলাম।

"স্যার, সিকিউরিটি গেট থেকে রাজু বলছি। একজন ম্যাডাম আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে," সে বলল।

"তার নাম কি?" আমি বললাম।

"সে কিছুই বলছে না, স্যার। তার হাতে কিছু প্যাকেট আছে।"

"তাকে দুমিনিট পরে পাঠাও," আমি বললাম। হিসেব করে নিলাম তার এখানে আসতে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে।

"ঠিক আছে স্যার," সে বলল।

আমি দৌড়ে গিয়ে মেইনগেট সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। মেয়েদের দিকে ফিরলাম।

"উপরে চল।"

"কি? আপনি এখন মুডে এসেছেন?" রশ্মি হাসতে লাগল।

"এক্ষুনি!" আমি তাদের দিকে আমার আঙুল নাচালাম। "তুমিও পূজা।"

মেয়েরা লাফ দিয়ে তাদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল, আমার কথা শুনে স্তম্ভিত। আমরা তিনজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। আমরা বেডরুমে চলে এলাম, একদম বিছানায়।

"তো, এসব কিভাবে করতে হয়?" আমি বললাম।

"কি?" রশ্মি বলল। "এটাই আপনার প্রথম?"

"কথা কম কাজ বেশি," আমি বললাম। "তোমরা প্রথমে কি কর?"

রশ্মি আর পূজা দৃষ্টি বিনিময় করল, মনে মনে আমাকে নিয়ে হাসছে তারা।

"আপনার পোশাক খুলে ফেলুন," রশ্মি বলল।

আমি শার্ট খুলে ফেললাম।

"তোমরাও খুলো," আমি তাদের বললাম। তারা এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, যেহেতু আমি দরজা আধখোলা রেখে এসেছি।

"বাড়িতে কেউ নেই," আমি বললাম।

মেয়েরা তাদের কাপড় খুলে ফেলল। আমি এতটাই উদ্বিগ্ন যে এদের বিস্তারিত খেয়াল করেতে পারলাম না। রশ্মি স্পষ্টতই তুলনামূলক মজবুত কাঠামোর অধিকারিণী। পূজার দুর্বল কাঠামো দেখে মনে হয় সে অপুষ্টিতে ভুগছে।

"বিছানায় যাও," আমি আদেশ করলাম।

আমার অপ্রণয়শীলতার চেয়েও রুক্ষ সুর শুনে তারা দুজন ভয়ার্ত বিড়ালের বাচ্চার মত হামাগুড়ি দিয়ে বিছায় শুয়ে পড়ল।

"আপনি চান আমরা এটা করি?" রশ্মি বলল, পরিস্থিতি সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে সে। "লেসবিয়ান কাজকারবার?"

"দাঁড়াও," বললাম আমি। বেডরুমের জানালার কাছে গেলাম। উপরে লাল লাইটওয়ালা একটা সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি এসে বাইরে থামতে দেখলাম। আরতি বাইরে বেরিয়ে এল, সে একবার বেল বাজাল। কেউ উত্তর না দিলে সে লনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা বড় স্ক্র্যাপবুক আর রামাদা বেকারির একটা বাক্স। সে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতেই আমার চোখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যায় ৪০

"আপনি একজন অদ্ভূত খরিদ্দার," রশ্মি মন্তব্য করল।

"হিসস!" বলে আমি দুজন নগ্ন নারীর মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিলাম।

রশ্মি আমার ঘাড়ে চুমু খেতে শুরু করল আর পূজা নিচু হয়ে আমার বেল্ট খুলতে লাগল।

আমি আমার দম গুনতে শুরু করলাম। আমার পঞ্চদশ প্রশ্বাসের সময় আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এরমধ্যে মেয়েরা আমার বেল্ট দক্ষতার সাথে খুলে ফেলেছে আর আমি আমার জিন্স খুলতে চেষ্টা করছি। আমার ষাটতম নিঃশ্বাসের সময় দরজায় টোকা শুনতে পেলাম। আর পঁয়ষট্টিতম শ্বাসের সময় আমি তিনজন মেয়ের একত্রে চিৎকার শুনতে পেলাম।

"শুভ জন্ম...ওহ মাই গড!" আরতির চিৎকার রুমে প্রতিধ্বনিত হল।

রশ্মি আর পূজার ভয়ে শ্বাসরোধ হয়ে গেল যেন। তার বিছানার চাদর দিয়ে নিজেদের আবৃত করল। আমি বিছানায় বসে রইলাম, মোটামুটি বিস্মিত দেখাচ্ছে আমাকে। আরতি যেন জমে গেল। আর ভাড়া করা মেয়েরা, যারা কিনা এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে, দৌড়ে বাথরুমে চলে গেল।

"গোপাল!" আরতির কণ্ঠে অবিশ্বাসের চূড়ান্ত মাত্রা।

"আরতি," বলে আমি বিছানা থেকে নেমে এলাম। জিন্সের বোতাম লাগিয়ে শার্ট পরতে পরতে। আরতি রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি সিঁড়িতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সে জোড়ে দৌড়ে নেমে যেতে থাকল, মাঝপথে কোথাও ভারী উপহারটা ফেলে দিয়ে। আমি পড়ে যাওয়া কেকের বাক্স আর স্ক্রাপবুক ডিঙিয়ে তার কাছে গেলাম। তার কনুঁই ধরতে ধরতে সে প্রায় দরজার কাছে পৌছে গিয়েছে।

"আমার হাত ছাড়," আরতি বলল, তার মুখ খুব কম নড়ছে।

"আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে পারব আরতি," আমি বললাম।

"আমি বলছি আমাকে স্পর্শ করবে না।"

"তুমি যা ভাবছ এটা আসলে তা না," আমি বললাম।

"তাহলে এটা কি? আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে এলাম আর এভাবে আমি তোমাকে দেখলাম। কে জানে কি...আমি আমার জীবনে এরচেয়ে খারাপ আর কিচ্ছু দেখি নি, কিচ্ছু দেখি নি," বলে আরতি থামল। সে মাথা দোলাল। এটা আসলে ভাষার উর্ধ্বে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

"এমএলএ শুকলা ওদের পাঠিয়েছে, জন্মদিনের উপহার হিসেবে," আমি

বললাম।

সে আবার আমার দিকে তাকাল, এখনো মাথা দোলাচ্ছে, যেন সে এইমাত্র যা দেখেছে বা শুনেছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

"এখানে এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বড়লোকেরা এসব করেই," আমি বললাম।

ঠাস!

সে আমার গালে চড় মেরেছে। চড়ের চেয়েও তার চোখে যে হতাশার ছায়া দেখতে পেলাম তা আমাকে বেশি কষ্ট দিল।

"আরতি, কি করছ তুমি এসব?" আমি বললাম।

সে কিছুই বলল না, শুধুমাত্র আমাকে আবার চড় দিল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার হাত আমার গালে চলে গেল। তিন সেকেন্ডের মধ্যেই বাড়ির বাইরে চলে গেল সে। দশ সেকেন্ডে আমি তার গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ শুনতে পেলাম। পনের সেকেন্ডের মধ্যে তার গাড়ি আমার গাড়িবারান্দা থেকে চলে গেল।

পূজা আর রশ্মি একজন একজন করে নিচে নেমে এল, এখন সম্পূর্ণ পোশাক-সজ্জিত। পূজা সিঁড়ির উপর থেকে কেকের বাক্স আর স্ক্র্যাপবুক তুলে নিয়ে সেগুলো আমার সামনের টেবিলে রাখল।

"আপনি আমাদের সাথে কিছুই করলেন না, তো তৃতীয় মেয়ে ডাকলেন কি জন্য?" রশ্মি জানতে চাইল।

"এক্ষুনি চলে যাও," আমি তাদের বললাম, আমার কণ্ঠ দুর্বল।

তারা তাদের গা ছমছমে রক্ষক লোকটাকে ডাকল। এক মিনিটের মধ্যেই আমি র বাড়িতে একা হয়ে গেলাম।

ঠিক এখানেই বসে রইলাম পরবর্তি দুই ঘণ্টা, যতক্ষণ বাইরে আধার ঘনিয়ে না এল। কাজের লোকেরা ফিরে এসে বাতি জ্বালাল। তারা আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও বিরক্ত করল না।

স্ক্র্যাপবুকের কভারের চুমকি আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠল। আমি ওটা তুলে নিলাম।

"একটা দুষ্ট ছেলে আর একটা তত দুষ্ট না মেয়ের গল্প," কালো কভারে লিখা, যেটা সাদা কালিতে হাতে লিখা হয়েছে। এখানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের হাসিমুখ আঁকা। তাদের দুজনই চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে আছে।

আমি স্ক্রাপবুকটা খুললাম।

"একদা কোন এক সময় একটা দুষ্ট ছেলে একটা লক্ষ্মী মেয়ের কেক চুরি করল," প্রথম পাতায় লিখা। এখানে একটা হিজিবিজি ছবি আঁকা আছে যেখানে আমার টিচার বকা দিচ্ছে আর সে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে পানি।

আমি পাতা উল্টালাম।

"দুষ্ট ছেলেটি, যাহোক, লক্ষ্মী মেয়েটির বন্ধু হয়ে গেল। সে এরপর থেকে মেয়েটির প্রতিটা জন্মদিনে এল," সেখানে লেখা। বাকি অ্যালবামে দশ থেকে ষোল

বছর পর্যন্ত তার সাতটা জন্মদিনের ছবি দেয়া আছে যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম কিভাবে একেকটা বছরের মধ্য দিয়ে আমি আর সে বেড়ে উঠেছি। তার প্রতিটা জন্মদিনের পার্টিতে শুধুমাত্র তার আর আমার কমপক্ষে একটি ছবি আছে।

এছাড়াও, আরতি খুব যত্ন করে স্কুলের ছোটছোট স্মরণিকা যুক্ত করেছে। যার মধ্যে ক্লাস সেভেনের রুটিন আছে, যেখানে সে গণিত ক্লাসের উপরে শিং এঁকে রেখেছিল। স্কুলের অনুষ্ঠানের টিকেট আছে যখন আমরা ক্লাস টেনে পরতাম তখনকার। ক্লাস টেন থেকে যখন আমরা বাইরে যেতে শুরু করি তখন রেস্টুরেন্টের বিল সে দিত। সে তার নিজের বই থেকে একটা পাতা ছিড়ে ফেলেছিল ক্লাস এইটে, যেখানে সে আমার নাম তার বেস্টফ্রেন্ড হিসেবে লিখেছিল। সে তার স্ক্রাপবুক এই কথাগুলো লিখে শেষ করল:

"আমার এতদিনের জীবন তোমাকে সাথে নিয়ে যেন একটা চমৎকার ভ্রমণ। তোমার সাথে ভবিষ্যতের সোনালী দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি আমি–আমার আত্মার বন্ধু। শুভ জন্মদিন, গোপাল!"

আমি শেষে পৌছে গিয়েছি। শেষের কভারে সে ক্যালিগ্রাফি করে বড় অক্ষরে "G&A" লিখেছে।

আমি তাকে কল করতে চাইলাম, আমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তাকে বলতে চাইলাম তার উপহার আমার কাছে কতটা অভূতপূর্ব লেগেছে। সে নিশ্চয়ই কয়েক সপ্তাহে এটা তৈরি করেছে...

আমি কেকের বাক্সটা খুললাম।

চকলেট কেকটা কয়েক জায়গায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি লেখাগুলো পড়তে পারলাম।

"টুরি : প্রথমে আমার কেক পরে আমার হৃদয়," এটার উপরে সাদা, মিষ্টি ক্রিম দিয়ে লেখা : 'শুভ জন্মদিন গোপাল।'

আমি কেকের বাক্সটা দূরে সরিয়ে রাখলাম। ঘড়িতে দেখাল বারোটা বাজে।

"তোর জন্মদিন শেষ, গোপাল," আমি রুমের একমাত্র লোককে চিৎকার করে শোনালাম।

যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমি করব না, পরদিনই আরতিকে কল করলাম। কিন্তু সে ফোন ধরল না।

আমি সারা সপ্তাহে অনেকবার চেষ্টা করলাম, সে উত্তর দিল না।

একবার দুর্ঘটনাবশত সে ধরে ফেলল।

"কেমন আছ তুমি?" আমি বললাম।

"প্লিজ, আমাকে কল কোরো না," সে বলল।

"আমি সে চেষ্টাই করছি," বললাম তাকে।

"আরও বেশি চেষ্টা কর," বলে সে ফোন রেখে দিল।

আমি মিথ্যে কথা বলি নি। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি তাকে ভুলে থাকার

জন্য। কিন্তু আমার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য কিছু কাজ বাকি আছে।

আমি অশোককে ফোন দিলাম, *দৈনিকের* সম্পাদক।

"মিঃ গোপাল মিশ্রা?" সে বলল।

"পত্রিকা কেমন চলছে?" আমি বললাম।

"ভাল, আমাদের সাথে আপনার অনেক বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি। তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"আমার একটা সাহায্য দরকার," সম্পাদককে বললাম।

"কি?" সম্পাদক বলল, ভেবেছে আমি তাকে কিছু প্রকাশ করতে বাধা দিব কিনা।

"আমি চাই আপনারা একজনকে নিয়োগ দেবেন," আমি বললাম। "আর সে যথেষ্ট ভাল।"

"কে?"

"রাঘব কাশ্যপ।"

"যে ট্রেইনিকে আমরা বরখাস্ত করেছিলাম?" সম্পাদক বলল। "আপনার এমএলএ শুকলা তাকে ছাটাই করতে বাধ্য করেছে।"

"হ্যা, তাকে আবার নিয়োগ দিন।"

"কেন? সে তার নিজের পত্রিকা চালু করেছে। দিমনাপুরা প্ল্যান্ট দুর্নীতি নিয়ে খবর ছেপেছে। দুঃখিত, আমাদের তা প্রকাশ করতে হয়েছে, সবাই করছে।"

"এটা কোন সমস্যা না," আমি বললাম। "আপনারা কি তাকে আবার নিয়োগ দিতে পারবেন? আমার নাম অবশ্যই গোপন থাকবে।"

সম্পাদক এটা নিয়ে ভাবল। "তা পারব। কিন্তু সে জ্বলন্ত কয়লার মত। আমি চাই না সে আবার আপনার মন খারাপের কারণ হোক।"

"তাকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখবেন। বরং, তাকে কিছুদিনের জন্য দুর্নীতি থেকেই দূরে রাখুন।"

"আমি চেষ্টা করব," সম্পাদক বলল। "সে কি জয়েন করবে? তার নিজের পত্রিকা আছে।"

"তার পত্রিকা প্রায় ধ্বংশের পথে। তার কোন চাকরিও নেই," আমি বললাম।

"ঠিক আছে আমি তাকে ডাকব," সম্পাদক বলল।

"আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম। আগামি সপ্তাহে গঙ্গাটেকের জন্য প্রথম পাতা বরাদ্দ করে রাখবেন।"

"ধন্যবাদ, আমি মার্কেটিংকে বলে দিব।"

আমার জন্মদিনের পরে বেদি আমার অফিসে দুজন কন্সাল্টেন্ট নিয়ে এল। তারা আমার জন্য ব্যাচেলর অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ কোর্স চালু করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। ডিন

শ্রীবাস্তবও এল।

"এমবিএ'র চাহিদা অনেক। কিন্তু সেটা গ্র্যাজুয়েশনের পরে। আগে থেকেই কিছু অফার করাটা খারাপ কি?" বেদি বলল। কন্সাল্টেন্টরা আমাকে তাদের ল্যাপটপে একটা প্রেজেন্টেশন দেখাল। স্লাইডগুলোতে বিনিয়োগ-লাভ বিশেষণ, নির্ধারিত ফি আর ফ্যাকাল্টিদের পেছনে খরচের তুলনা তুলে ধরা হয়েছে।

"বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ (বিএমএস) সবচাইতে ভাল। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতই ফি করতে পারবেন, কিন্তু ল্যাব বা এসব সুযোগ-সুবিধার দরকার হবে না," একজন কন্সাল্টেন্ট বলল।

"ফ্যাকাল্টি আরও সহজ। এমকম অথবা সিএ ধরণের কাউকে নিলেই হবে, তাদের অভাব নেই," অন্যজন বলল।

আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে বসে রইলাম। আমার আর প্রসারের কোন ইচ্ছে নেই। প্রতি বছর অতিরিক্ত কোটি টাকা উপার্জনের প্রতি আমার কোনই আগ্রহ নেই আর। আমার কোন অফিসে থাকতেও আর ইচ্ছে করে না।

"চমৎকার, তাই না?" বেদি বলল।

"হাহ? হ্যা, এটা আমরা অন্য কোন সময়ে করতে পারি?" আমি বললাম।

"কেন?" বেদি বলল। তারপর সে আমার গোমড়া মুখ লক্ষ্য করল।

"হ্যা, আমরা অন্য সময়ে আসতে পারি," সে রাজি হল। "তাহলে আমরা আগামি সপ্তাহে দেখা করি। অথবা যখন আপনি সময় পান।"

বেদি আর তার দলের লোকেরা রুম থেকে চলে গেল।

"ডিরেক্টর গোপাল, আপনার শরীর খারাপ?" ডিন জিজ্ঞেস করল।

"আমি ঠিক আছি," বললাম আমি।

"আমি দুঃখিত কিন্তু সারা সপ্তাহেই আপনাকে তোমন ভাল দেখা যায় নি। এটা আমার কাজ না, কিন্তু আমি আপনার থেকে বয়সে বড়। কোন বিষয়ে কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"এটা আসলে পার্সোনাল," আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

"আপনার বিয়ে করা দরকার স্যার। স্টুডেন্টরাই ঠিক বলেছে," সে মুখ টিপে হাসলো।

"আমাদের কথা শেষ?" আমি বললাম।

সংক্ষেপে হাসি শেষ করে সাথেসাথেই উঠে চলে গেল সে।

আমার সেলফোন বিপ দিল। দৈনিকের মার্কেটিং প্রধান শৈলেশের কাছ থেকে মেসেজ পেলাম :"রাঘব অফার গ্রহণ করেছে। সে কাল থেকে জয়েন করবে।"

"দারুণ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," আমি উত্তর দিলাম।

"আশা করছি আমাদের সম্পৃক্ততা আরও জোরদার হবে। রোববারের বরাদ্দের জন্য ধন্যবাদ," শৈলেশ লিখল।

অধ্যায় ৪১

কালো মার্সিডিজের আগমনে দৈনিক অফিসের গার্ডদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা গেল। একটা বড় গাড়ি মনযোগের অপেক্ষা রাখে। আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে আমার নতুন সানগ্লাস পরে লবির রিসেপশনিস্টের কাছে গেলাম।

"আমি রাঘব কাশ্যপের সাথে দেখা করতে চাই," বললাম, আমার বিজনেস কার্ড দিলাম তার হাতে।

রিসেপশনিস্ট তাকে চিহ্নিত করতে পারল না। শৈলেশ আমাকে উপরের তলা থেকে দেখতে পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে তাড়াহুড়া করে নিচে নেমে এল।

"গোপাল ভাই? আমাকে জানিয়ে আসা দরকার ছিল আপনার। এখানে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন?"

"আমি রাঘবের সাথে দেখা করতে চাই," আমি বললাম।

"ওহ অবশ্যই," সে বলল। "আমার সাথে আসুন।"

আমরা রাঘবের কেবিনের দিকে গেলাম। একজন আইটি বিশেষজ্ঞ তার ডেস্কের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে তার কম্পিউটার ঠিক করছে। রাঘব তারের সংযোগগুলো দেখার জন্য নিচু হয়ে আছে।

"তুই আবার এখানে জয়েন করেছিস?" আমি বললাম।

রাঘব ঘুরে তাকাল। "গোপাল?" বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে এসে তোকে দেখতে পেলাম।" শৈলেশের দিকে তাকালাম আমি। "আপনাকে ধন্যবাদ, শৈলেশ।"

সে চলে যাবার পরে রাঘব বলল, "ব্যাপারটা অদ্ভুত। সম্পাদক আমাকে নিজে কল করল। আমার অবশ্য কোন টাকাও ছিল না। ভাবলাম রেভুল্যুশন ২০২০ আবার বের করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা হওয়ার আগপর্যন্ত এখানে চাকরি করা যায়।"

"আমরা কি এক কাপ চা খেতে যেতে পারি?" বললাম তাকে।

"অবশ্যই," সে বলল।

আমরা তৃতীয় তলায় স্টাফ ক্যান্টিনে গেলাম। ফ্রেমে বদ্ধ পুরনো খবরের কাগজ দেয়াল দখল করে রেখেছে। ডজন ডজন সাংবাদিক তাদের রেকর্ডার আর নোটবুক নিয়ে বসে আছে, সন্ধ্যার নাস্তা উপভোগ করছে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি রাঘব নিজেকে দলছাড়া মনে করছে।

"আমি ছোট অফিসে থেকে অভ্যস্ত, দৈনিক তো বিশাল," সে বলল। দুটো প্লেটে সমুচা আর চা নিয়ে এসেছে। আমি দাম দিতে চাইলেও সে দিতে দিল না।

"নিজেকে বড় প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে হচ্ছে, তাই না?" আমি বললাম।

"শুধুমাত্র তা নয়। আমরা রেভুল্যুশন ২০২০-এ আমরা যা করেছি, এখানে কখনোই তা করা যাবে না," সে বলল।

তুই তোর পত্রিকায় যা করেছিস তা তোকে দেউলিয়া করে ছেড়েছে, বলতে চাইলাম আমি। কিন্তু আমি তাকে হেনস্তা করতে আসি নি।

"চাকরি করাটা ভাল। তাছাড়া, তুই তো সাংবাদিকতা ভালবাসিস," আমি বললাম।

"ঠিক এ কারণেই আমি এটা নিলাম। এখন থেকে ছয় মাসের একটা পরিকল্পনা।"

"মাত্র ছয় মাস?"

"তারা চায় আমি অন্যদের সংবাদ সম্পাদনা করি। এটা শুনতে পদবী হিসেবে বড় শোনায়, কিন্তু আমি রিপোর্টার থাকতে চাই। দেখা যাক কি হয়।"

"চাকরি বিল পরিশোধ করতে সাহায্য করে। তুই বিয়ে করতে চাইলে চাকরিটা সাহায্য করবে," আমি বললাম।

রাঘব হাসলো। আমরা কয়েক বছর ধরে নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলি নি। তবে আমার সুনাম নিয়ে রাঘবের কোন সংশয় নেই। আসলে এটা রাঘবের একটা বৈশিষ্ট্য। সে হয়তো বড় বড় দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য দিকে, সে মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করে।

"কে বিয়ে করতে যাচ্ছে?" রাঘব বলল, এখনো হাসছে।

"তুই আর আরতি। তোরা করছিস না?" আমি বললাম। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম এখানে হাসতে হবে।

রাঘব আমার দিকে তাকাল। আমি আরতির ব্যাপারে তার সামনে কখনো কথা বলি নি। আসলে, কয়েক বছর ধরে কোন কিছু নিয়েই তার সাথে আলোচনা করি নি।

"আমি আশা করছি আমরা বন্ধুর মত কথা বলতে পারি? আমরা একসময় ছিলাম, ঠিক?" আমি বললাম। সমুচায় একটা কামড় দিয়ে টের পেলাম এটা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত।

রাঘব এটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল। "আমার আর আরতির মধ্যে ভাল সময় যাচ্ছে না।"

"তাই নাকি?" অবাক হবার চেষ্টা করলাম আমি।

"আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে তার সাথে কথা বলি নি।"

"কি হয়েছে?" বললাম আমি।

রাঘব তার সমুচার উপরে টমেটো সস ছড়িয়ে দিল।

"এটা আমার ভুল। পত্রিকা যখন শুরু হল, তাকে আমি যথেষ্ট সময় দেই নি

তখন থেকে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। গত কয়েক মাসে তাকে খুবই বিচ্ছিন্ন দেখা যাচ্ছে।

"তোরা কি এ নিয়ে কথা বলেছিস?" আমি বললাম।

"না, আমরা কথা বলার প্ল্যান করেছিলাম, কিন্তু বলি নি," সে বলল।

"সে তোকে অনেক ভালবাসে," আমি বললাম।

"আমি জানি না," রাঘব বলল। সে না খেয়ে তার সমুচা সসের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে।

"সে বাসে। আমি তাকে ছোটবেলা থেকে চিনি রাঘব। তুই তার কাছে সবকিছু।"

রাঘবকে বিস্মিত দেখাল। "তাই?"

"সে তোকে বিয়ে করতে চায়, তাই না?"

"ভুল সময়ে। আমাকে দেখ, আমার কোন ক্যারিয়ার আছে, না কোন সম্মান আছে?" রাঘব বলল।

"তোর ক্যারিয়ার অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। মানুষকে সাহায্যের দিক দিয়ে, তুই যথেষ্ট ভাল করছিস।"

"আমি হয়তো একটু বেশি বেশি করেছি," রাঘব বলল।

"তুই ঠিক আছিস। তুই একটা বড় পত্রিকার উপ-সম্পাদক। আর আরতিকে বিয়ে করলে তুই আরও উপরে যেতে পারবি।"

"তুই কি বলতে চাচ্ছিস?"

"তুই জানিস আরতির পরিবারের উপরে রাজনীতি করার চাপ আসছে?" আমি বললাম।

রাঘব চুপ করে থাকল।

"তুই জানিস, তাই না?"

"আমি শুনেছি," সে বিড়বিড় করে বলল।

"তো, আরতির বাবা করতে পারবে না, আর আরতি করবে না। হয়তো মেয়ের জামাই?"

রাঘব উপরে তাকাল, কৌতুহলোদ্দীপ্ত। "কিভাবে ভাবছিস, দোস্ত!"

আমি চোখ রগড়ালাম। "আমি তত স্মার্ট না। তাই আমাকে এভাবে ভাবতে হয়।"

"তুই স্মার্ট না?" সে বলল।

"তুই তাকে ভালবাসিস?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের মধ্যে সবকিছু ভাল যাচ্ছে না," সে স্বীকার করল।

"আমি নিশ্চিত তোরা এসব ঠিক করে ফেলতে পারবি। শত হোক, প্রথম বারেই তোর আকর্ষণ তার উপর কাজ করেছে।"

রাঘব একটা লজ্জিত হাসি দিল।

"তাকে কল করিস না। তার হোটেলে গিয়ে দেখা কর। তার জন্য একদিন পুরো ছুটি নে। এটাই সে চায়, তোর সময় আর মনযোগ। সে তোর ভালবাসার দশগুণ তোকে ফিরিয়ে দিবে," আমি বললাম অন্য দিকে তাকিয়ে।

রাঘব চুপ করে থাকল।

"প্রতিজ্ঞা করে বল তুই যাবি," আমি বলে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

সে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে মাথা নাড়ল। আমি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমি শুকলাজি'র কথা পুণরাবৃত্তি করলাম।

"জীবন তোকে একই সুযোগ দু-বার না-ও দিতে পারে।"

রাঘব আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। যদিও সে গাড়ি লক্ষ্য করল বলে মনে হল না।

"তুই আমার জন্য এসব কেন করছিস?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি গাড়িতে উঠে বসে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। "আরতি আমার ছোটবেলার বন্ধু। তাছাড়া..."

"তাছাড়া কি?" রাঘব বলল।

"সবারই তাদের নিজ নিজ কাজটুকু করা উচিৎ," বলতেই আমার ড্রাইভার আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এল।

এরপর থেকে রাঘবের সাথে আর যোগাযোগ রাখলাম না। সে অনেকবার কল করেছে। আমি হয়তো ধরলাম না অথবা ধরেও ব্যস্ততার ভান করলাম। তারমধ্যে একবার ধরলে রাঘব বলল সে আর আরতি আবার কথা বলা শুরু করেছে। আমি তাকে আমার অফিসে পরিদর্শক আছে বলে রেখে দিলাম।

আমি বাবার আত্মার উপর শপথ করেছি আমি আরতিকে আর কল করব না। সেও করল না, শুধুমাত্র একদিন রাত দুটোয় মিসকল দেয়া ছাড়া। আমি তাকে কল করলাম, যেহেতু আমি প্রথমে কল করি নি। সে ফোন ধরল না।

ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে মিসড্ কল আর কল-ব্যাক নাটকের নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। আমি বুঝতে পারলাম সে তার দুর্বল সময়ে কলটা করেছে, তাই তাকে একা থাকতে দিলাম।

আমি বিরক্তিকর কন্সালটেন্টদের আমন্ত্রণ করলাম বিএমএস প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলার জন্য। প্ল্যান এখন যথেষ্ট ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে। আমরা বিজনেস স্টাডিজের দিকে যাওয়ার পথ শুরু করলাম এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এখন আবার নতুন কিছু সরকারি লোকজন পাওয়া গেল যাদের অনুমোদন লাগবে, অর্থাৎ নতুন কিছু হাতে তেল-মর্দন করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম ব্যবসা লাভজনক হবে। প্রতি বছর লাখ লাখ স্টুডেন্ট ভর্তি পরীক্ষা দিবে, বাদ পড়বে, ইন্ডিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় শামুকের

ডিমের মত ঝুলতে থাকবে। আমাদের জাল প্রস্তুত রাখতে হবে তাদের ধরার জন্য।

আমি কলেজ ফ্যাকাল্টির সাথে বেশি সময় কাটাতে লাগলাম, আর মাঝেমধ্যে সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ করলাম। তারা আমার জন্য কাজ করছে, তাই আমার প্রতিটা কৌতুকে তারা হাসলো আর একটা কৌতুকে দশবার প্রশংসা করল। আমি তাদের বন্ধু বলতে পারি না, কিন্তু তারা আমার বাড়ির খালি জায়গা তো দখল করছে, সেটাই বা কম কি?

তিনমাস চলে গেল। আমার বিএমএস প্রোগ্রাম চালু করলাম আর সঠিক মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে সপ্তাহখানেকের মধ্যে সবগুলো সিট পূর্ণ করে ফেললাম। আমি ক্যাম্পাস থেকে খুব কম বের হই, আর বের হলে তা শুধুমাত্র কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকজনের সাথে দেখা করতে। এরমধ্যে শুকলাজি'র বিরুদ্ধে মামলা আরও জটিল হয়ে উঠল। সে আমাকে বলল ট্রায়াল চলতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। সে জামিনের জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু আদালত তা নামঞ্জুর করল। শুকালাজি'র মনে হল সিএম তার সাথে প্রতারণা করেছে, যদিও পার্টি তাকে প্রস্তাব দিয়েছে সে রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এলে তাকে জেল থেকে বের করতে পারবে তারা। আমি প্রতি মাসে তার সাথে দেখা করতে যাই গঙ্গাটেক ট্রাস্ট একাউন্টের একটা কপি সাথে নিয়ে।

একদিন রাঘব আমাকে কল করল, তখন আমি বাড়িতে। আমি ফোন ধরলাম না। রাঘব কল করতেই থাকল। আমি ফোন সাইলেন্ট করে একপাশে রেখে দিলাম।

সে আমাকে মেসেজ পাঠাল : "তুই কোথায় গোপাল, তোর সাথে কথা আছে।"

আমি প্রথমে রিপ্লাই করলাম না। অবাক হয়ে ভাবলাম তার এই প্রচেষ্টার অন্য কোন কারণ আছে কিনা, সে কি আবার কোন দুর্নীতির গন্ধ পেয়েছে?

আমি লিখলাম: "মিটিংয়ে। কি হয়েছে?"

তার রিপ্লাই আমাকে যেন একটা চলন্ত ট্রেনের মত ধাক্কা দিল।

"আরতি আর আমি এঙ্গেজড্ হচ্ছি। আগামি শনিবারের পার্টিতে তোকে দাওয়াত দিতে চাইছি।"

আমি মেসেজটার দিকে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করতে পারলাম না। আমি চেয়েছি এটাই যেন হয়। কিন্তু এটা আমাকে জাহান্নামের কষ্ট দিচ্ছে।

"দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি শহরে নেই। কিন্তু অভিনন্দন!!!" আমি আমার কথা লিখে পাঠালাম, ভেবে অবাক হলাম একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন আমি এতবার দিয়েছি কেন।

রাঘব আমাকে আবার কল করল। আমি তার কল এড়িয়ে গেলাম। সে আরও দুবার চেষ্টা করল, যখন আমি শেষমেষ ফোন ধরলাম।

"তুই আমাদের এঙ্গেজমেন্টে আসবি না কেন?" সে বলল।

"হেই, আমি একটা ফ্যাকাল্টি মিটিংয়ে," বললাম তাকে।

"ওহ, সরি। শোন, তোকে আসতেই হবে," রাঘব বলল।

"আমি পারব না। আমি একটা অংশীদারি প্রকল্পের উদ্যোগ নেবার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি।"

"কি হয়েছে গোপাল? আর তুই কখনো কল ব্যাক করিস না কেন? এমনকি আরতিকে জিজ্ঞেস করলেও বলে তুই অনেক ব্যস্ত।"

"আমি খুবই দুঃখিত। অনেক ব্যস্ত। আগামি দু-বছরের মধ্যে আমাদের স্টুডেন্ট ভর্তি দ্বিগুণ করে ফেলছি," আমি বললাম।

"তুই তোর বেস্ট ফ্রেন্ডের এঙ্গেজমেন্টে থাকবি না? সে মন খারাপ করবে না?"

"আমার পক্ষ থেকে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস," আমি বললাম।

রাঘব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ঠিক আছে, আমি চাইব। কিন্তু দু-মাসের মধ্যে আমাদের বিয়ে। মার্চের এক তারিখে। তখন শহরে থাকবি।"

"অবশ্যই থাকব," বলে আমি ক্যালেন্ডারে তারিখটা দাগিয়ে রাখলাম।

"এখন তোর স্টাফদের সাথে কথা বল। ভাল থাকিস দোস্ত," রাঘব বলল।

আমি সহজাতপ্রবৃত্তিবশত আরতিকে একটা 'অভিনন্দন!' মেসেজ লিখে পাঠিয়ে দিলাম। সে রিপ্লাই দিল না।

আমি আমার বিশাল বাড়ির দিকে তাকালাম ওটা আমার হৃদয়ের মতই শূন্য।

অধ্যায় ৪২

পয়লা মার্চে আমি তাজ গঙ্গার একটা রুম বুক করলাম। পাঁচ তলার এ রুমে ছোট্ট একটা বারান্দা আছে যেখান থেকে হোটেলের পুল আর লন দেখা যায়। আমি দুদিন আগে আমার সিম খুলে ফেলেছি। স্টাফদের বলেছি আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। সারাটা দিন আমি রুমেই কাটিয়েছি। সন্ধ্যা আটটায় বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। গোধূলীর ক্ষীণ আলোতে আমি কার্ডটা আবার পড়লাম।

মিসেস এবং মিস্টার অনীল কাশ্যপ
আপনাদের আনন্দমুখর উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাচ্ছে
তাদের একমাত্র ছেলে
রাঘব
আর
আরতির বিয়েতে
(মিসেস এবং মিস্টার প্রতাপ ব্রিজ প্রধান, ডিএম-এর মেয়ে)
পয়লা মার্চ ২০২০
সন্ধ্যা আটটায়।
পুলসাইড লন,
তাজ গঙ্গা, বারানশি

আমি নিচে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি। পুরো বাগান ফুল আর বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। গেস্টরা আসা শুরু করেছে এখন। এক কোণায় ড্যান্স ফ্লোরে ডিজে বসে বসে মিউজিক টেস্ট করছে। লনের একপাশে খাবারের কাউন্টার। ছোট্ট স্টেজে বর আর কনের সুসজ্জিত চেয়ারে ছোট বাচ্চারা লাফালাফি করছে। বিয়ের আসল জায়গা, যেখানে উৎসবটা অনুষ্ঠিত হবে তা গাঁদা ফুল দিয়ে আবৃত করে রাখা হয়েছে।

আমি সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, পাঁচতলা থেকে সানাইয়ের অস্পষ্ট বাজনা শুনতে থাকলাম।

রাত ন'টায় বরপক্ষ এল। রাঘব একটা ঘোড়ার উপর বসে আছে। ডিজে মিউজিকের শব্দ বাড়িয়ে দিল। রাঘবের আত্মীয়রা ঘোড়ার সামনে নাচা শুরু করেছে। রাঘব ক্রিম রঙের একটা গলাবন্ধ স্যুট পরেছে। যদিও এটা মানতে আমার ভাল লাগে না, তবুও তাকে এতদূর থেকেও সুদর্শন লাগছে। আমি নিজে হয়তো তার চেয়ে দামি কিছু একটা পরে আছি, কিন্তু আমাকে এতটা রাজকীয় লাগছে না। আবারো তুলনা শুরু করাতে নিজেকে বকা দিলাম আমি।

সাড়ে ন'টায় আরতি এল। সে ধীরে ধীরে স্টেজের দিকে এগোতে লাগল।

আনন্দের একটা শিহরণ সবার মধ্যে বয়ে গেল যখন তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর কনেকে দেখতে পেল।

তাকে পরীর মত লাগছে, তার রুপালি চুমকি বসানো পিয়াজ-রঙা ল্যাহেঙ্গায়। যদিও আমার হাতে বাইনোকুলার নেই, আমি হলপ করে বলতে পারি তাকে একেবারে ত্রুটিহীন লাগছে। অনুষ্ঠানের সময় তাদের কাজিনরা রাঘব আর আরতিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। তারা তাদের তুলে নিল, ফলে তাদের মালাবদল করতে যথেষ্ট কষ্ট হল।

জয়-মালা অনুষ্ঠানের পরে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি আরতিকে কনে হিসেবে দেখতে চেয়েছি, কিন্তু সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে চাই নি।

আমি রুমে চলে এলাম, দরজা লাগিয়ে পর্দা টেনে দিলাম। টিভির শব্দ বাড়িয়ে দিলাম যাতে বাইরের শব্দ শোনা না যায়।

আমি আমার ফোনে সিমটা লাগালাম। এ কয়দিনে প্রথমবারের মত ফোনটা নিঃশ্বাস নেবার আগেই একটার পর একটা মেসেজ আসতে শুরু করল।

ফ্যাকাল্টিদের কাছ থেকে চল্লিশটা মেসেজ এসেছে, যাদের মধ্যে দশটা ডিন নিজে করেছে। বেশিরভাগ মেসেজে কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। রাঘব আমাকে পাঁচটা মেসেজ করেছে, আমি কার্ড পেয়েছি কিনা তা জিজ্ঞেস করেছে। আমি জানি না সে কতগুলো কল করেছে আমাকে। একটা মেসেজ আমাকে সবচেয়ে বেশি চমকে দিল। আরতি করেছে এটা :

"এসো। কিন্তু যদি তুমি চাও তবে।"

আমি রিপ্লাই করতে চাইলাম, তবে ভাবলাম সে স্টেজে তার ফোন নিশ্চয়ই চেক করবে না।

আমি ডিনকে কল করলাম।

"আপনি কোথায় ডিরেক্টর গোপাল?" ডিন তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইল। "আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় আছি।"

"ডিন শ্রীবাস্তব...ডিন শ্রীবাস্তব..."

"গোপাল!" আমার কণ্ঠের উদ্বিগ্নতা টের পেয়ে সে বলল।

"আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান," আমি পুরোপুরি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

"আপনি কোথায়? কোথায় আপনি?"

"তাজ গঙ্গায়, ৪০৫...আমি এখানে থাকতে চাই না।"

"আমি আসছি," সে প্রতিজ্ঞা করল।

এক ঘণ্টা পরে আমি ডিনের পাশে তার গাড়িতে বসে আছি, ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছি।

"তো, কি কারণে..." সে শুরু করলেও থেমে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেল আমি কথা বলতে চাই না।

"ডিন শ্রীবাস্তব, আমি কঠোর পরিশ্রম করতে চাই। গঙ্গাটেককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাই চলুন। আমি চাই আমরা শিক্ষার প্রতিটা ক্ষেত্রে থাকব। আমাকে ব্যস্ত রাখুন। এতটাই ব্যস্ত রাখবেন যাতে আমি চিন্তা করার কোন সময় না পাই।"

"আপনি এমনিতেই অনেক ব্যস্ত স্যার।" তাকে বিড়ম্বিত মনে হল।

"আরও। আমরা কোচিং ক্লাস করাচ্ছি না কেন?" আমি বললাম। "এতে টাকা আছে। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং আর এমবিএ কোচিংয়ের প্রস্তাবনা চাই। ঠিক আছে?" আমার কণ্ঠ ঝনঝন করে উঠল।

"আপনি ঠিক আছেন, ডিরেক্টর গোপাল?" ডিন বলল।

"আপনি আমার কথা শুনছেন? আমি প্রস্তাবনা চাই," এতটাই জোরে বললাম যে ড্রাইভার তার সিটে নড়েচড়ে বসল।

"হ্যা, ডিরেক্টর," ডিন বলল।

সে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি দৌড়ে সোজা ডায়নিং টেবিলের কাছে বারে গেলাম। পরিদর্শকদের জন্য কেনা কালো লেবেলের হুইস্কির নতুন একটা বোতল খুললাম আমি। একটা গ্লাসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে ঢাললাম। নির্জল। কাজের লোকেরা দৌড়ে এল।

"আপনি কোথায় ছিলেন সাহেব?" তারা বলল।

"আমার কাজ ছিল।" হুইস্কি খেতে প্রচন্ড তেতো লাগছে, কিন্তু গিলে ফেললাম।

"ডিনার?"

আমি মাথা দোলালাম। তারা রুম থেকে চলে গেল। বুকশেলফের কাছে গিয়ে স্ক্র্যাপবুকটা বের করলাম।

আমার জন্য আরেক গ্লাস ঢাললাম। এক চুমুকেই তার অর্ধেকটা গিলে ফেললাম, যখন আমার শরীর আর মানতে পারল না, তা আবার শরীর থেকে বের করে দিতে হল।

মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি। স্ক্র্যাপবুকটাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম সেখানেই।

উপসংহার

ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। হাসপাতালের ঘড়ি বলছে ভোর ছয়টা বাজে।

"তার মানে মাতাল হয়ে লুটিয়ে পড়া আপনার জন্য নতুন কিছু না," আমি বললাম।

গোপাল আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি দিল।

"শুধুমাত্র তখনই এটা হয়েছিল," সে বলল। " অবশ্যই গত রাত বাদ দিয়ে।"

আমি গোপালের মুখের দিকে তাকালাম। তাকে একজন ছাত্রের মতই তরুণ লাগছে। কিন্তু তার চেহারায় অভিজ্ঞতার একটা ছাপ স্পষ্ট, জীবনের তিক্ত পাঠ তাকে তার জৈবিক বয়স থেকে আরও বড় করে তুলেছে।

"তো, আরতি আর রাঘব এক বছর আগে বিয়ে করেছে?" আমি বললাম।

"এক বছর বিশ দিন," সে বলল।

"তারপরে কি হল?"

"শুকলাজি এখনো জেলে। আমি তার সাথে প্রতি মাসে দেখা করি। আমি আমার নিজের উপার্জন দিয়ে কলেজের তার মালিকানা কিনে ফেলে আমার কলেজ বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছি। তার অন্যান্য ব্যবসার জন্য তারও টাকার দরকার। দেখা যাক।"

"রাঘব আর আরতির কি হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তাদের সংস্পর্শে নেই। কলেজেই থাকি। দু'মাস পরে নির্বাচন। সেও আছে সেখানে।"

"মানে?"

"রাঘব পদপ্রার্থী। সারা শহরেই তার নির্বচনের পোস্টার ঝুলছে," গোপাল বলল।

"এটা আপনি হতে পারতেন। এ নিয়ে কেমন লাগছে আপনার?" আমি বললাম।

গোপাল কাঁধ ঝাঁকাল। "সে আমার থেকে ভাল এমএলএ হতে পারবে। আমি কি করতাম? অনেক টাকা উপার্জন করতাম। কিন্তু সে অনেককিছু পরিবর্তন করার সম্ভাবনা আছে তার।"

"এটা আপনার উদারতা," বললাম আমি।

গোপাল উঠে বসে তাড়াহুড়ো করে তার উপর থেকে চাদরটা সরাল। "কিন্তু তবুও আমি ভাল মানুষ না, তাই না?"

"আমি কখনো তা বলি নি," আমি বললাম।

"আমি আপনাকে বলেছি, আপনার গল্পে নায়ক হবার যোগ্যতা আমার নেই," গোপাল বলল।

চুপ করে থাকলাম আমি।

"আমি হয়তো ভিলেন হব," গোপালের চোখ ঝলমলিয়ে উঠল।

"আমি পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিব আপনাকে তারা কিভাবে নিবে। আমি সহজভাবে মানুষদের নিয়ে লিখি। তাদের নায়ক বা ভিলেনের চরিত্র দেয়া আমার কাজ না," আমি বললাম।

"রাঘব একটা ভাল মানুষ। আমি তার অর্ধেক ভালও না," গোপাল বলল।

"নিজেকে বিচার করা বন্ধ করুন," আমি বললাম।

"চেতনজি, আপনার হাত আপনার বুকে রাখুন, তারপর আমাকে বলুন, আমি কি ভাল মানুষ?"

আমি বুঝতে পারলাম আমার অনুমোদন তার কাছে একটা বিরাট বিষয়। কিন্তু তবুও আমি যথার্থ উত্তর দিতে চাইলাম। কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলাম এটা নিয়ে।

"বাদ দিন স্যার। উত্তর দেবার দরকার নেই। চলুন হাঁটি।"

সে তার বিছানা থেকে নামল। তাকে আগের চেয়ে সুস্থ মনে হচ্ছে। আমরা হাসপাতালের লনে গিয়ে ভোরের মুক্ত বাতাসে পায়চারী করতে লাগলাম।

"আর কখনো এত ড্রিংক করবেন না, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন," আমি বললাম।

"করব না," সে বলল।

"প্রতিজ্ঞা করুন আপনি কাউকে খুঁজে বের করে নেবেন," আমি বললাম।

সে মাথা দোলাল। "এটা আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারব না।"

"আপনি কি তাকে মিস করেন?" আমি বললাম।

চুপ করে থাকল সে।

"তার বিয়ের পরে কি তার সাথে দেখা করেছেন?"

সে মাথা দোলাল। বুঝতে পারলাম কেন সে আমাকে নামিয়ে দিতে রামাদায় আসতে চাইল না। ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। দু-ঘণ্টার মধ্যে আমার ফ্লাইট। আমাকে দৌড়ে হোটেলে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে দৌড় দিতে হবে।

"আমাকে যেতে হবে," বললাম আমি।

সে মাথা নেড়ে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে এল। "রেভুল্যুশন আসবে," বলল গোপাল। "একদিন আমাদের দেশটা আরও ভাল হবে।"

"আমি জানি," বললাম তাকে।

"আপনি অবশ্য এসব নিয়ে লিখছেন। একবার গঙ্গাটেক বড় হলে, আমি ব্যবস্থাপনা ঠিক করে ফেলব। মানুষদের খাম দিতে দিতে আমি অস্থির হয়ে গিয়েছি।"

"বিষয়গুলো আমাদের পরিবর্তন করতে হবে," আমি বললাম।

"সবার ত্যাগ দরকার এজন্য," গোপাল বলল।

"হ্যা, আমি একমত," বলে আমি ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বললাম।

"বাই, স্যার," আমি চলে যেতেই গোপাল বলল।

আমি তাড়াহুড়ো করে আমার রুমে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে চেক-আউট করতে হোটেলের লবিতে এলাম।

"আপনার অবস্থান কি আনন্দময় হয়েছে, স্যার?" শাড়ি পরা চমৎকার এক মেয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, স্মরণীয়," আমি বললাম।

আমি তার নেমট্যাগ দেখলাম। সেখানে লিখা : "আরতি কাশ্যপ। গেস্ট রিলেশন্স অফিসার।"

সে হাসলো। "শুনে ভাল লাগল, স্যার।"

আমার গাড়ি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার পাশ দিয়ে চলতে লাগল। ট্রাফিক সিগন্যালে আমি একটা বিশাল রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম। দূর থেকে পড়তে পারলাম না যদিও, কিন্তু একজন তরুণ প্রার্থীর ছবি দেখতে পেলাম। গোপালকে কল করলাম আমি।

"সব ঠিক আছে স্যার। আপনি কি আপনার ফ্লাইট ধরতে পারবেন?"

"হ্যা...গোপাল?"

"জি?" সে বলল।

"আপনি একজন ভাল মানুষ," বললাম আমি।

• • •